মানব সমাজ

(প্রথম খণ্ড)

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন
ত্রিপিটকাচার্য

অনুবাদক

সুবোধ চৌধুরী

পুথিঘর
২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৫২

দ্বিতীয় প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৫৪

মূল্য তিন টাকা

নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬নং চালতা বাগান লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীকালীপদ
নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পুঁথিঘরের পক্ষ
হইতে সতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন

লেখকের পরিচয়

বাঙালী পাঠক মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের লেখা ও তাঁহার পাণ্ডিত্যের সহিত তত পরিচিত নহেন। পূর্বে প্রবাসীতে 'নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর' ছাড়া তাঁহার আর কোন গ্রন্থই বাংলায় অনূদিত হয় নাই। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে রাহুল সাংকৃত্যায়নের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকিলেও পণ্ডিত হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি বেশি। রাহুল বহুভাষাবিদ্—বাংলা, হিন্দী, উর্দু, পালি, সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সীতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা আছে। ইহা ছাড়া ইংরেজী, তিব্বতী, রুশ এবং অপরাপর কয়েকটি ভাষাও তিনি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। রাহুল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মনী, সোভিয়েট রাশিয়া, ইরাণ ও অফগানিস্তান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে তিনি ব্রহ্মে, চীনে, কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায় ও জাপানে বহুদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।

রাহুল সিংহলের বিখ্যাত বিদ্যালঙ্কার মঠে কিছুদিন সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেই স্থান হইতে বৌদ্ধধর্মের লুপ্তকীর্তি উদ্ধারের জন্য সরকারী ছাড়পত্র ছাড়াই তিনি তিব্বত রওয়ানা হন। এই উদ্দেশ্যে দুস্তর পর্বতপথ অতিক্রম করিয়া নিঃসঙ্গ রাহুল পর পর পাঁচবার তিব্বত গিয়াছিলেন। তিব্বতের শাক্য, ঞলোর ও শালু বিহার হইতে তিনি ভারত ইতিহাসের বহু বিস্মৃত রত্ন উদ্ধার করিয়া আনেন। প্রজ্ঞাকর গুপ্ত, জ্ঞানশ্রী, রত্নকীর্তি, বসুবন্ধু, অসঙ্গ, নাগার্জুন ও গুণপ্রভাদি শতাধিক লেখকের গ্রন্থের তিনি আবিষ্কর্তা। ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক' আবিষ্কৃত হইবার পর রুশীয় পণ্ডিত চার্বাস্কি জয়শোয়ালের নিকট লিখিয়াছিলেন :—"এই গ্রন্থ আবিষ্কারকে স্মরণীয় করিবার জন্য আমাদের অবিলম্বে একটি বিশ্বসম্মেলন আহ্বান করা উচিত।"

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন

লেখকের পরিচয়

বাঙালী পাঠক মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের লেখা ও তাঁহার পাণ্ডিত্যের সহিত তত পরিচিত নহেন। পূর্বে প্রবাসীতে 'নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর' ছাড়া তাঁহার আর কোন গ্রন্থই বাংলায় অনূদিত হয় নাই। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে রাহুল সাংকৃত্যায়নের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকিলেও পণ্ডিত হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি বেশি। রাহুল বহুভাষাবিদ্—বাংলা, হিন্দী, উর্দু, পালি, সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সীতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা আছে। ইহা ছাড়া ইংরেজী, তিব্বতী, রুশ এবং অপরাপর কয়েকটি ভাষাও তিনি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। রাহুল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মনী, সোভিয়েট রাশিয়া, ইরাণ ও অফগানিস্তান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে তিনি ব্রহ্মে, চীনে, কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায় ও জাপানে বহুদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।

রাহুল সিংহলের বিখ্যাত বিদ্যালঙ্কার মঠে কিছুদিন সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেই স্থান হইতে বৌদ্ধধর্মের লুপ্তকীর্তি উদ্ধারের জন্য সরকারী ছাড়পত্র ছাড়াই তিনি তিব্বত রওয়ানা হন। এই উদ্দেশ্যে দুস্তর পর্বতপথ অতিক্রম করিয়া নিঃসঙ্গ রাহুল পর পর পাঁচবার তিব্বত গিয়াছিলেন। তিব্বতের শাক্য, ঞলোর ও শালু বিহার হইতে তিনি ভারত ইতিহাসের বহু বিস্মৃত রত্ন উদ্ধার করিয়া আনেন। প্রজ্ঞাকর গুপ্ত, জ্ঞানশ্রী, রত্নকীর্তি, বসুবন্ধু, অসঙ্গ, নাগার্জুন ও গুণপ্রভাদি শতাধিক লেখকের গ্রন্থের তিনি আবিষ্কর্তা। ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক' আবিষ্কৃত হইবার পর রুশীয় পণ্ডিত চার্বাস্কি জয়শোয়ালের নিকট লিখিয়াছিলেন :— "এই গ্রন্থ আবিষ্কারকে স্মরণীয় করিবার জন্য আমাদের অবিলম্বে একটি বিশ্বসম্মেলন আহ্বান করা উচিত।"

রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁহার আবিষ্কৃত গ্রন্থের অনেকগুলিরই টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন, কোন কোন গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং কোনটির আবার শব্দসূচী কিংবা সহজ অনুবাদও তৈয়ার করিয়াছেন। জয়শোয়াল মহাপণ্ডিত রাহুলের এই সম্পাদনার কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন:—"ইহাদের যে কোন একটি গ্রন্থের সম্পাদনার জন্যই একজন ভারতবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে।" রাহুলের সম্পাদিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি মন্তব্য করিয়াছিলেন:—"বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে নেপালের অমৃতানন্দের পর এতবড় ভাষাজ্ঞানী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।" এই ভাষাজ্ঞানের স্বীকৃতি হিসাবে কাশীর পণ্ডিতসমাজ লেভির বহু পূর্বেই রাহুলকে 'মহাপণ্ডিত' উপাধি দেন। আর তাঁহার বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞানের স্বীকৃতিতে সিংহলের বিদ্যালঙ্কার মঠ তাঁহাকে 'ত্রিপিটকাচার্য' নামে ভূষিত করেন।

১৯৩০ সনে ভারতে ফিরিবার সময় তিব্বতী গ্রন্থ ও চিত্রের রাশি রাহুলকে ২২টি ঘোড়ার পিঠে করিয়া আনিতে হয়। ১৯৩৫ সনে তাঁহার তৃতীয় যাত্রায় অন্য জিনিসের সঙ্গে রাহুল ১৫৬টি লুপ্ত সংস্কৃত ও তিব্বতী গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া আনেন। পরে ১৯৩৬ সনে তাঁহার চতুর্থ অভিযানে তিনি তিব্বত হইতে ৩২ অক্ষরের ১,৬০,০০০টি শ্লোকের আলোকচিত্র আনিয়াছিলেন; এবং সেই বারই চিত্র-গ্রহণের সরঞ্জাম ফুরাইয়া যাওয়ায় ৪০,০০০ শ্লোক রাহুলকে শেষ দিকে হাতে লিখিয়া আনিতে হয়। রাহুল সাংকৃত্যায়নের আনীত তিব্বতী গ্রন্থ ও চিত্রের রাশি বর্তমানে বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। তিব্বত বাদ দিলে তিব্বতী গ্রন্থের এমন বিরাট্ সংগ্রহের গৌরব পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থাগারই করিতে পারে না। সাংকৃত্যায়ন পণ্ডিতের

তিব্বতী চিত্রগুলি এখন পাটনা মিউজিয়মে Rahul Section নামক একটি পৃথক্ বিভাগে রক্ষিত হইয়াছে।

জয়শোয়াল রাহুলের আবিষ্কারের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া একবার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন:—"বিদ্বজ্জনসমাজ এই আবিকারকের নাম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অপার শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিবে।" রাহুল সাংকৃত্যায়নের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও জয়শোয়ালের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল জানা যায়। সাংকৃত্যায়ন পণ্ডিতের চরিত্রচিত্রণ করিতে গিয়া ভারতবর্ষের এই অসামান্য প্রতিভাশালী ঐতিহাসিক একটি প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন:—"রাহুলের মধ্যে আমি যেন বুদ্ধেরই প্রকাশ দেখিতে পাই—হিংসা-দ্বেষ তাঁহার নিরুদ্বেগ চিত্তকে স্পর্শও করিতে পারে না; তিনি সততপ্রশান্ত, সৌম্য ও সুধীর—তাঁহার দৃষ্টি বিশ্বজনীন; শিশুরা তাঁহার দিকে সহজাত মমতায় ছুটিয়া যায়...রাহুল যদি বলিতেন, 'আমাকে অনুসরণ কর', তবে বিশ্বমানবতা বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের আহ্বানের মতই তাহাতে সাড়া দিত।"

ইহাই রাহুলচরিত্রের সমগ্র দিক্ কিনা বলিতে পারি না, তবে মনে হয়, জয়শোয়ালও এই চরিত্রে একটি দ্বৈততা দেখিয়াছেন। জয়শোয়াল রাহুলের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁহার রাজনৈতিক কার্যক্রমকে মিলাইয়া দেখিতে পারিতেন না। তিনি রাহুল সাংকৃত্যায়নকে বহুবারই রাজনীতিক কাজকর্ম ছাড়িয়া দিতে কাতর অনুরোধ করিয়াছেন। শেষে রাহুল হয়ত একবার ইহাতে স্বীকৃতও হইয়াছিলেন, কিন্তু জয়শোয়ালের তাহাতেও আবার গ্লানি আসিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন:—"রাহুলকে রাজনীতি ছাড়িয়া দিতে মিনতি করিলাম, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকৃতও হইলেন—কিন্তু ভারতবর্ষকে অপর এক গান্ধী বা জবাহরলাল হইতে বঞ্চিত করিলাম না ত?" অবশ্য

জয়শোয়ালের এই আত্মগ্লানি যে অমূলক ছিল তাঁহার জীবৎকালেই রাহুল তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মোটের উপর রাহুল রাজনীতিকে ছাড়িতে পারেন নাই, জয়শোয়ালের মৃত্যুর পর তিনি চতুর্থবার কারাবাসে গিয়াছেন ; এবং তাহার পর কলিকাতায়ই বিক্ষুব্ধচিত্ত রাহুলকে আমরা রাজনীতিক বক্তৃতামঞ্চে দেখিতে পাইয়াছি। জয়শোয়াল রাহুলচরিত্রে মানবতার যে প্রেমময় রূপ দেখিয়াছিলেন, লাঞ্ছিত মানবতার রোষে ও ব্যথায় পরে তাহাই প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে।

অনুবাদকের কথা

লেনিনগ্রেডের ওরিয়েণ্টেল একাডেমি হইতে একটি অধ্যাপক পদের জন্য নিমন্ত্রণ পাইয়া রাহুল বর্তমানে সোভিয়েট য়ুনিয়ন যাত্রা করিয়াছেন। ইহার পূর্বে তাঁহার এলাহাবাদ অবস্থান কালে মানবসমাজের বঙ্গানুবাদের কিছু কিছু অংশ তিনি নিজেই দেখিয়া দিয়াছিলেন। সোভিয়েট যাত্রার প্রাক্কালে এই কাজের ভার তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুত মহাদেবপ্রসাদ সাহার উপর তিনি ন্যস্ত করিয়া যান। শ্রীযুত মহাদেবপ্রসাদ রাহুলজীর পক্ষ হইতে আমার অনুবাদের সমুদয় পাণ্ডুলিপি পড়িয়া দেখিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে যথোপযুক্ত সংশোধন করিবার জন্যও আমাকে বহুরূপ পরামর্শ দিয়াছেন ; তাঁহার রুগ্ন শরীর লইয়াও তিনি এই অনুবাদ কার্যে আমার সঙ্গে যে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। মহাদেবপ্রসাদ ছাড়া আমার অপর দুইজন সাংবাদিক বন্ধুও এই ভাষান্তরণের কাজে আমার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন—ইঁহাদের একজন হইতেছেন শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়, এবং অপর জন আমার হিন্দীভাষাজ্ঞানের প্রথম গুরু শ্রীচন্দ্র অগ্নিহোত্রী। তাঁহাদের সাহায্য এই ক্ষেত্রে কোনরূপ কৃতজ্ঞতারই অপেক্ষা রাখে না ; তবু ঋণ লাঘব না হউক, অন্তত ঋণের স্বীকৃতি আমার দিক্ হইতে প্রয়োজন। ইতি—২০শে বৈশাখ, ১৩৫২।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মানব সমাজের বিকাশ

মানবের উদ্ভব

এক সময়ে পৃথিবী জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল, তাহাতে অণু বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত; কিন্তু অণুরাশি ক্রমে পরস্পরের নিকট আসিল, ফলে অণুগুচ্ছের সৃষ্টি হইল। ধীরে ধীরে জীবনাণু * জন্মলাভ করিল, এবং পনীরের মত কোমল অস্থিবিহীন প্রাণীর † আবির্ভাব ঘটিল। প্রকৃতি হইতে প্রত্যক্ষভাবে আহার গ্রহণ করিয়া স্থাবর বনস্পতির দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একাত্মতামুক্ত জঙ্গম প্রাণীরও সৃষ্টি হইল। ইহারা জলচারী মৎস্য-মীনের যুগ পার হইয়া আসিল: কেহবা আবার জল-স্থল—উভচরের রূপ নিল; কেহ নূতন করিয়া আকাশের পথ ধরিল, এবং কেহ আদিম স্থলভূমিতেই বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে ইহাদের কণ্ঠ হইতে ধ্বনি নির্গত হইল; এবং ধীরে ধীরে স্তন-ধারী জীবের উদ্ভব হইল। তখন বানর হইতে বনমানুষ, এবং পরে বনমানুষ হইতে আধামানুষ, অর্থাৎ নরবানর আসিয়া দ্বিপদ বংশের সংখ্যা বাড়াইল।

বিকাশ পথে ইহাদেরই কয়েকটি গুচ্ছ বা জোড়া জাতি পরিবর্তনের‡ স্তরে পৌঁছিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই কয়টি নরবানরই মানববংশের আদি জনয়িতা। সময় নিরূপণ করিতে গেলে ইহাদের কাল বিশ লক্ষ বৎসরের কম হইবে না। আজ হইতে দশ লক্ষ বৎসর আগে মানুষকে

---

* Virus, Bacteria; † Amœba; ‡ Mutation.

অস্ত্রধারী দেখা যাইতেছে, এবং তাহার পাঁচ লক্ষ বৎসর পরে আমাদের পূর্বজ সেপিয়ন মানবের * পরিচয় মিলিতেছে।

১। মানব সমাজ

মানুষের প্রারম্ভিক বিকাশ খুব মন্থর ছিল ; কিন্তু তখনকার অবস্থায় ঐ বিকাশেরই যথেষ্ট মূল্য আছে। মানুষের হাত, মাথা এবং বাক্-ক্ষমতার বিকাশ দেখিয়া আজ তাহাকে পশু হইতে স্বতন্ত্র জীব বলিয়া ঘোষণা করি। কিন্তু, আদি মানব হইতে এখন পর্যন্ত এত আশ্চর্য পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? বিকাশ সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিবেন, চেষ্টা —অর্থাৎ জীবের বাঁচিবার চেষ্টাই তাহাব বিকাশের প্রধান সহায়ক। কিন্তু, এই চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে শ্রম ; তাই বলিতে পারি, শ্রমই মানুষের বিকাশ সম্পাদন করিয়াছে ; তবে ইহাও সত্য, তাহা প্রকৃতির সহায়তা ছাড়া সম্ভব হয় নাই।

ভূগর্ভ শাস্ত্রীর কথিত তৃতীয়কাল † কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে অতীত হইয়াছে। ইহার যুগান্ত সময়ে বনমানুষের একটি বিকশিত জাতি পৃথিবীর কোন মহাদ্বীপে বাস করিত। এই মহাদ্বীপ ভারত মহা-সাগরের কোন অধুনালুপ্ত ভূভাগও হইতে পারে। ইহার অধিবাসীরা মানব জাতির পূর্বজ। তাহাদের সকল শরীর লোমে আবৃত থাকিত ; ইহাদের কানের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ছিল ; এবং যূথবদ্ধ হইয়া ইহারা বৃক্ষের শাখায় বসবাস করিত। বৃক্ষবাসের ফলে তাহাদের হাত তখন নূতন কর্মশক্তি লাভ করে ; সঙ্গে সঙ্গে পেছনের পা হইতে হাতের কর্মগত বিভিন্নতারও সৃষ্টি হয়। গাছ হইতে ফল পাড়া, গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরা—এবং এইরূপ অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থাকিয়া হাত

* Sapien ; † Tertiary Period.

শরীর বহনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া যায়। এখন সমতল ভূমিতে চলিবার সময় ইহারা হাত উঁচাইয়া, শুধু পায়ের উপর ভর দিয়াই চলিতে থাকে; টাল সামলাইবার জন্য কাঁধ দুইটিকেও আরও সোজা করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। বনমানুষের মানুষ হওয়ার মধ্যে হাতের মুক্তি আর কাঁধ সোজা রাখার চেষ্টা—এই দুইটি কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আজকালের বনমানুষও কাধ উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, হাতে ভর না করিয়া শুধু পায়ের জোরেই চলিতে পারে; তবুও তাহার চলন মানুষের মত এত আয়াস-হীন হয় না। শরীরের ভার সামলাইবার কাজ হইতে মুক্ত হইয়া হাত অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হইতে থাকে। বনমানুষের মধ্যেও হাত ও পায়ের কাজের পার্থক্য আছে। গাছে চড়িবার সময় ইহারা হাত ও হাতের আঙ্গুল দিয়া গাছ আঁকড়াইয়া ধরে—পিছনের পা দুইটিতে এই কাজ সত্যই হয় না। হাতের সাহায্যে বনমানুষ গাছের ফল ছিঁড়িয়া লয়, হাত দিয়া আহৃত বস্তু একস্থানে স্তূপীকৃত করে,—পেছনের পা দিয়া ইহার কিছুই হইতে পারে না। কোন কোন জাতির বানর হাত দিয়া গাছের উপর ঝুপড়ির মত বাসা তৈয়ার করে; শিম্পাঞ্জী রৌদ্র বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য গাছের ডালে ছাত বানাইয়া লয়। প্রয়োজন হইলে হাতে ডাণ্ডা লইয়া শত্রুর মুখামুখিও সে হইতে পারে; হাতে ফল বা পাথর ছুঁড়িয়া মারার অভ্যাসও তাহার আছে। তবু মানুষের হাতের সঙ্গে বনমানুষের তুলনা হয় না; মানুষের হাতের নিপুণতা হাজার হাজার বৎসরের পরিশ্রমের ফল। বনমানুষ এবং মানুষের হাতের শিরা, জোড়া বা হাড়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; তবু বিকাশের প্রথম স্তরের মানুষের হাতও বনমানুষের চেয়ে অনেকগুণ কুশলী। আজ পর্যন্ত বনমানুষ পাথরের কোন তুচ্ছতম অস্ত্রও তৈয়ার করিতে পারে নাই।

বনমানুষের মানুষে রূপান্তর আরম্ভ হইবার আগে লক্ষ বৎসর ধরিয়া জীবপ্রগতি বড় ধীর গতিতে চলিতেছিল—আজ ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। চকমকি পাথর দিয়া মানুষ যেদিন প্রথম অস্ত্র তৈয়ার করিয়াছিল, তাহাও আজ হইতে খুব কাছের কথা নহে;—আমাদের ঐতিহাসিক সময় হইতে ইহা বহু যুগ পূর্বের। তবে কথা এই, হাত যখন একবার মুক্ত হইয়াছে, তখন আর কোন বাধা নাই; মানুষ হাতের সাহায্যে এখন অস্ত্র তৈয়াব করিতে পাবে, সৌধ গড়িতে পারে, সেতার বাজাইতে পারে, দরকার হইলে টাইপরাইটরও চালাইতে পারে।

(১) **শ্রমই বিধাতা**—হাত যে শুধু শ্রমের হাতিয়াব এমন বলিতে পারি না; হাত প্রকৃতপক্ষে শ্রমের উপজ, শ্রমই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে। হাতের নিত্য নূতন ব্যবহারে তাহাতে নূতন পেশী ও শিরা গঠিত হইয়াছে, ক্রমে হাড়ের উপর ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছে, সেই প্রভাব আবার আনুবংশিক হইয়া পরবর্তী বংশধরদেব মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। বংশলব্ধ প্রভাব পরে হাতেব আবও নূতন নূতন ব্যবহার আয়ত্ত করিয়াছে। এইভাবে মানুষের হাত আজ হাজার কাজের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে: অজন্তার চিত্রকলায়, গুপ্ত কালের মূর্তিশিল্পে, কিংবা তানসেন বা বৈজু বাবরেব সপ্ততন্ত্রী স্বরে মানুষের কুশলী হাত সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু হাত শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন কোন পদার্থ নয়; ইহা শরীর-যন্ত্রেরই একটি অঙ্গ। সমগ্র শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকিলে শুধু হাতের বিকাশে বিশেষ কোন লাভ হইত না। শরীরের এক অংশ অপর অংশকে প্রভাবিত করে। স্তনধারী জীব ডিম্ব প্রসব করে না; তাই ডিম্বাণুর বৃদ্ধি ও পরিপাকের জন্য তাহাদের গর্ভাশয় থাকে; আবার প্রসবান্তে স্বাভাবিক ভাবেই স্তনধারিণীর স্তনে দুধেরও সঞ্চার

হয়। নীলচোখ বিড়ালের শরীর সাদা হইলে তাহারা বধির হয়; অর্থাৎ অপর অবয়বের প্রভাবে তাহার শ্রবণ শক্তির বিকাশে বাধা পড়ে। এইভাবে মানুষের হাতের বিকাশে তাহার অন্যান্য অঙ্গও প্রভাবিত হয়।

সমাজ—হাতের শ্রমশক্তি বিকাশ পাইবার পর প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব বাড়িয়া চলে। ইহাতে তাহার প্রগতিরও পথ খুলিয়া যায়। মানুষ এখন হাত এবং হাতের শ্রমের নিত্য নূতন ব্যবহার আয়ত্ত করে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন প্রাকৃতিক বস্তুর ব্যবহারও তাহার আয়ত্ত হয়। শ্রম-বিকাশের মূল প্রেরণা ছিল—বস্তুর অধিকতর অর্জন এবং তাহার অধিক উপযোগ বা ব্যবহার। এই কাজে অধিক ব্যক্তির সহযোগ এবং তাহাদের সহযোগেরও প্রয়োজন ছিল। হাত মুক্ত হইবার পর মানুষ তাহার শ্রমের উপযোগিতা বুঝিতে পারে,—তখন হাজার নূতন কাজে এই শক্তিকে নিয়োজিত করা হয়। ঠিক এইভাবে, সহযোগের সুবিধা বুঝিবার পরও মানুষ তাহাকে আর ছাড়িতে পারে নাই—দিন দিন এই সহযোগিতাকে তাহারা বাড়াইয়াই তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কোন সাজানো গুছানো সমাজের কর্তা হইয়া বসে নাই। প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া ভোগ উৎপাদনের জন্য তাহাকে শ্রম করিতে হইয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছে; এবং এই শ্রমে ও সংগ্রামে সর্বদা সহযোগিতারও প্রয়োজন হইয়াছে। এইভাবের সহযোগী শ্রমে ও সংগ্রামে মানুষের মুক্ত হাতের শক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ইহা হইতেই সে সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা পাইয়াছে।

(২) **ভাষার উৎপত্তি**—সমাজবদ্ধ হইবার পর মানুষ তাহার মনের ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে চাহিল। ইহার ফলে তাহার উচ্চারিত ধ্বনির সংখ্যা বাড়িল; এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিযন্ত্রেরও পরিবর্তন

আরম্ভ হইল। বায়ুনাড়ীর ঝিল্লিতে এইবার বহু নূতন জটিলতা দেখা দিল; আর জিহ্বা এবং মুখবিবরও পূর্বের তুলনায় বহু গুণ সংস্কৃত হইয়া গেল। তারপর ধ্বনি ছাড়িয়া মানুষ রীতিমত বর্ণ উচ্চারণ করিতে শিখিল। মানুষের শ্রমের দান যেমন সমাজ, তেমনি সমাজের দান হইল ভাষা। পশু অবশ্য আমাদের ভাষা বলিতে পারে না; কারণ পশুর নিকট বিকশিত শব্দযন্ত্র নাই। কিন্তু মানুষের সমাজে আসিলে পশুও মানুষের শব্দ চিনিতে পারে। পালিত হাতী, ঘোড়া, কুকুর মানুষের শব্দের ইঙ্গিতে কাজ করে। কুকুর যে অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে থাকে, ঠিক সেই অঞ্চলের ভাষায় সে সাড়া দেয়। মানুষের সমাজে আসিয়া পশুর স্নেহ ভক্তির মানও উন্নত হয়। অনেকক্ষণ পর মালিকের দেখা পাইলে কুকুর চমৎকার হর্ষসূচক ধ্বনি করে;—ইহাতে মনে হয়, তাহার ধ্বনিযন্ত্র উন্নত হইলে মনের ভাব সে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারিত। প্রাণীর মধ্যে পাখীর ধ্বনিযন্ত্র মানুষের ঠিক পরেই স্থান পায়। ইহাদের কাকলি মানুষের আনন্দের বস্তু; কিন্তু তোতা, ময়না প্রভৃতির ধ্বনিযন্ত্র আরও বিশেষরূপে উন্নত; মানুষের বহু শব্দ ইহারা পরিষ্কার উচ্চারণ করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, পাখী শব্দের অর্থ না বুঝিয়া শুধু মানুষের ধ্বনিটুকু শিখিয়া লয়। তাই তোতা নিজের খুশিমত যখন তখন তাহার শেখা বুলি আওড়াইয়া যায়। এইজন্য শিক্ষা দিলেও যে পাখী কোন শব্দের অর্থ বুঝে না এমন নয়। পাখী তাহার নিজের ক্ষমতামত শব্দের অর্থও বুঝিতে পারে। তোতাকে গালি শিখাইবার সময় এমন ভাবে শিখান, যাহাতে রাগ হইলে এই কথা বলিতে হয়, ইহা তোতা বুঝিতে পারে। পরে একদিন কোন উপায়ে উহাকে বিরক্ত করুন; দেখিবেন, পাখী ঠিক জায়গায়ই তাহার শেখা বুলি আওড়াইতেছে। তোতাকে প্রথমে 'খেতে দাও' 'খেতে দাও' বলিতে শিখান; পরে খাবার দিবার সময় কিছু দিন ঐ কথা

বলিয়া যান; দেখিবেন, খাইতে হইলে এই বাক্যই যে সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা তোতা বুঝিয়া যাইবে; এবং পরে ক্ষুধা পাইলে 'খেতে দাও' বলিয়া আপনার নিকট খাদ্য যাচ্ঞাও করিবে।

(৩) **মস্তিষ্ক-বিকাশ**—প্রথমত হাত অর্থাৎ শ্রমের উদ্ভব হয়; আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌ক্ষমতা এবং শব্দধ্বনি বিকাশ লাভ করে। এই দুইটি বিকাশের ফল আবার মস্তিষ্ক বিকাশের সহায়ক হয়। মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশের সঙ্গে হাতের নিকট সম্বন্ধ আছে; এবং অপর অংশের সঙ্গে কান ও ধ্বনিযন্ত্রের ঠিক সেইরূপ সম্পর্ক দেখা যায়। তাই মস্তিষ্কের এক অংশের বিকাশের সঙ্গে অন্য অংশের বিকাশও অবশ্যম্ভাবী। বিকাশতত্ত্বের এই অবিচ্ছেদ্যতা ধরিতে পারিলে মানুষের ইন্দ্রিয়ের বিকাশ খুব সহজেই বোঝা যায়ঃ যেমন ধ্বনির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণযন্ত্রের বিকাশ নিশ্চিত;—তখন উচ্চারণের সূক্ষ্ম তারতম্য, বর্ণমালার বিভেদ কিংবা তাহাদের আরোহ অবরোহ বুঝিতে আর কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিকাশ শুধু ইন্দ্রিয়মাত্রেই সীমিত নয়—ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, তাই ইন্দ্রিয়ের বিকাশে মস্তিষ্কও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। শকুন মানুষ অপেক্ষা বহু বেশি দূর দেখিতে পায়; কিন্তু দৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে গৃধ্রের জ্ঞান মানুষের তুলনায় নগণ্য। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ; কিন্তু আঘ্রাত বস্তুর জ্ঞান আবার মানুষের বেশি। ইহা হইতে বোঝা যায় মানুষের মস্তিষ্ক অন্যান্য জীবের তুলনায় অনেক বেশি বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। পিছনে তাকাইয়া এই বিকাশকে আমরা আর একবার লক্ষ্য করিয়া লইতে পারি। শরীর বহনের দায়িত্ব হইতে হাত একদিন মুক্তি পাইয়াছিল। শ্রমের জন্য হাতের মুক্তিকে এক কথায় সমগ্র প্রগতির মূল বলিতে পারি। মানুষের শ্রম এবং তাহাদের শ্রমগত সহযোগিতায় ভাষার সৃষ্টি হয়; তারপর শ্রম এবং ভাষা এই দুইটির প্রভাবে আবার মস্তিষ্ক

এবং তৎসম্বন্ধী ইন্দ্রিয়েরও বিকাশ হয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা, কল্পনা, নিশ্চয়শক্তি এবং মস্তিষ্কসঞ্জাত অন্যান্য গুণও আগের তুলনায় বাড়িয়া যায়। তখন সেই সফলতার আধারের উপর শ্রম ও ভাষা আবার নূতন করিয়া উন্নতির পথ পায়। তাই বনমানুষ মানুষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানব প্রগতি থামিয়া যায় নাই। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গতি ও মাত্রায় ইহা অব্যাহত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে প্রতিকূল কারণের জন্য প্রগতি বাধাপ্রাপ্তও হইয়াছে; কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে এই বাধা যে সাময়িক এবং খুব তুচ্ছ তাহা বোঝা যায়। উপরে প্রগতির যে সব কারণ বলা হইল তাহা ছাড়া আর একটি বিশেষ কারণও আছে: ইহা মানুষের মানুষ হওয়া অর্থাৎ সমাজবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা। সমাজজীবন আরম্ভ হইবার পর মানবপ্রগতিতে সামাজিক প্রভাব খুবই বেশি।

(৪) **বনমানুষ হইতে মানুষ**—পৃথিবীর আয়ুর মাপে * মানুষের উদ্ভব ও বিকাশের কয়েক লক্ষ বৎসর এক মুহূর্তের মত। এই সময় শাখাচারী বনমানুষের কয়টি যূথ মানুষে পরিবর্তিত হয়। আজ বনমানুষের যূথের সঙ্গে মানুষের সমাজের যে প্রভেদ দেখা যায় তাহার কারণ শ্রম। বনমানুষ খাদ্যের জন্য দলবদ্ধ হইয়া বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। ভৌগোলিক প্রতিকূলতা এবং পড়শীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এই দুইটি জিনিস তাহাদের নির্বাধ বিচরণের পক্ষে তখন বাধা ছিল। তবু খাদ্যের অভাব উপস্থিত হইলে নূতন চরভূমি দখল করা ছাড়া তাহাদের উপায় ছিল না। ইহাতে অন্যান্য যূথের সঙ্গে তাহাদের প্রায় সংঘর্ষ হইত। কিন্তু নূতন ভূমি দখল করিয়াও প্রকৃতি সেখানে যে পরিমাণ খাদ্য রাখিয়াছে শুধু ততটুকুই তাহারা ভোগ করিতে পারিত। ভূমিকে

* দুইশত কোটি বৎসর।

অধিক খাদ্য দিবার উপযোগী করিবার কৌশল তাহাদের জানা ছিল না। তবে মলমূত্রের দ্বারা তাহাদের অজ্ঞাতে কিছু ভূমি উর্বরা হইয়া থাকিলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। এইভাবে সমস্ত সুলভ ভূমি অধিকারে আসার পর বানরের আর সংখ্যাবৃদ্ধি হইল না। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, বানর তাহার চরভূমিকে ফলদ করিতে জানিত না—তাই সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে বানর সমাজে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিল। তখন ভূমি উর্বরা করা ত দূরের কথা—ভূমির ফলনশক্তি তাহারা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল। চারিদিকের কাঁচা দানা ও উদ্গত অঙ্কুর এবং শস্য সমস্ত নিঃশেষে গ্রাস করিয়া বসিল। চতুর শিকারী তাহার শিকারক্ষেত্রের হরিণীকে বধ করে না; কারণ সে বুঝে—আগামী বৎসর এই হরিণী নূতন শিশুর জন্ম দিবে। কিন্তু চিতা বা নেকড়ের কবল হইতে হরিণীরও মুক্তি নাই; কারণ শিকারীর মত বাঘ ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে পারে না। য়ূনানের (গ্রীস) শ্যামশোভাময় পাহাড় আজ নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে;—য়ূনানী ছাগমেষের পাল কয়েক শতাব্দীতে তাহার সমস্ত শস্য শেষ করিয়া দিয়াছে; এমনকি ভবিষ্যৎ জননের জন্য বীজটুকুও আর অবশিষ্ট রাখে নাই।

এইভাবে পরিবেশ কখনও কখনও প্রাণীর জীবনধারণের প্রতিকূল হইয়া উঠে। জাতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়া জীব তখন তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরকে নূতন অবস্থায় বিন্যস্ত করিয়া দেয়। 'বিশ্বের রূপরেখা' গ্রন্থে আরসোলার অবস্থান্তর গ্রহণের বর্ণনা করিতে গিয়া পূর্বে ইহার কারণ বলিয়া আসিয়াছি। নূতন অবস্থায় নূতন রাসায়নিক তত্ত্বের মিশ্রণ ও তাহার অনুপাতের উপর ইহা কি ভাবে নির্ভরশীল তাহাও সেখানে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সব কারণ এবং অবস্থাই বনমানুষকে মানুষে রূপান্তরিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পরিবেশের ব্যতিক্রম, খাদ্যবস্তুতে রাসায়নিক তত্ত্বের পরিবর্তন

—ইহার কোনটাই কিন্তু মানুষের শ্রমের উপর নির্ভর করে নাই। মানুষের শ্রম—সে হাতিয়ারধারী হইবার পর হইতে পরিবর্তনের সহায়ক হইয়াছে। তাহার আদিম অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে পশু ও মৎস্য শিকারের উপকরণগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহাদের দ্বারা সেই যুগের যুদ্ধবিগ্রহেরও কাজ চলিয়া যাইত। এই সব অস্ত্রের একটি বিশেষ ইঙ্গিত এই যে, মানুষ তখন ফলাহার ত্যাগ করিয়া মাংসভোজী হইয়াছে। মানববিকাশে এই মাংসাহারের গুরুত্ব অপরিসীম। মাংস মানুষের শরীরে বহু আবশ্যক নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পরিপাকের জন্য মানুষের পাকস্থলীর পরিশ্রমও বাড়িয়া গিয়াছে। আর বনস্পতির স্বামী মানুষ এখন মাংসাহারের তাগিদে পশুরও স্বামী বনিয়াছে। মাংসাহারের সবাপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়িল কিন্তু মস্তিষ্কের উপর। এই নূতন খাদ্যরস কেরাসিনের রাজ্যে পেট্রল লইয়া আসিল। মস্তিষ্কের বিকাশে বহুপুরুষ ধরিয়া ইহার প্রভাব চলিল। এদিকে মাংসাহারে অভ্যস্ত হইয়া মানুষ নরভক্ষণে সিদ্ধ হইয়া উঠিল; এই প্রথা বহু জাতির মধ্যে এখনও একেবারে লোপ পাইয়া যায় নাই। কিন্তু মাংসাহারের দুইটি খুব বড় দান আছে—ইহা বনমানুষের বংশধর মানুষকে আগুনের নিকট পৌছাইয়াছে, এবং তাহাকে পশুপালনে মনোযোগী করিয়াছে। আগুনের সাহায্যে পাচনক্রিয়ার অনেকটা বাহিরে হইয়া যাওয়ায় পাকস্থলীর শ্রম বহু লাঘব হইয়াছে। অন্যদিকে পশুপালন শিকারের অনিশ্চিত সফলতার স্থানে একটি নিশ্চিত সাধন মানুষের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে শুধু মাংস নয়, দুধ এবং দুধের আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিসও মানুষের জুটিয়া গিয়াছে।

এইভাবে মানুষ একদিকে তাহার চিন্তায় ও শ্রমে পরিবেশকে বদলাইয়া লইয়াছে; আবার অন্যদিকে পরিবেশও তাহার উপর প্রভাব

বিস্তার করিয়াছে। মানুষের প্রত্যেক সফলতাই প্রকৃতির উপর নূতন অধিকার—নূতন বিজয়। মানুষের জন্ম হইয়াছিল উষ্ণপ্রদেশে; কিন্তু আহার্যের খোঁজে তাহাকে শীতময় দেশে চলিয়া যাইতে হয়। সেখানকার জলবায়ু তখন তাহাকে আবাস ও পরিচ্ছদ নির্মাণে বাধ্য করে। এইভাবে শ্রমের নূতন পদ্ধতি স্তরে স্তরে মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিয়া দেয়। ক্রমে হাত, ভাষা এবং মস্তিষ্ক—এই তিনটির সহযোগিতায় মানুষ জটিলতর কাজের উপযুক্ত হয়। আর ইহা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমাজগতভাবেই মানুষ তাহার উচ্চ লক্ষ্যকে তখন সার্থক করিতে পারে। মানুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমপ্রণালী এইভাবেই বহুমুখী হইয়াছে এবং ক্রমেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রসঙ্গান্তরে আমরা ইহার বিশদভাবে আলোচনা করিব; সেখানে দেখিব, ফল-সঞ্চয়নের পর মানুষ শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তারপর ইহার আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়াছে পশুপালন; এবং ইহার পর কৃষি, সীবন, বয়ন, ধাতুশিল্প—এবং মৃৎশিল্প; ইহার পর আবার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোদ্যোগ, এবং সর্বশেষে সায়েন্স বা বিজ্ঞান। দেখুন, মানুষের দুইটি মুক্ত হাত তাহাকে কোথা হইতে কোথায় পৌছাইয়া দিয়াছে!

এইরূপ আবার বনমানুষের যূথ হইতে মানব সমাজ; তারপর গোষ্ঠী, এবং গোষ্ঠী হইতে রাষ্ট্র ও রাজ্য। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আইন এবং রাজনীতিও বিকাশ লাভ করিয়াছে; সঙ্গে মানবমস্তিষ্কের অলীক কল্পনা ধর্মও আছে। এই কল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্রকৃতি, হাত, শ্রম, সমাজ সমস্তই পিছনে পড়িয়া যাইতেছে। অথচ ইহাদের সহায়তায়ই মানবমন আজ সর্বেসর্বা। এখন তাহার সার্বভৌমত্বের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুচ্ছ হাত যে একদিন তাহার গঠনে সাহায্য করিয়াছিল ইহা বুঝিবার উপায় নাই। এখন মন প্রথমেই সকল কাজের পরিকল্পনা

ঠিক করিয়া রাখে; পরে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মিলিয়া তাহাকে কার্যরূপে পরিণত করে।

কিন্তু, মানুষ আর পশুতে পার্থক্য কি—এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। পশু প্রকৃতিকে ব্যবহার মাত্র করে,—পশু দ্বারা প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন হয় তাহা শুধু পশুর উপস্থিতির জন্য। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিতে বদলাইয়া লইয়া তাহাকে নিজের সেবক বানাইয়া লয়। এইভাবে মানুষ প্রকৃতির উপর স্বামীত্ব করে এবং এইখানেই পশু হইতে তাহার পার্থক্য। এই পার্থক্যের মূল বিষয়টি অবশ্য শ্রম; শ্রমই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিয়াছে।

মানুষের বিকাশে পরিবেশের প্রভাবও অবশ্য অসামান্য। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টা আমরা বুঝিতে পারি। এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপের মহাদ্বীপগুলি পরস্পর সংবদ্ধ—এই সব স্থানে পালনযোগ্য বন্য গরু, ঘোড়া বা অন্যান্য পশুর অভাব ছিল না। এই জন্য শুধু পশুপালনই নয়, কৃষি প্রভৃতি বিষয়েও এই সব দেশের অধিবাসীরা অনেক উন্নত হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার জঙ্গলে এই রকমের পশু সুলভ ছিল না—তাই কৃষি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রগতিও সম্ভব হয় নাই।

২। বিভিন্ন জাতির মানব

প্রাচীন পাষাণ যুগের* অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সময় আজ হইতে প্রায় দুই লক্ষ বৎসর পূর্বে হইবে। তখন নেঅণ্ডর্থল† জাতীয় মানুষ পৃথিবীতে বাস করিত। খ্রীষ্ট জন্মের বিশ হাজার বৎসর আগে অরিগ্‌নেশিয়ন মানবের‡ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

* Paleolithic Age; † Neanderthal; ‡ Aurignasian.

ইহারা সমস্ত পূর্ববর্তীর তুলনায় বেশি উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে তখন চতুর্থ হিমযুগের সময় চলিতেছিল; তুষারপাতে য়ুরোপের সমগ্র ভূভাগ তখন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। খ্রীষ্ট পূব আট সহস্রাব্দের কাছাকাছি সময়ে চতুথ হিমযুগের অন্ত হয়। অরিগ্নেশিয়ন মানব এই হিংস্র যুগকে কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল—তাই তাহাদের শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ইহারা চামড়ার পোষাক পরিত; এবং সূচীকার্যেও তাহাদের কিছু কিছু পারদর্শিতা ছিল। শীত হইতে বাচিবার জন্য তাহারা গুহায় বাস করিত। নেঅণ্ডার্থলদের কোন শিল্প ছিল না; কিন্তু অরিগ্নেশিয়নদের নিজস্ব শিল্পকলাও খানিকটা ছিল। তাহাদের আবাস গুহায় কিছু অঙ্কিত চিত্র এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অরিগ্নেশিয়নরা প্রথমত লাল ও কাল রঙ দিয়া পশুর চিত্র আঁকিতে পারিত। আদিম শিল্পী প্রথমে রেখা আঁকা শিখিয়াছিল; তারপর তাহাতে উহারা বর্ণ ফলাইতে শিখিয়াছে; এবং ইহার পর অঙ্কনে অভ্যস্ত হইয়া গেলে, কাঠ, পাথর, এমন কি লাকড়ির টুকরায়ও তাহারা কৃতিত্ব দেখাইতে ছাড়ে নাই। অরিগ্নেশিয়নদের চিত্রের মধ্যে লোমশ গণ্ডার, হরিণ এবং বন্য ঘোড়ার প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। শেষ সময়ে এই জাতি ধনুবাণেরও উদ্ভাবন করিয়াছিল। ইহাদের গুহায় প্রাপ্ত অস্থি ও অন্যান্য অবশেষ হইতে মনে হয়, ইহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়া একস্থানেই বাস করিত। সম্ভবত হিমযুগের প্রভাবই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

চতুর্থ হিমযুগের সমাপ্তির সঙ্গে পুরাতন পাষাণ যুগের অবসান হইল। তাহার পর মানব নূতন সম্ভাবনা ও আশা লইয়া নূতন যুগে পা দেয়। হিমপাতের শেষে য়ুরোপে তখন আবার নূতন বনের সৃষ্টি হয়। তৃণপ্রান্তরগুলি আবার ধীরে ধীরে দিগন্তবিস্তারী হইয়া পড়ে। পশুরাও নূতন ভূমিতে চারিদিকে বিচরণ শুরু করিয়া দেয়—সঙ্গে সঙ্গে মাংসাহারী মানুষও পশুর অনুগামী হয়। ইহার পর পৃথিবীতে আবার নূতন যুগ

অর্থাৎ নব পাষাণ যুগের * আবির্ভাব ঘটে—এই যুগ প্রধানত কৃষি ও ধাতুর আবিষ্কারের যুগ।

৩। পশু ও প্রকৃতিতে সংঘর্ষ

প্রাচীন যুগের মানুষের যে সব অবশেষ আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহার মধ্যে জাভার দ্বিপদদের নিদর্শনই সর্বপ্রাচীন। ইহার সময় আজ হইতে প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে অতীত হইয়াছে। 'বিশ্বের রূপরেখা'য় এই সম্পর্কে আমি আগেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। শরীর বিকাশের দিক হইতে জাভার দ্বিপদ ঠিক পরিপূর্ণ মানুষ ছিল না। এমন কি, এখন পর্যন্ত ইহাদের কাঁধের বিকাশ অসম্পূর্ণ ই আছে—অন্য জাতির মানুষের মত তাহাদের কাঁধ খুব ভালরূপ সোজা হইতে পারে নাই। গত পাঁচ লক্ষ বৎসরে মানুষ পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় সকল স্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। জাভা, চীন, ভারত ও আফ্রিকায় ইহার প্রমাণস্বরূপ প্রচুর জীবাশ্ম† পাওয়া যাইতেছে; ইংলণ্ড, জার্মাণী, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশেও এইরূপ প্রমাণের কোন অভাব হইতেছে না। বর্তমানের তুলনায় তখনকার মানুষ খুবই অল্প-সাধন ছিল; নদী, বন, পবত, সমুদ্র সমস্তই তখন তাহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু এই বাধা তাহাদের গতি একেবারে স্থগিত করিয়া দিতে পারে নাই। পুরাতন পাষাণ যুগের কিছু কিছু অস্ত্র ‡ কাশ্মীর, মধ্য-এশিয়া এবং চীনে পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর বীরবল সাহনী এই সম্পর্কে গবেষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। সাহনীর মতে পুরাতন পাষাণ যুগের মানুষ হিমালয়ের এপারে ওপারে যাতায়াত করিত। তখন হিমালয়ের উচ্চতা অবশ্য বর্তমানের অর্ধেক ছিল—

* Neo-Paleolithic ; † প্রস্তরীভূত জীবকঙ্কাল, Fossil ;

‡ পাথরের আদিম অমসৃণ অস্ত্র।

তাই চলাচলের বাধা এখনকার মত এত বিরাট ছিল না। ইহা হইলেও অপর একটি অসুবিধার তাহাদিগকে সর্বদা সম্মুখীন হইতে হইত; অজ্ঞাত স্থানে যাইবার পূর্বে আদিম মানব সেখানে তাহার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিত না; নূতন স্থানে পৌছিয়া নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে বিন্যস্ত করিয়া লইতে তাহাদের অনেক সময় লাগিত। তবে কথা এই, তাহাদের হাতে সময়ের তখন কোন অপ্রাচুর্য ছিল না।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মানুষ জীবনের অধিকাংশ সময়ই আহার অন্বেষণে ঘুরিয়া কাটাইয়া দিত। আজ বানর, শিম্পাঞ্জী কিংবা আফ্রিকার পিগ্‌মি জাতীয় মানুষের জীবনও অনেকটা এইরূপ। পূর্বেকার খাদ্যান্বেষী জীবের আরও একটি বিশেষ অসুবিধা ছিল—পৃথিবীর সকল স্থানে তাহাদের খাইবার মত পর্যাপ্ত ফল মিলিত না; আর মিলিলেও সকল ঋতুতে তাহা এক রকম সুলভ থাকিত না। তারপর অবশ্য শিকারের চলন হইল—কিন্তু শিকারের হাতিয়ার অর্থাৎ মানুষের কাঠ পাথরের আয়ুধ* তখনও আদিম অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। তাই ইহাদের সহায়তায় অল্প সময়ে উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আদিম মানবের সুবিধার মধ্যে ছিল এই যে—সমস্ত পৃথিবী তাহার নিকট খোলা পড়িয়া আছে; তখন পৃথিবীতে ভূমির অভাব ছিল না, অভাব ছিল মানুষের—মানুষ তখন সত্যই একটি দুর্লভ বস্তু ছিল।

মানুষের বাধা বিপত্তির কথা অবশ্য এইখানেই শেষ হইল না। তখন মানুষের শত্রুর সংখ্যা ছিল অপরিসীম। মধ্যয়ুরোপের বাসিন্দাদের খাদ্যসূচীতে মহাগজও† সম্মিলিত ছিল। মহাগজের আকার আজ-কালকার হাতী হইতে অনেক গুণ বড় হইবে। তাই এই প্রাণীটিকে

---

* Tool. † Mammoth.

শিকার করা তখন যে কত বিপজ্জনক ছিল তাহা বোঝা যায়। বিশেষত মানুষের হাতে তখন অমসৃণ কাঠ আর পাথরের টুকরা ছাড়া আর অস্ত্র ছিল না। ইহাদের শিকারে সমতল ভূমির গহ্বর এবং খড়ের সাহায্য নিশ্চয়ই নিতে হইত। তাহা হইলেও শিকারীর জীবন যে এই কাজে একেবারে নিরাপদ থাকিত—তাহা মনে হয় না। সিংহ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সংখ্যাও তখন এখনকার তুলনায় বেশি ছিল। আদিম মানুষকে প্রতিনিয়ত পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং এই যুদ্ধে তাহাকে জয়ীও হইতে হইয়াছে।

ইহা ছাড়া পৃথিবীর জলবায়ু সব সময় একরকম ছিল না। এমন এক সময় ছিল যখন বাঙ্গলার প্রান্তসীমায় আসানসোলেই বরফ পড়িত। আবার এক সময় সেখানে দেবদারুর গভীর বনও ছিল। পাটনা মিউজিয়মে তখনকার দেবদারু গাছের একটি ফসিল রক্ষিত আছে। আজ যে সব অঞ্চলে মানব অবশেষ পাওয়া যায় তাহার বর্তমান জলবায়ু দেখিয়া আদিম মানুষের বিপত্তির কথা কল্পনা করা যায় না। উদাহরণ রূপে শুধু এইটুকু মনে রাখিতে পারি, পৃথিবীর আয়ুষ্কালের মধ্যে চার চারটি হিমযুগ পার হইয়া গিয়াছে; আর ইহার সর্বশেষটি শেষ হইয়াছে মাত্র দশ হাজার বৎসর আগে। বিভিন্ন জাতির মানুষের চক্ষু ও ত্বকের রঙ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। ইহা তাহাদের উপর নানা রকমের জলবায়ুর প্রভাবের প্রমাণ দেয়। গ্রীষ্ম মণ্ডলের অধিবাসীদের চোখের তারা সাধারণত কৃষ্ণবর্ণ হয়, কারণ সেখানে সূর্যের প্রখর আলোক নিবারণের জন্য এই তারকারই প্রয়োজন। শীত প্রদেশের লোকের চোখের তারা আবার তেমনি নীল। সেখানে সূর্যের তেজও মন্দ; তাই চক্ষুর জন্য কৃষ্ণবর্ণের কোন আবরকের দরকার নাই। শীত ও গ্রীষ্ম মণ্ডলের সুবিধা অসুবিধা প্রায়ই ভিন্ন রকমের;—বনমানুষের মত গায়ে লোম না থাকায় শীতের দেশের মানুষের খুব কষ্ট হইত,

চামড়ার পরিচ্ছদ উদ্ভাবন করিবার পর তাহাদের এই কষ্টের অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। দাবাগ্নির সান্নিধ্যে আসিয়া তখন আগুনকেও হয়ত তাহারা শীতের প্রতিষেধক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আগুনের সঙ্গে পরিচয়ের পরও আগুন জ্বালানো তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না। কাঠের ঘষায় যে আগুন জ্বলে—এই তথ্য আদিম মানবের পক্ষে শুধু আবিষ্কার নয়, ইহা তাহার পক্ষে এক শক্তিশালী দেবতার আবির্ভাবের মত। আগুনের পরিচয় পাইয়া আগুন সৃষ্টি করিতে মানুষকে অনেক দিন প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে। কাঠ হইতে আগুনের উদ্ভব দেখিয়া আদিম মানুষ যে কতটা অভিভূত হইয়াছিল, বেদমন্ত্র হইতে তাহা বোঝা যায়। চার হাজার বছর আগে ঋষি অরণি ঘর্ষণের সময় অগ্নিদেবকে প্রকট হইবার প্রার্থনা জানাইতেন।

সমাজ—মানুষ সামাজিক জন্তু; কিন্তু ইহা আদিকাল হইতে নহে, মানুষ মানুষ হইবার পর হইতে। জীববিকাশে মানুষের সমীপ জীব—বানর, বনমানুষ প্রভৃতি যূথবদ্ধ হইয়া বাস করিত। প্রাকৃতিক শক্তি এবং অন্যান্য প্রাণধারী শত্রুর বিপক্ষে ইহা আত্মরক্ষার উপায় ছিল। তাই পশুদের যূথবদ্ধতা কোনদিনই পরিত্যক্ত হয় নাই। জীববিকাশে যূথের অপরিসীম প্রভাব আছে; পরে অবশ্য এই প্রভাব আসিয়াছে সমাজ হইতে। তখন ব্যক্তির প্রযত্ন আর ব্যৈক্তিক থাকে নাই, সমাজের অঙ্গ হিসাবেই তাহা সার্থক হইয়াছে। সমাজ কিভাবে সৃষ্টি হয়—ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ভাষার বিকাশে সমাজ কিভাবে সাহায্য করিয়াছে ইহাও সেখানে বলা হইয়াছে। ভাষাশাস্ত্রী নোয়েরের * কথায়—

...সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য বংশবৃদ্ধদের প্রাচীন শ্রম...

* Ludwig Noire.

এবং সামাজিক প্রযত্ন···হইতেই মানুষের ভাষা ও চিন্তনের সূত্রপাত।'...

ভাষাসম্বন্ধী অনুসন্ধানে জানা যায় যে প্রাচীন শব্দ মাত্রই ক্রিয়াদ্যোতক ; আর এই ক্রিয়াদ্যোতক শব্দও প্রায়ই ধ্বনির অনুকরণে* সৃষ্ট। নামবাচক শব্দ ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের বহু পরে সৃষ্ট হইয়াছে।

মানুষ তাহার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। থাকিলে শুধু তাহার ভাষা নহে, তাহার চিন্তার সূত্রও ছিন্ন হইয়া পড়িত ; কারণ চিন্তা ধ্বনিরহিত শব্দের সমষ্টি। মানুষের সমস্ত কাজেই এইরূপে সমাজের গভীর ছাপ আছে। শিশুকালে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে আমরা সমাজের নিয়ম-নিষেধগুলিও পান করিয়া লই। তাই সমাজের অধিকাংশ বন্ধনই আমাদের কাছে ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠে। সমাজ আমাদের কায়িক বাচিক সকল রকম ক্রিয়ার উপর তাহার ব্যবস্থা ফলায়। কোন কারণে এই ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিলে অন্যের চোখে আমরা অসভ্য, অসামাজিক হইয়া পড়ি। শুক্তির অন্তরে মুক্তার বিকাশ হয় ; মানুষও নিজের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সেইরূপ বিকশিত হইয়া উঠে। পরিবার, পাঠশালা, হাটবাট, ক্রীড়া ও ক্রিয়াক্ষেত্র—সকল স্থানেই তাহার শিক্ষা হয়। এই শিক্ষার সহায়ক মানুষের সমাজ সম্পর্কে বিকাশপ্রাপ্ত ভাষা।

তাই বলিয়া সমাজ কোন অস্পৃশ্য অপরিবর্তনশীল লৌহপ্রাচীর নয়। মানুষের মত সমাজও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। এই পরিবর্তনের রূপ কখনও অব্যাহত ঢেউএর মত—ইহারই নাম হইল ক্রমবিকাশ। আবার কখনও ইহার বেগ আকস্মিক—অনেকটা সদ্যমুক্ত প্রপাতের মত—তখন ইহার নাম হইল বিপ্লব। সমাজ এই দুই গতিতে—বিকাশে

* পত্‌ = পতন।

বিপ্লবে—নিত্যই পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাতে তাহার বাহ্যগঠন বা আভ্যন্তরিক গুণ কোনটাই স্থির থাকিতেছে না; বস্তু, ব্যক্তি, বিচার সমস্তই রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে।

আদিম যুগের মানুষের মধ্যে অন্তঃকলহও কম ছিল না। তবু সম্মিলিত শত্রুব সম্মুখীন হইতে ঐক্যের যে প্রয়োজন আছে—ইহা মানুষ অল্পদিনেই বুঝিতে পারে। প্রকৃতি ও পশুজগতের সঙ্গে অসংখ্য সংঘর্ষের ফলে মানুষের এই সত্য উপলব্ধ হয়। জীবন রক্ষার জন্য পশুও বিরোধী প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু এই দিক দিয়া মানুষ ও পশুর ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পশু প্রাকৃতিক বিপত্তি হইতে নিজেকে বাচাইয়া আনিতে চায়; কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাইয়াই ক্ষান্ত থাকে না—প্রকৃতির বাধক-শক্তির উপর সে নিজের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। যেমন, পশু আগুন দেখিয়া শুধু পলাইতে জানে—কিন্তু মানুষ আগুনের ধ্বংসক গুণ দেখিয়াই তাহাকে বর্জন করে না—সে আগুনের বক্ষক গুণকেও খুঁজিয়া বাহির করে। এইভাবে আগুন একদিন মানুষেব নিশীথ প্রহরীর কাজ পায়; আগুনের শিখা দেখিয়া হিংস্র পশু তখন মানুষের আবাস হইতে দূরে সরিয়া থাকে। তুষারপাতের সময় আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া মানুষ এইরূপে দুরন্ত শীতকে জয় করে। তারপর পোড়া মাংস এবং ভুনা ফলমুলের স্বাদ পাইয়া মানুষ রন্ধনবিদ্যাও আয়ত্ত করে—ইহার ফলে তাহার পাকস্থলীর শ্রমও অনেকটা লঘু হইয়া যায়।

৪। পশু ও মানুষের পার্থক্য

পূর্বেই* বলিয়াছি, বনমানুষ, কুকুর প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণীর মস্তিষ্কেও সম্মুখের বস্তুর প্রতিবিম্ব ফলিত হয়; এবং ইহার সাহায্যে

* 'বিশ্বের রূপরেখা' দ্রষ্টব্য।

তাহারা সামান্য সামান্য চিন্তাও করিতে পারে। তবে এই সমস্ত জীবের চিন্তা শুধু বর্তমান বস্তু সম্পর্কেই সম্ভব হয়। মানুষ অগ্রদ্রষ্টা—সে ভবিষ্যতের সুখ-সুবিধার কথা সকল সময়েই স্মরণ রাখে; এমন কি ভবিষ্যৎ সুখের জন্য উপস্থিত দুঃখকে বরণ করিয়া লইতেও মানুষ কুণ্ঠা বোধ করে না। সম্মুখের তুচ্ছ লাভ ভবিষ্যৎ সুখের কণ্টক হইবে মনে করিলে—উহা মানুষ অক্লেশে ত্যাগ করে। মানুষের সামাজিক সদাচার এইরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরই ফল। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ সামাজিক অবস্থায় এক একরূপ আচার চলিত থাকে; পরে সময় ও অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার-নিয়মেরও রূপান্তর হয়। পশুজগৎ নিজের অস্তিত্ব, শুধু বর্তমান অস্তিত্ব, বজায় রাখিবার জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষে তাহার সহজ জন্মজাত প্রেরণাগুলিই আয়ুধ হিসাবে কাজ করে। কিন্তু মানুষ শুধু বর্তমানের চিন্তা করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষ করে না; এবং সেই সংঘর্ষে তাহার জন্মজাত প্রেরণারই শুধু সাহায্য নেয় না;—মানুষ বর্তমানকে স্বীকার করিয়াও নিজের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তান্বিত হয়; তাহার সমাজ এবং বংশধরদের জন্য সে সহজাত প্রেরণা ছাড়াও বহু নূতন অস্ত্র ও নূতন সাধন আবিষ্কার করিয়া রাখে। এইজন্য মানুষ পশু হইলেও সামাজিক পশু এবং সর্বোপরি সে অস্ত্রধারী পশু; প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে সে অবশ্য পশুর মতই যূথবদ্ধ, কিন্তু পশুর তুলনায় বহু সহস্র গুণ কৌশলী।

৫। মানুষের বিশেষতা

মানুষের মস্তিষ্কের গঠন অর্থাৎ তাহার সেরেব্রম * খুবই বিকাশ প্রাপ্ত। মানুষ চিন্তা করিতে পারে, বিশ্লেষণ করিতে পারে, সমস্যার

* Cerebram.

সমাধান করিয়া নূতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের ক্রোমেগ্নন * এবং নেঅণ্ডর্থল † মানবেরও চিন্তাশক্তি ছিল। তাহারাও অনুভব হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিত এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনা করিয়া পূর্ব হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। আহার অর্জনের জন্য নূতন কৌশল কিংবা শীতাতপের নূতন প্রতিষেধক আবিষ্কার করিতে ইহাদের কষ্ট হইত না। মস্তিষ্কের পূর্ণতার জন্যই মানুষ তাহার ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে না; অনিশ্চয়ের ভীতি ও উদ্বেগ মানুষের পক্ষে স্বভাবতই পীড়াপ্রদ। মস্তিষ্কের বিকাশ মানব বিকাশের সর্বাপেক্ষা বড় সহায়ক; কিন্তু এই মস্তিষ্কের বিকাশে মানুষের অপরাঙ্গের সাহায্যও ভুলিবার নয়। মানুষের নখ, পাঞ্জা প্রভৃতি পশুর মত তীক্ষ্ণ এবং দৃঢ় নয়। বাঘ ভালুকের মত দাঁতের ব্যবহারও মানুষ করিতে পারে না। কিন্তু পায়ের দিক দিয়া মানুষের উৎকর্ষ বেশি; মানুষের পা একা শরীর বহিবার দায়িত্ব নিয়া হাতকে মুক্তি দিয়াছে। ইহা না হইলে শুধু মস্তিষ্কের চিন্তায় হাত কখনও হাতিয়ার ধরিতে পারিত না; আর অমসৃণ পাথরের যুগ হইতে বর্তমান বোমাবর্ষণ পর্যন্ত মানুষের অস্ত্রের উন্নতিও হইত না। তাই শুধু মাথা নয়, হাত ও মাথা এই দুই মিলিয়া মানুষকে সত্যকার মানুষ করিয়াছে। এবং মানুষের চিন্তা ও ভাষা তাহার হাতের ক্ষমতা অর্থাৎ কার্যক্ষমতাকেও বাড়াইয়া দিয়াছে। ইহার সঙ্গে সমাজ-সম্পর্কের কথা আমরা আগেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

মানুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নয়, সে প্রকৃতিরই অঙ্গ; তবে এই অঙ্গ বিকাশের শিখরে পৌছিয়া গিয়াছে। তাই প্রকৃতির অপর অঙ্গের সঙ্গে ইহার ভেদও স্বাভাবিক। মানুষ প্রকৃতির সাবালক পুত্রের মত;

* Cromagnon; † Neanderthal.

সেইজন্য প্রকৃতি সম্পর্কে তাহার জিজ্ঞাসা আছে, তাহার আচরণে 'নন্নু' 'ন চ' প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। প্রকৃতির দেওয়া জিনিস মানুষ চক্ষু মুদিয়া গ্রহণ করেন না; প্রকৃতির দান সে সংশোধন করিয়া আরও অধিক উপযোগী করিয়া লয়।

(১) **মস্তিষ্কের অপূর্ব শক্তি**—আদিম মানুষ * হইতে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বের মানুষ † পর্যন্ত হাতিয়ার-পত্রের বিশেষ বিকাশ হয় নাই। দীর্ঘ সময় ধরিয়া চকমকি কিংবা অন্য কোন শক্ত পাথরে শান দিয়াই হাতিয়ার তৈয়ারী হইত। ইহাতে বোঝা যায় যে বিকাশের প্রথম দিকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাওয়া খুব সহজ ছিল না। অবশ্য সেইজন্য এই দীর্ঘ সময় মানবমস্তিষ্ক যে একেবারে অলস বসিয়া রহিয়াছে তাহাও নয়। তখনও বহু নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে। এখনকার তুলনায় তাহা নগণ্য হইতে পারে; কিন্তু মানুষের প্রারম্ভিক বিকাশে তাহারও যথেষ্ট দাম ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, ‡ নব পাষাণ যুগের মানুষ কাঠ, পাথর ও অস্থি দিয়া হাতিয়ার তৈয়ার করিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সীবন-বয়নেও তাহাদের কিছু কিছু হাত ছিল; গৃহনির্মাণ বা আগুনের বিভিন্ন ব্যবহারও তাহাদের আজানা ছিল না। ইহা হইতে মানবমস্তিষ্ক যে এই দীর্ঘ যুগ অলস থাকে নাই তাহা বুঝিতে পারি। তবে যত পেছনে যাওয়া যায়, মানুষের আবিষ্কারের গতিও তত মন্থর হইয়া আসে। বর্তমান কালে ইহার বেগ অবশ্য খুবই তীব্র; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মানুষ শক্তিসঞ্চালিত যন্ত্রের কথা ভাবিতে শিখে; ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া যন্ত্রের পরিপূর্ণ উপযোগ আরম্ভ হয়।

---

* তিন লক্ষ বৎসর পূর্বের হায়ডেলবর্গীয় (Heidelberg) মানুষ। † আমাদের স্বজাতি মানুষ। ‡ 'বিশ্বের রূপরেখা' দ্রষ্টব্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আবার বিদ্যুৎও ব্যবহারে লাগিয়া যায়—আজ পর্যন্ত ইহার বিকাশের কথা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিমান-পোত, বেতারবার্তা, রঞ্জনরশ্মি—সমস্তই বর্তমান শতাব্দীর আশ্চর্য আবিষ্কার; মাত্র বার বৎসর আগের সৃষ্টি কথাচিত্রই বা ইহা হইতে কম কিসে?

সমাজ—সমাজের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন—

"...আপন আপন ক্রিয়া দ্বারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তারকারী মানুষের বিস্তৃত সংগঠনের নাম সমাজ...পরস্পরের উপর প্রভাবকারী সকল রকম ব্যৈক্তিক ক্রিয়াই সমাজের উপর স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায় ...সমাজ প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরিশ্রম অর্থাৎ ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর স্থাপিত।"

প্রকৃতি আদিম কাল হইতেই মানুষকে সম্মিলিত ও সংগঠিত থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহা না হইলে তাহাদের পক্ষে মানুষ হিসাবে নিজের অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হইত না। মানুষের এই সংগঠন-সম্মিলন তাহার সমাজজীবনে প্রয়োজনীয় বস্তুপাতির উৎপাদন-সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজ প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টি। এখানে ব্যক্তি নিরন্তর একে অন্যকে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে। একটি অধুনাতন উদাহরণ দেখুন:—এক ব্যক্তি হাটে গিয়া জিনিস খরিদ করিতেছে। ইহার ফলে বাজারের দরের উপর তাহার প্রভাব পড়িবে। কারণ, তাহার উপস্থিতিতে ক্রেতার সংখ্যা কিছুটা বাড়িয়া গেল; এবং তাহার ক্রয়ের ফলে বিক্রয়বস্তুর অংশও কিছু হ্রাস পাইল। এইভাবে ক্রেতার বৃদ্ধি এবং বস্তুর হ্রাসে মূল্যেরও বৃদ্ধি ঘটিল। বাজার দরের উপর একজন ক্রেতার প্রভাব খুব সামান্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও প্রভাব—পরে এই একক প্রভাবগুলিই

সমষ্টিগত হইয়া কাজ করে। পুকুরে ঢিল ছুঁড়িলে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া তাহা তীর স্পর্শ করে; পণ্যমূল্যের প্রভাবও এইভাবে হাট হইতে রাষ্ট্র এবং অন্তঃ-রাষ্ট্রীয় জগতে প্রতিফলিত হয়। হিন্দুদের বিবাহের সময় পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়ান; ইহাতে পাড়াপড়শীর মনে ধর্ম বিষয়ে অনুকূল প্রভাব পড়ে। পরে অন্যান্য সদৃশ প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়া ইহা পৃথিবীতে ধর্মের ভিত পাকা করিয়া দেয়। তারপর দক্ষিণা লইয়া পুরোহিত বাজারে গেলে তিনি বাজারদরের উপরও প্রভাব বিস্তার করেন। সমাজের কোটি কোটি ব্যক্তি এইভাবে প্রবাহে জলবিন্দুর মত একত্র হইয়া আছে।

সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি; কিন্তু শুধু ব্যক্তির সমষ্টি বলিলেই সমাজের পূর্ণরূপ প্রকাশ হয় না। পরিমাণ অর্থাৎ মাত্রা বস্তুর গুণে কিভাবে পরিবর্তন ঘটায়—তাহা অন্যত্র * আলোচনা করিয়াছি। ব্যক্তির সহযোগে সৃষ্ট সমাজের মধ্যেও এইরূপ গুণাত্মক পরিবর্তন হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক্ ভাবে যেরূপ কাজ বা চিন্তা করে—সামাজিক পরিবেশে আসিয়া তাহা আর ঠিক সেইরূপ থাকে না; কারণ সমাজ তাহার চিন্তা এবং কার্য সমস্তই প্রভাবিত করিয়া ফেলে। সভা, মিছিল প্রভৃতি জনসন্নিবেশে মানুষ প্রকৃতই স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়; আর উহা না হইলে অন্তত ইহা দ্বারা প্রভাবিত যে হয় তাহা নিঃসন্দেহ। ঘড়ির কলকব্জার যোগফল হইতে আসল ঘড়িটি গুণের দিক দিয়া অনেক বেশি; —ঠিক সেইরূপ সমাজও শুধু ব্যক্তির সমষ্টিমাত্রই নয়, তাহাও ব্যক্তির যোগফল হইতে গুণের দিক দিয়া বড়। এইজন্যই সমাজ = মানুষ + মানুষ নয়, সমাজ = মানুষ × মানুষ।

ব্যক্তির প্রত্যেক ক্রিয়াকর্মের প্রভাবই সমাজের উপর পড়ে—

---

* 'বিশ্বের রূপরেখা' এবং 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ'

কিন্তু তাহা একটু পরিবর্তিত রূপে। সমাজ যত ছোট হয় তাহার উপর ব্যক্তির ক্রিয়ার প্রভাবও তত বেশি পড়ে এবং সময়ও তাহাতে কম লাগে। কারণ এই সমাজে ব্যক্তি পরস্পরের নিকটে আসিতে পারে, ইহাতে তাহাদের পারস্পরিক বিচার-বিনিময়ের সুবিধা হয়। ব্যক্তি যে সমাজের উপর প্রভাব ফলায় তাহা একক ভাবে নয়—ইহাও সংঘ-বদ্ধ ভাবে। ভাষা, রাজনীতি, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন—এমন কি ফ্যাশন, রীতিরেওয়াজ পর্যন্ত সমস্তই সমাজের উপজ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্বন্ধ, তাহাদের পারস্পরিক প্রভাব এবং এই প্রভাবের নিরন্তর সঙ্গতির মধ্য দিয়া এই সবের সৃষ্টি। সমাজেব মানস-জীবনও বহু ব্যক্তির বিচার-ভাবনার যোগফলমাত্র নয়। ইহাও ব্যক্তির পবস্পার-সম্পর্কের দান এবং তাহা বৈ্যক্তিক চিন্তা হইতে বহুলাংশে পবিবর্তিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্য মানব সমাজ

এঙ্গেলস্ মানবসমাজকে তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন—বন্য, বর্বর ও সভ্য। ইহাদের মধ্যে বন্য মানবসমাজের ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। নেঅণ্ডর্থল, গ্রিমাল্‌দী, ক্রোমেগ্নন প্রভৃতি মানুষের সমস্ত জীবন বন্য যুগে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। নানা প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীতে চারবার হিমযুগ নামিয়া আসিয়াছিল; ইহার সর্বশেষ হিমযুগটি মাত্র দশ হাজার বৎসর আগে শেষ হইয়াছে। এই চারটি হিমযুগের মধ্যে পৃথিবীতে বহু মানবজাতির উত্থান ও বিলয় হইয়াছে। চতুর্থ হিমযুগ হইতে আজ পর্যন্ত যে জাতি নিজের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহারা সেপিয়ন মানব; সেপিয়ন মানব বর্তমান মানবজাতি সমূহের পূর্বপুরুষ। অন্যান্য আদিম জাতির মত ইহারাও ফলমূল খাইয়া বাঁচিয়া থাকিত; এবং মাছমাংস ভোজনের জন্য অমসৃণ পাথরের অস্ত্র দিয়া শিকারও করিত। এই সমস্ত জীবনপ্রণালী তাহাদিগকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে হয় নাই—বংশানুক্রমের ফলে এই সব পূর্ব হইতেই তাহাদের আয়ত্ত ছিল।

(ক) আদিম সাম্যবাদ

বন্য মানবের নিকট সাধন অর্থাৎ জীবনযাত্রার উপযোগী অস্ত্র-শস্ত্র ও কলাকৌশল কম ছিল। তাই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যক্তি হইতে তাহাকে সমাজের উপর বেশি নির্ভরশীল হইতে হইত। এইজন্য বন্য সমাজে যে যৎসামান্য সম্পত্তি হইত তাহাতেও সমূহেরই

অধিকার থাকিত। এখানে সম্পত্তি বলিতে যাহা বুঝায় তাহার প্রায় সমুদয় বস্তুই খুবই তাড়াতাড়ি অব্যবহার্য হইয়া পড়িত। ফলসঞ্চয়ের পর শিকারের যুগে আসিয়াও নিহত পশুর মাংস তাহারা বেশি দিন সঞ্চিত রাখিতে পারিত না। এইভাবে সংগ্রহ ও সঞ্চয় উভয়ই কম হওয়াতে তাহাদের সম্পত্তিও কম ছিল। তবে এই সামান্য সম্পত্তিতেও সমাজের সকলের সম্মিলিত অধিকার থাকিত—কারণ এই সম্পত্তি সকলের সম্মিলিত শ্রমে সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সামাজিক অবস্থার নাম আদিম সাম্যবাদ। আদিম সাম্যবাদী যুগে উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ ছিল না, ধর্ম ছিল না; এমন কি সমাজ ছাড়া মানুষের পৃথক অস্তিত্বও ছিল না।* তখন শত্রুর আক্রমণ হইতে একে অপরকে রক্ষা করিত; সকলে একত্র হইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত এবং একত্রই ভোজন করিত। সামাজিক প্রয়োজনে তখন সকলে এক সঙ্গে শ্রম করিত; আবশ্যক বস্তুপাতির উৎপাদনও সামূহিক ভাবেই হইত। এইজন্য তখন সম্পত্তি সামূহিক না হইয়া কোন উপায় ছিল না। আদিম সাম্যবাদী সমাজের শেষাশেষি এই অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়—তখন হইতে সম্পত্তি অর্থাৎ ব্যৈক্তিক সম্পত্তি এবং অসমানতার সূত্রপাত হইতে থাকে।

১। মাতৃসত্তা ও বিবাহ

আদিম সাম্যবাদী সমাজের আব এক বিশেষত্ব স্ত্রীজাতির প্রাধান্য। এইজন্য সেই সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃসত্তাক সমাজ বলা হয়। বানর বা বনমানুষের যূথস্বামী সর্বদাই পুরুষ হইত; কিন্তু আদিম মানুষের যূথকর্ত্রী ছিল স্ত্রী। প্রথমত ইহা খুব আশ্চর্যজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। প্রাচীন

* ভাষাশাস্ত্রীদের মতে ভাষায় প্রথম উত্তমপুরুষের বহুবচনান্ত পদ সৃষ্টি হইয়াছে: এবং ইহার পরে একবচনান্ত পদ অর্থাৎ 'আমি' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে।

ও আধুনিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে এ যাবৎ বহু গবেষণা হইয়াছে। ইহাতে নৃতত্ত্ববিদেরা মাতৃতন্ত্রের কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন। তাই এখন ইহাকে কোন বুদ্ধিবিরুদ্ধ সংবাদ বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। বানর বা অন্যান্য জাতির জীবের মধ্যে তাহাদের কোন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাণ্ডী যূথস্বামিত্ব করে। কিন্তু ইহারই বা কারণ কি? কারণ এই যে, যূথের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা বলবান। তাহার দাপট হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া যূথের আর যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যা অবশ্য বেশি; কিন্তু সংঘশক্তির মূল্য তাহারা ততটা বুঝে না, অথচ এই যূথ-স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া একা আত্মরক্ষার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। এইজন্য পশুসমাজে শেষ পর্যন্ত বলই সর্বজয়ী হয়, এবং বলবানের হাতে গিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপেই যূথের নেতৃত্ব পড়ে। কিন্তু মানুষের সমাজে ব্যক্তির বল তত প্রাধান্য পায় না। মানুষ বহু আগেই সংঘ-শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছে; তাই আদিম অবস্থায়ও তাহার কোন যূথপের প্রয়োজন হয় নাই। ইহার পরিবর্তে মানুষ পরিবার সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই পরিবারের অধ্যক্ষা হইয়াছে স্ত্রীলোক অর্থাৎ পত্নী এবং মাতা।

ফলসঞ্চয় মানুষের প্রথম জীবনোপায়; ইহার পর মৎস্য ও পশু শিকার করিয়া মানুষের জীবিকা নির্বাহ হইত। এই দুই অবস্থাতেই সমাজে স্ত্রীনেতৃত্ব প্রচলিত ছিল। এই সময়ে নিশ্চিত বিবাহ বা পতিপত্নী-সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল না। মাতৃপরিবারের যে কোন পুরুষের সংসর্গেই তখন স্ত্রীলোক গর্ভিনী হইত। কিন্তু পরিবারের কর্ত্রী ইহাকে বড় সুনজরে দেখিত না; তাহাদের কোপের কারণ অবশ্য অন্যরূপ:—তখন মাতা মাত্রেই ভবিষ্যতে পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণের আশা করিত; ইহাতে পুরাতন কর্ত্রীর কর্তৃত্বের কাল দীর্ঘ হইতে পারিত না। মাতৃকর্তৃক পরিবার এই কারণে প্রায়ই ছোট হইত।

একজন জীবিতা মাতা এবং তাহার সন্তানসন্ততি লইয়াই এই পরিবারের গঠন। এঙ্গেলস্ এই যুগের স্ত্রীপুরুষ-সম্পর্ককে যূথবিবাহ* আখ্যা দিয়াছেন। কারণ বিবাহ তখন ব্যক্তিগত হইত না; এবং এই বিবাহে ব্যক্তির স্থানে যূথেরই প্রাধান্য থাকিত। যৌনসম্পর্কের দিক দিয়া মাতৃকর্তৃক পরিবার মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ শুধু স্ত্রী এবং পুরুষ। ইহার এক বর্গের সঙ্গে অপর বর্গের যৌথ পতিপত্নীসম্বন্ধ স্থাপিত হইত। পরিবারের সমস্ত স্ত্রীলোক এই হিসাবে নরযূথের পত্নী; এবং সমস্ত পুরুষও সেইরূপ নারীযূথের পতি।

অনেক পণ্ডিত মাতৃসত্তাক পরিবারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যূথবিবাহকে মানিতে চান না। কিন্তু বহু ভ্রাতায় এক পত্নী বিবাহ করার প্রথা তিব্বতে এবং আরও অন্যান্য দেশে এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে এক বর্গ, অর্থাৎ পুরুষবর্গের দিক হইতে যূথবিবাহই বলিতে হয়। নারীকর্তৃত্বের সমাজেও অবশ্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন আসিয়া গেল। জীবিকা অর্জন ব্যাপারে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া পুরুষ নারীর কর্তৃত্ব কাড়িয়া লইল। পুরুষের বৈয্যক্তিক বিশেষতাগুলিও এই বিষয়ে তাহার সহায়ক হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিম যুগের শিকার বা ফলসঞ্চয়ের কাজে নারী পুরুষের পশ্চাতে ছিল না। তখন ঘরে ও বাহিরে কিংবা চুল্লীতে ও হাল্কা কাজে নারীপুরুষের কোন কর্মবিভেদ হয় নাই। মাতৃকর্তৃক সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি পরিবারের কর্ত্রী অর্থাৎ মাতার পরিচয় জানিত। যূথবিবাহের সন্তান বলিয়া তাহাদের পক্ষে পিতৃনিরূপণ সম্ভবও ছিল না। তাই পিতা বা পুরুষের সঙ্গে পরিবারের ব্যক্তিদের মাতার মত ঘনিষ্ঠতা হইত না। সেই সময় স্ত্রীপুরুষের সংসর্গাদি ব্যাপার

* Group Marriage.

নিজ নিজ পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই সম্পন্ন হইত। কারণ সমগ্র পরিবারকে মিলিত হইয়া তখন জীবিকা অর্জন করিতে হইত এবং শত্রুর সম্মুখীনও সামুহিক ভাবেই হইতে হইত। তখন জীবিকার জন্য মানুষকে সকল সময় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। নূতন অর্জনক্ষেত্রের প্রয়োজন হইলে সেখানে বর্তমান যাযাবরের মত দুই পরিবারে কলহ বাধিয়া যাইত। এই অবস্থায় পরিবারের বাহিরে গিয়া যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করা ব্যভিচার বলিয়াই গণ্য হইত। ইহাতে পরিবারের অল্পসংখ্যক স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সম্পর্কজনিত বিধিনিষেধ থাকা সম্ভব ছিল না। নিকট-সম্পর্কিতের সহিত বিবাহ শুধু আদিম যুগে নহে, ঐতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল। অনেক স্থানে এই প্রথা এখনও একেবারে রহিত হয় নাই। মাদ্রাজে তমিলদের মধ্যে, এমন কি তমিল ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মাতুলের সঙ্গে ভাগিনেয়ীর বিবাহ হয়।* মিশর ও ইরাণের শাসকবর্গের মধ্যে ভ্রাতাভগিনীর বিবাহের বহুতর দৃষ্টান্ত মিলিবে। ইরাণে একসময় মাতৃবিবাহের প্রথাও প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চমষষ্ঠ শতকের ভারতীয় গ্রন্থকার পারসীকদের মাতৃবিবাহ সম্বন্ধীয় লোকাপবাদ উল্লেখ করিয়াছেন।

২। উৎপাদনের সাধন ও হাতিয়ার

আদিম সাম্যবাদী সমাজ অনেকগুলি মাতৃকর্তৃক পরিবারে বিভক্ত ছিল—ইহাদের স্ত্রীপুরুষ কাঠ, পাথর এবং হাড়ের অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিত। শীতের জন্য চামড়ার পোষাক তৈয়ার করিবার কৌশলও তাহাদের জানা ছিল। তখন খাদ্যের মধ্যে ফলমূল এবং

* শুক্রনীতিতে উদ্ধৃত বৃহস্পতির উক্তিতে আছেঃ—পূর্বে মৎস্য ভোজনম্, মধ্যদেশে শিল্পী কর্মকারচ গবাচীন। দক্ষিণে মাতুলকন্যা ববাহ, উত্তরে ব্যভিচাররতা স্ত্রীলোক মদ্যপ।

মৎস্যমাংস উভয়ই প্রচলিত; তবে দেশভেদে তাহার মধ্যে বস্তুগত তারতম্যও কিছু কিছু ছিল। সুইজরল্যাণ্ডের লোকের তখন বিশেষ খাদ্য ছিল ভল্লুকের মাংস; শতের অনুপাতে ইহার স্থান তাহাদের মোট খাদ্যবস্তুর নব্বই ভাগ হইবে। মোরাভিয়ার লোকেরা তাহাদের খাদ্যের মধ্যে তখন মহাগজকে ঐরূপ স্থান দিয়াছিল; এবং ডেন্‌মার্কের অধিবাসীরা শুক্তি, শামুক এবং মৎস্যের সাহায্যে খাদ্যের পূর্বোক্ত পরিমাণ পূর্ণ করিত।*

৩। সম্পত্তি

এঙ্গেলস্ লিখিয়াছেন যে আদিম সাম্যবাদী সমাজেও সম্পত্তির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় পরিবারগুলিতে শুধু নিজেদের উপযোগী জিনিসপত্রই তৈয়ারী হইত। কিন্তু ক্রমে উৎপাদন-বণ্টনের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থা কাটিয়া যায়। তখন বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে জিনিষপত্রের অদলবদল হইতে থাকে; এবং এইভাবে বিনিময় হইতে ধীরে ধীরে বিক্রয়ের নূতন প্রথা আবিষ্কৃত হয়। বিক্রয় শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপযোগী বস্তু ছাড়া মানুষ পণ্য নির্মাণে মন দেয়। ইহাতে সমাজে নূতন অসমানতা আসিয়া যায় এবং কম্যুনের† সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তিগত তারতম্যেরও সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা অবশ্য আদিম সাম্যবাদের অন্তিম সময়ের। তখনকার দিনে ঐতিহাসিক যুগবিভাগের সীমা খুব স্পষ্ট হইতে পারে না। কোথাও কোন অবস্থা দশ হাজার বৎসর পূর্বে লোপ পাইয়াছে; আবার কোথাও তাহা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ পৃথিবীতে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের যুগ; কিন্তু ভারতবর্ষে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার বিলোপ হইয়াছে কি?

* 'বিশ্বের রূপরেখা' দ্রষ্টব্য। † পরিবার সমবায় (Commune).

পৃথিবীর বহু স্থান হইতে দাসপ্রথা অনেক আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু নেপাল রাজত্বে ১৯২৫ খ্রীষ্ট সন পর্যন্ত ইহা আইনসঙ্গত ছিল।

বিকাশক্রম হইতে মোটামুটি দেখা যায়, আদিম সাম্যবাদী সমাজ অর্থাৎ আদিম কম্যুন এবং জনসত্তা—এই উভয়েই মাতৃকর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল। আর ব্যৈক্তিক সম্পত্তির স্থান ইহাদের মধ্যে বড় একটা ছিল না। কিন্তু জনসত্তার পরই পিতৃসত্তা বা পিতৃকর্তৃত্বের কাল; এই সময় হইতে দাসতা এবং ইহার পর ক্রমে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। আদিম কম্যুনগুলিতে শ্রেণীভেদ ছিল না—সেখানে 'কামকর' * এবং 'কামচোর' † এই দুইটি বিরোধী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় নাই। তাই সমাজে শোষণ বলিয়া কিছু ছিল না; আর শোষণ কায়েম রাখিবার জন্য সমাজের এক বিশেষ শ্রেণী অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর শাসনও ছিল না।

* শ্রমজীবী, যে আত্মশ্রমে জীবিকা অর্জন করে। † পরিশ্রমজীবী বা শ্রমসেবী, অর্থাৎ যে অপরের শ্রম ভোগ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

বর্বর মানব সমাজ

আদিম কম্যুনগুলির পরবর্তী অবস্থায় এঙ্গেল্‌স্‌ কথিত বর্বর মানব সমাজের উদ্ভব হয়। বর্বর মানব সমাজে প্রথমত মাতৃসত্তা প্রচলিত ছিল। পরে পরিবার ও কম্যুনগুলির পরিণতির ফলে জনসত্তা বা গোত্রবাদের সৃষ্টি হয়। জনসত্তার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃসত্তা লোপ পায়, এবং তাহার স্থলে পিতৃকর্তৃত্ব বা পিতৃসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতেই স্ত্রীজাতির অবস্থা যে সমাজে খুব হীন হইয়া গেল এমন নহে; কিন্তু পিতৃসত্তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শ্রেণীভেদের গোড়াপত্তন হয়।

(ক) জনযুগ

১। জন কি?

বন্য অবস্থার পরবর্তী সামাজিক স্থিতিকে এঙ্গেল্‌স্‌ 'জন' বলিয়া লিখিয়াছেন। 'জন' প্রাচীন হিন্দীয়ুরোপীয় ‡ শব্দ; ইহার অর্থ মনুষ্য বা মনুষ্য জাতি। কিন্তু এঙ্গেল্‌সের অর্থে 'জন' মনুষ্য জাতি নহে; তাঁহার অর্থে 'জন' একবংশাগত মনুষ্য সম্প্রদায়। ভারতীয় ভাষায়ও জন শব্দের এইরূপ প্রয়োগ ছিল; কিন্তু সমাজবিকাশের কোন বিশেষ অবস্থা বুঝাইবার জন্য তাহার প্রয়োগ হইত না। হিন্দীআর্যেরা অফগানিস্তানে কিংবা সিন্ধুসমীপে পৌঁছিবার সময় বিভিন্ন জন বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তাহারা যে সব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহার নাম তাহাদের জনের নাম হইতে প্রাপ্ত।

---

‡ Indo-European.

শিবি জন* যে দেশে বাস করিত তাহার নাম শিবি জনপদ†; পক্‌থ অর্থাৎ পঠানগণের অধ্যুসিত দেশের নাম হইয়াছিল পক্‌থ জনপদ; এইরূপ মদ্রদের অধিবাস স্থলের নাম মদ্র জনপদ এবং মল্লদের বসতির নাম ছিল মল্ল জনপদ। আর্যেরা পঞ্জাব সীমা অতিক্রম করিলে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশেও তাহাদের জনের নাম অনুযায়ী জনপদের নামকরণ আরম্ভ হয়। সংস্কৃত ভাষায় জনপদ এবং জন এই দুই শব্দের অভিন্নার্থক প্রয়োগও আছে। বহু ব্যক্তির সমষ্টি বলিয়া জন শব্দের স্থলে ইহার অর্থ বুঝাইবার জন্য জনের নামের বহুবচনান্ত ব্যবহারও দেখা যায়। এইরূপ মদ্রাঃ, মল্লাঃ প্রভৃতি শব্দে শুধু জন বা গোষ্ঠী না বুঝাইয়া জনপদকেও বুঝাইয়া থাকে। তাই মদ্রাঃ বলিতে শুধু মদ্রজনীয়কেই বুঝাইবে না,—মদ্রজনের অধ্যুসিত জনপদকেও বুঝাইবে। এইভাবে ভারতীয় জন শব্দটি হিন্দীয়ুরোপীয় জন শব্দের সমার্থবাচক, তবে পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা সমাজবিকাশের কোন বিশেষ অবস্থা বুঝায় না। হিন্দীয়ুরোপীয় ভাষায় জন বলিতে আদিম কম্যুনের পরবর্তী শ্রেণীভেদহীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দীআর্যেরা পঞ্জাব বা অফগানিস্তানে বাস করিবার সময় সেই সমাজে মাতৃসত্তা ছিল না, তাহাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃসাত্তিক ছিল। ইহার উৎপাদনবণ্টন ঠিক কম্যুনের নিয়ম অনুযায়ী হইত না; কারণ আর্যদের মধ্যে তখন ব্যৈক্তিক সম্পত্তির বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাহা হইলেও সপ্তসিন্ধুনিবাসে অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশে থাকিবার সময় আর্যদের সমাজে বৈষম্য বিশেষ ছিল না। অনুগঙ্গদেশে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আর্যসমাজে বিষমতার সৃষ্টি হয়। কুরুপঞ্চালে বসতি স্থাপনের পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অর্থগত ও জাতি-গত শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদের উদ্ভব ঘটে।

* শিবি গোষ্ঠীর মানুষ; † শিবি দেশ

ভারতীয় সমাজের বর্ণনায় জন অপেক্ষা গোত্র শব্দই সামাজিক অবস্থা বুঝাইতে বেশি সহায়ক হইবে। গোত্র বলিতে গোরক্ষার সাধন অর্থাৎ চারণভূমি এবং গোপালকদিগকে বুঝা যায়। হিন্দীআর্য-সমাজে গোধনই প্রধান ধন ছিল; এইজন্য একবংশজ সমুদয় ব্যক্তিকে বা সেই বংশকেই গোত্র বা গোযূথের রক্ষক বলা চলিত। জন অবস্থায় আসিয়া য়ুরোপীয় সমাজে পশুপালন সবে আরম্ভ হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই সময় গোপালন রীতিমত উন্নত এবং সমৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এঙ্গেল্‌সের পরিভাষায় এই যুগকে তাই পিতৃসত্তার যুগ বলিয়া ধরিতে হয়। ভারতীয় পিতৃসত্তা বা তাহার গোত্রকালের জ্ঞান আমাদের প্রকৃতই খুব কম। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি বিখ্যাত গোত্রের নাম আমরা জানি, কিন্তু ইহাদের একটিও প্রাচীন গোত্রযুগ বা পিতৃসত্তা-কালের পরিচয় নয়। এইসব গোত্রকর ঋষি সকলেই ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সমসাময়িক—তাঁহারা গঙ্গার আশপাশের প্রদেশগুলিতে বাস করিতেন। সম্ভবত কুভা * এবং সুবাস্তু† উপত্যকায় থাকিবার সময় আর্যদের মধ্যে গোত্রসত্তা সৃষ্টি হয়। এই সময়টি ভারতীয় সমাজের জনসত্তা ও পিতৃসত্তার মধ্যবর্তী কাল হইতে পারে।

ববর যুগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে জনসত্তার প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে এই অবস্থা বিকাশের চরম শিখরে পৌছিলে সমাজদেহে নূতন রূপান্তর ঘটে। জনসাত্তিক সমাজ হইতে তখন নূতন শিশু পিতৃসত্তার জন্ম হয়। সমাজ-লক্ষণের দিক দিয়া পিতৃসত্তা জনসত্তার বৈরীস্বরূপ। তাই ইহার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সমাজব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। জনসাত্তিক সমাজের মানুষ লিপি আবিষ্কাব করে নাই; ছন্দ বা গীতেও তাহাদের তেমন পারদর্শিতা ছিল না,—অথবা হইতে পারে, তাহাদের গীত-

* কাবুল; † স্বাত।

কুশলতার পরিচয় আমাদের কাছে পৌঁছে নাই—হাজার বৎসর* পূর্বের জনযুগীন নিদর্শন সত্যই আমাদের নিকট খুব কম। কিন্তু তবু সমাজের বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র একভাবে ঘটে নাই। বহুজাতির মধ্যে এখনও আদিম জনসত্তা ও পিতৃসত্তার যুগ চলিতেছে। ইহাদের সমাজ-লক্ষণ পাঠ করিয়া অতীত যুগের অনেক মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। মর্গেন আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়নদের জীবনরীতি অন্বেষণ করিয়া এইরূপ বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। মর্গেনের গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া এঙ্গেল্‌স্ জনসত্তার যুগ† সম্পর্কে বলিতেছেন—

"আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়নদের অবস্থা জনসমাজের‡ পরিপূর্ণ বিকাশের নিদর্শন। ইহাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী॥ বহুভাগে, মূলত দুই ভাগে অর্থাৎ দুই জনতে§ বিভক্ত থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যেক জনতও বহু জনতে বিভক্ত হইয়া যায়, তখন এইসব নূতন জনতের সঙ্গে প্রথম জনতের ভ্রাতৃকণ¶ সম্বন্ধ হয়। পুরাতন গোষ্ঠী সেখানে এই ভাবে বহু ছোট গোষ্ঠীর রূপ নেয়; কিন্তু প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই সেই পুরাতন জনত বজায় থাকে। কোন স্থানে সম্বন্ধী গোষ্ঠীগুলি একটি সংঘ দ্বারা পরস্পর সম্পর্কিত হয়। এই অবস্থায় যে সংগঠন উপযোগী, লাল ইণ্ডিয়নদের সংগঠন ঠিক তাহাই; এবং তাহাদের ঝগড়া, মতভেদ প্রভৃতির মীমাংসার জন্য এই সংগঠনই পর্যাপ্ত। বাহিরের ঝগড়া তাহারা যুদ্ধ দিয়া মীমাংসা করে;—তাহাতে একটি গোষ্ঠী একেবারে নাশ হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়; কিন্তু নির্জিত গোষ্ঠীকে ইহারা কখনও পরতন্ত্র করে না। ইহা জনসত্তার সত্য, কিন্তু সীমিত, স্বরূপ—এখানে পরতন্ত্রতা বা দাসতার কোন স্থান নাই। জনসমাজের মধ্যে অধিকার

---

* একহাজার নয়, কয়েক হাজার; † বর্বর সমাজের পূর্ববর্তী; ‡ Gens; ॥ Tribe; § Gentes; ¶ Phratry.

এবং কর্তব্য পৃথক বস্তু নয় .....সার্বজনিক কাজে সামিল হওয়া, বংশগত ভাবে প্রতিশোধ লওয়া, কিংবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি বা স্বস্তির জন্য কাজ করা—ব্যক্তির অধিকার না কর্তব্য এই বিচার সেখানে অর্থহীন। আহার, নিদ্রা এবং শিকারের মত এইসব বিষয়েও অধিকার বা কর্তব্যের কোন ভেদাভেদ নাই।

"ইণ্ডিয়নদের মধ্যে জনসংখ্যা খুব কম; তাই তাহাদের আবাদী ভূমিও খুবই কম। ইহাদের মধ্যে বসতিগুলিতে জনসংখ্যা ঘন। তাহাদের আবাদী জমিব চারিদিকে বিস্তৃত শিকারক্ষেত্র এবং শিকারক্ষেত্রের চাবিদিকে আবার অরণ্যের বেষ্টন; এই প্রাকৃতিক অবরোধ জনবসতির রক্ষাপ্রাচীবের মত কাজ করে; এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীব সীমান্ত হিসাবেও ইহার মূল্য আছে। লাল ইণ্ডিয়নদের মধ্যে শ্রমবিভাগ খুবই স্বাভাবিক, অর্থাৎ ইহা শুধু স্ত্রীপুরুষের কাজ সম্পর্কে। পুরুষ সেখানে যুদ্ধ করে, মাছ এবং পশু শিকার করে, এবং প্রয়োজনমত অস্ত্র নির্মাণ কবে ও খাদ্য সংগ্রহ করে। স্ত্রী ঘরের কাজের তত্ত্ব নেয়, খাওয়া পরার বন্দোবস্ত করে এবং সীবন, বয়ন ও রন্ধনে ব্যাপৃত থাকে। স্ত্রীপুরুষের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ইহাদের পূর্ণ আধিপত্য আছে। ইণ্ডিয়ন সমাজে পুরুষ অরণ্যের স্বামী এবং স্ত্রী গৃহের কর্ত্রী। ইহাদের নিজেদেব* নির্মিত বা ব্যবহৃত হাতিয়ারপত্রে ইহাদের নিজেদেরই অধিকার। এইভাবে মাছ কি পশু মারিবার হাতিয়ারেব কর্তা হইল পুরুষ; এবং ঘরের তৈজসপত্রের মালিকা হইল স্ত্রী। ইহাদের কয়েকটি পরিবারে মিলিয়া একটি ঘর থাকে। কখনও কখনও ঘর এত বড় হয় যে তাহাতে ৭০০ লোক একত্র বাস করে। উত্তরপশ্চিম তটের ইণ্ডিয়ন বা রাণী শার্লটে দ্বীপের হুইদো ও মুৎকা

---

* স্ত্রীর অথবা পুরুষের।

গোষ্ঠীর মধ্যে এই লক্ষণ বেশি দেখা যায়।···সকলে মিলিয়া কোন বস্তু তৈয়ার করিলে কিংবা ব্যবহার করিলে···তাহা ইণ্ডিয়নদের সাংঘিক সম্পত্তি-রূপে গণ্য হয়। ঘর, বাগ, নৌকা প্রভৃতি সেখানে এইরূপ সাংঘিক সম্পত্তির অন্তর্গত।"

২। বিবাহ

জনসত্তা যুগে, বিশেষ করিয়া তাহার আরম্ভ সময়ে, সমাজে মাতৃ-কর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল। তখন সম্পত্তির অধিকাংশই সাংঘিক হইত; পারিবারিক সম্পত্তি যাহা কিছু থাকিত, তাহাতে শুধু কন্যারই অধিকার বর্তাইত। বাহিরের বিরোধী অবস্থার সংস্পর্শে না আসিলে সামাজিক রীতির পরিবর্তন হয় না। কেরলের* নায়রদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতেও সম্পত্তির উপর শুধু কন্যার অধিকার স্বীকৃত হইত। অব্রাহ্মণনেতা ডাঃ টি. এম. নায়রের বিশেষ চেষ্টায় এই প্রথা রহিত হইয়াছে; এখন নূতন আইনে নায়রদের সম্পত্তিতে পুত্রের দাবীও গ্রাহ্য হয়। কেরলে অব্রাহ্মণদের উপর আদিম বন্য সমাজের দায়ভাগ চাপাইয়া রাখার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ইহাতে কেরলী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট স্বার্থ ছিল। কেরলের নম্বুদরী ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই জমীদার, জায়গীরদার;—শতকরা একশত জনই তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত। ইঁহাদের ক্ষেতখামার বা কোনরূপ শারীরিক শ্রমের এলেকা রাখিতে হয় না। তাই স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকিবার সুযোগ ইঁহাদের বেশি। এই নম্বুদরী ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি কন্যাদের মধ্যে বণ্টিত হয় না। এমন কি তাঁহাদের পুত্রদের মধ্যেও একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী হয়। অন্য পুত্রেরা সাধারণত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রিত হইয়া

* মালাবার।

থাকে; অথবা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির একমাত্র কন্যা খুঁজিয়া তাহার পাণিপীড়ন করে। কেহ অবশ্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে নূতন উপার্জনের পথও খুঁজিয়া লয়। কিন্তু ইহার মধ্যে শেষোক্তদের সংখ্যা যে খুবই কম তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একক উত্তরাধিকার পরিত্যক্ত হইয়াছে; এই দৃষ্টান্তে নম্বুদরী ব্রাহ্মণের সন্তানেরাও নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের পক্ষে ইহার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা মোটেই কঠিন নয়; কারণ ধর্মের আখ্যান ব্যাখ্যান—এই উভয়েরই ভারই তাহাদের উপর ন্যস্ত আছে। নায়রদের মধ্যে পুত্রীর উত্তরাধিকার প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতে পারে; কিন্তু তাহাকে সহস্র বৎসর চিরায়ু রাখার মধ্যে ব্রাহ্মণদের হাত আছে; আর ব্রাহ্মণেরা যে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে এই প্রথা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এমনও নহে। নম্বুদরী ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হয়;—এইজন্য ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণের অধিকারও একমাত্র তাহারই। অন্যেরা সম্পত্তিহীন বলিয়া ব্রাহ্মণকুমারীর পাণি-পীড়নের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। ইহার ফলে নম্বুদরী ব্রাহ্মণদের বহু কন্যা চিরকুমারী থাকিতে বাধ্য হয়। সমাজ ইহাদের জন্য অন্য কোন গতি নির্দেশ করিতে পারে নাই; আর আর্থিক লাভ না থাকায় হয়ত বা বিশেষ চেষ্টাও করে নাই। কিন্তু সম্পত্তিহীন অনুজ পুত্রদের বেলায় সমাজ বেশ কৌশলী হইয়াছে; ব্রাহ্মণকুমার ইচ্ছা করিলেই নায়রকন্যার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। এই সম্পর্কের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক সর্তও খাড়া করা হইয়াছে; এখানে নায়রকন্যা নিজেকে ব্রাহ্মণকুমারের পরিণীতা পত্নী বলিয়া স্বীকার করিবে; কিন্তু স্বামীর দিক হইতে এইরূপ কোন অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তা নাই। এই বিবাহে স্বামী স্ত্রীকে সংসর্গকাল ছাড়া সকল সময়ই অস্পৃশ্য জ্ঞান করিবে—কখনও তাহার হাতের অন্নজল

পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না। এমন কি, বিবাহজাত সন্তানের ভরণপোষণের জন্যও বর্ণশ্রেষ্ঠ পিতার দায়িত্ব নাই; এই ভার গ্রহণের জন্য নায়রপুত্রীদিগকে পূর্ব হইতে সম্পত্তির অধিকারিণী করা হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তে বোঝা যায়, কেরলে কন্যার উত্তরাধিকার স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য চলিত রাখা হয় নাই; সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের জন্যই ইহার প্রচলন রহিয়াছে।

কেরলের রাজবংশেও এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সেখানে রাজার পত্নী শুধু পত্নীই, তাঁহার রাণী হইবার কোন ক্ষমতা নাই। রাজপুত্রেরাও এইভাবে শুধু পুত্রের অধিকারই পাইয়া থাকে, তাহারা কখনও যুবরাজ হইতে পারে না। এই সমস্ত রীতিতেও পূর্বের স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যাপারই লক্ষিত হয়। কেরলরাজ্যে রাজার উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়; আর রাণী হইবার অধিকার রাজার ভগিনী বা মা-মাসীর জন্য রক্ষিত থাকে। কেরলের রাজপুত্রীরা সাধারণত ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে পরিণীতা হয়: কারণ ইহা সমাজের ইপ্সিত সম্পত্তি-প্রথার বিশেষ অনুকূল।

জনসাত্তিক সমাজে প্রাচীন সাম্যবাদী বিবাহ প্রথার পরিবর্তন হয়। এই সময় যূথবিবাহের প্রচলন উঠিয়া যায় এবং নিজের জন অর্থাৎ গোত্রের মধ্যে বিবাহকার্য নিষিদ্ধ হয়। মাতাপুত্র, পিতাপুত্রী এবং ভ্রাতা ও ভগ্নীর সংসর্গ তখন হইতে অন্যায় বিবেচিত হইতে থাকে; এমন কি এক রক্ত সম্পর্কিত অনেক আত্মীয়ের মধ্যেও তাহা আর পূর্বের মত সমর্থিত হয় না। তবে ইহার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও অবশ্য যথেষ্টই আছে; বর্তমান যুগেও এই প্রথা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই—ইহাকে আমরা সমাজের অসম গতির নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। জন বা গোত্রযুগের বিবাহ প্রকৃতপক্ষে মিথুন-

বিবাহ ;* ইহা একপত্নী বিবাহেরই একটি শিথিল রূপভেদ। এই বিবাহে একজন স্ত্রী এক মাত্র পুরুষেরই পত্নী হইতে পারে; তবে কালিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে ইহাতে কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নাই। মহাভারতের শ্বেতকেতু উপাখ্যানে† আমরা এইরূপ বিবাহের নিদর্শন পাইতেছি: শ্বেতকেতুর মাতাকে এক ঋষি যৌনক্রিয়ার জন্য লইয়া যাইতে চান। শ্বেতকেতু তখন বাধা দিলে তাঁহার পিতা ঋষির ইচ্ছাকে ধর্ম‡ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া শ্বেতকেতু এই প্রথা রহিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, এবং পরে ঋষি হইয়া তিনি মিথুনবিবাহের স্থলে স্থায়ী বিবাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। অস্ত্র ও হাতিয়ার

জনযুগে আসিয়া মানুষ তাহার পুরাতন পাষাণ অস্ত্রকে আরও একটু শাণিত করিয়া লইল। আদিম অমসৃণ প্রস্তরাস্ত্রের স্থলে এইবার দৃঢ়, মসৃণ ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রপাতির আবির্ভাব ঘটিল। প্রাচীন নিক্ষেপাস্ত্র ছাড়া এই সময় কাঠের হাতল দেওয়া পাথরের কুঠারেরও প্রচলন হয়। ইহার উপযোগিতা ও সুলভতার জন্য তাম্র, পিত্তল, এমন কি লৌহযুগ পর্যন্ত তাহার ব্যবহার দেখা যায়। ইংলণ্ডে ১০৬৬ খ্রীষ্ট সনে হেষ্টিংসের যুদ্ধের সময়ও ইহা যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কোন কোন স্থানে ধনুর্বাণের আবিষ্কার অবশ্য বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল, তবে পৃথিবীর সকল স্থানে ইহার প্রচলন এক সময়ে হয় নাই। হিন্দীয়ুরোপীয়দের মধ্যেও ধনুর্বাণের ব্যবহার বহু পরে আরম্ভ হয়। ইরাণী, হিন্দু, স্লাভ প্রভৃতি ভাষায় ধনুর্বাণের জন্য কোন একমূল শব্দ নাই। রোমক, গ্রীক স্লাভ এবং পশ্চিম য়ুরোপের প্রাচীন ভাষায়ও ইহার

* Pairing Marriage; † আদিপর্ব, ১৮ অধ্যায়; ‡ সমাজ অনুমোদিত কর্ম।

কোন নিদর্শন মিলিতেছে না। হিন্দু ও ইরাণী ভাষায় গোধূম, ব্রীহি, যব প্রভৃতি বহু শস্যবাচক প্রাচীন শব্দ আছে। ইহাতে মনে হয়, এই দুই জাতি বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে তাহাদের সমাজে কৃষিকর্মের প্রসার হইয়াছিল। হিন্দীআর্যদের মধ্যে কৃষির পর ধনুর্বাণের চলন সমাজের ভিন্নমুখী বিকাশেরই পরিচয়। জনযুগে ধনুর্বাণ ও কুঠারাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে খননকর্তনের জন্য অন্যান্য ক্ষুদ্র অস্ত্রও ছিল। তখন পর্যন্ত তামা, পিতল, বা লোহার আবিষ্কার হয় নাই; এইজন্য কাঠ, পাথর এবং হাড়ের সাহায্যেই ইহাদের নির্মাণ চলিত। জনযুগে সীবন-বয়ন প্রভৃতি কাজেরও অনেকটা উন্নতি হয়; এবং নূতন হাতিয়ারের সহায়তায় মানুষ চর্মবাসের যুগ হইতে একপাদ আগাইয়া আসে।

৪। সম্পত্তি

শিকারলব্ধ মৎস্য অথবা মাংসকে কখনও স্থায়ী সম্পত্তির অন্তর্গত করা চলে না। এইজন্য পশুর শৃঙ্গ, চর্ম এবং শুষ্ক ফলমূলকেই জনযুগের সম্পত্তি বলিতে হয়। এই সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরিয়া রক্ষিত হইতে পারিত; এবং প্রয়োজন হইলে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ইহাদের বিনিময়ও হইত। ধনুর্বাণ আবিষ্কারের পর শিকার এবং স্বরক্ষা ব্যাপারে মানুষের শক্তি বাড়িয়া যায়; কিন্তু ইহাতে সমাজে বিরাট পরিবর্তন তেমন কিছু হয় নাই। পুরাতন হাড় বা পাথরের অস্ত্র দিয়াও এই কাজ একরকম চলিয়া যাইত।

কিন্তু শিকার জীবিকার উপায় হইলে কতকগুলি আনুষঙ্গিক অসুবিধা আছে: প্রথমত শিকারের সফলতা খুবই অনিশ্চিত; তার উপর জনসংখ্যা বাড়িয়া গেলে শিকারলব্ধ দ্রব্যে গোষ্ঠীর সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। ফলের সাহায্যে যে এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে, তাহাও

আবার সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, কারণ ফলের ফসল বৎসরের বারমাস এক রকম থাকে না। এইসব অসুবিধার জন্য জনযুগের মানুষকে নূতন জীবনোপায় চিন্তা করিতে হইয়াছে। ইহাতে প্রথমেই তাহাদের চোখে পড়িয়াছে—চরভূমি গুলিতে তৃণের অভাব হইলে সমস্ত শিকারও দেশছাড়া হইয়া যায়; তাই ইহার নিবারণের জন্য তৃণের উৎপাদন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার রক্ষণেরও প্রয়োজন। আজ শিকারী বনপশুর সদ্যোজাত বাচ্চা পাইলে প্রায়ই তাহাকে গৃহে লইয়া আসে; তখনও মানুষ এইভাবে গরু, ঘোড়া এবং ছাগ-ভেড়ার বাচ্চা আনিয়া গৃহে প্রতিপালন করিত। প্রথমত, হইতে পারে যে, ইহাতে কোন অর্থ-নৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, তখন শুধু মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যই পশুপালন করা হইত, কিন্তু ক্রমে ইহার আর্থিক সুবিধার দিকও মানুষের চোখে পড়িল, এবং তখন হইতে পশু মানুষের জীবিকার নূতন সাধন হইয়া উঠিল। এইভাবে পশু মানুষের ধন হইয়া জনের সাংঘিক সম্পত্তিতে পরিণত হইল, ঘর এবং চরভূমি প্রভৃতির মত ইহার উপরও আর ব্যৈক্তিক কোন অধিকার রহিল না আজ মানুষ সামুহিক সম্পত্তির কথা ঠিক ভাবিয়া উঠিতে পারে না; ঠিক এইরূপ, তখনও ব্যৈক্তিক সম্পত্তির কথা চিন্তা করিতে মানুষের কষ্ট হইত।

৫। শিল্প ও ব্যবসায়

জনযুগের ঘরবাড়ী, ঘাসক্ষেত, শিকারস্থল এবং পশু—সমস্তই সংঘের সম্পত্তি ছিল। আদিম যুগের মানুষ কাঁচা মাংস খাইত, —কিন্তু জনযুগে পৌঁছিবার পূর্বেই তাহারা পোড়া মাংসেরও স্বাদ পাইয়া গিয়াছিল। কাঁচা মাংসের সঙ্গে পোড়া বা ভুনা মাংসের স্বাদের যে প্রভেদ আছে, ইহা তাহারা দাবদগ্ধ পশুপক্ষীর মাংস

হইতে প্রথম বুঝিয়া থাকিবে। কিন্তু পোড়া মাংস হইতে সিদ্ধ মাংসের স্বাদ যে আরও বেশি—ইহা বুঝিতে মানুষকে বহুদিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছে। ধাতু বা মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটিবার পূর্বে রন্ধন-পাত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না—তাই রন্ধনের কলাকৌশল সম্পর্কেও কোন প্রকার উন্নতি পূর্ববর্তী যুগে সম্ভব হয় নাই। পশুর চামড়া ও মাংসের প্রয়োজনে শিকারের বিকশিত স্তর হিসাবে প্রথম পশু-পালন আরম্ভ হয়। কিন্তু দুধ, মাখন বা দুগ্ধজাত অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার আরম্ভ হইতে ইহার পরও অনেক দেরি লাগে।

জনসমাজে শিল্প বা কলা সংক্রান্ত বিষয়ে খুব বেশি পরিবর্তন হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু এই সময় শিকারের অতিরিক্ত পশুপালনের প্রচলন হয়; ইহাতে সমাজে পশুর ব্যবসায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়িয়া উঠে। তখন অন্যের জিনিসের সঙ্গে নিজ নিজ জিনিস বিনিময়ের জন্য বিনিময়বস্তুরও নির্মাণ আরম্ভ হয়। ইহাতে গৃহশিল্প, অনুপাতে না হইলেও অন্তত বিশেষত্বের দিক দিয়া, অনেক উন্নতি লাভ করে। পূর্ব অভ্যাসের জন্য এই সময় পোস্তিন * হয়ত আরও বেশি করিয়া নির্মাণ হয়,—আর ইহার সঙ্গে জুতা এবং অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তুর নির্মাণকৌশলও উন্নতি লাভ করে।

ক্রোমেগ্নন মানবের চিত্রকলা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। জনযুগের মানুষও তাহাদের মত রেখা এবং বর্ণ চিত্র অঙ্কনে পারদর্শী ছিল। বর্তমানে গঙ্গপুরে † কয়েকটি প্রস্তরোৎ-কীর্ণ চিত্রের অবিষ্কার হইয়াছে; এই চিত্রগুলির সমুদয়ই শিকারের

---

* পূর্বের শীতবাস স্মরণীয়; ইহা চামড়ার তৈয়ারী এক প্রকার কোট; অফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং রুশ দেশের কোন কোন অঞ্চলে এখনও উহার ব্যবহার আছে; † ছত্রিশগড়।

দৃশ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুরূপ চিত্রের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু দেবতা, প্রেত বা ধর্মসম্বন্ধী কোন ইঙ্গিত ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই চিত্রগুলি বস্তুত মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল;—আর চিত্রকলার ব্যবসায়ের যুগও ইহার বহু পরে আসিয়াছে। কাপড়, পোস্তিন, জুতা, প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্যও তখন পর্যন্ত ঠিক পণ্যরূপ * পায় নাই। এইসব জিনিস তখন বিশেষ-ভাবে পরিবারের জন্য তৈয়ারী হইত, তবে ইহার কিছু অংশ অবশ্য বিনিময়েও লাগিত। বিনিময়ের বেলায় নিপুণ হাতের জিনিসেরই চাহিদা বেশি হয়; এইজন্য জনযুগে শিল্পচাতুরী অনেকটা প্রোৎসাহন পাইয়াছিল।

৬। শাসন

জন বলিতে একবংশাগত মানুষের প্রাচীন সমাজকে বুঝাইয়া থাকে। ইহারা তখন অরণ্য বা পর্বতেব স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সীমার ভিতর গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করিত। বসতির স্থায়িত্ব না থাকিলেও প্রত্যেক জনের বিচরণভূমি তখন নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত থাকিত। তখন জনের আভ্যন্তরিক কলহ বিবাদ মিটাইতে তাহাদের পঞ্চায়েতই পর্যাপ্ত ছিল। অন্য জনের উপর প্রতিশোধ নিতে হইলে, কিংবা নিজেদের ভূমি রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে, জনের প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষই কাঠ, পাথর বা হাড়ের অস্ত্র, কিংবা তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিত। জনের শাসনতন্ত্র শুধু নিজেদের আন্তরিক ন্যায়রক্ষা কিংবা বহিঃশত্রুর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়াই নিস্তার পাইত না: সমগ্র জনের আর্থিক সংস্থানের ভারও ইহারই উপর ন্যস্ত থাকিত;

* বিক্রয়ের জন্য নির্মিত বস্তু।

এবং শীতের জন্য জনের পোস্তিন, ইন্ধন, ও ক্ষুন্নিবারণের জন্য আহার্য সংগ্রহের চিন্তাও জনের শাসনতন্ত্রকেই করিতে হইত। বন্যা, বর্ষা, রৌদ্র, হিমপাত কিংবা বালুকাঝড়—সকল রকমের প্রাকৃতিক বিপত্তি হইতে জনকে বাঁচাইবার চিন্তাও ইহাবই ছিল। ইহাতে জনের শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব ছিল অসাধারণ; কিন্তু তবুও সকল রকম আধুনিক পদ্ধতি ছাড়া—এমন কি বিনা জেল পুলিশে—জনসংঘ খুব সুচারু-ভাবেই নিজ দায়িত্ব পালন করিত। এঙ্গেল্স্ একজন মানব-তত্ত্ববেত্তাব উক্তির সাহায্যে জনযুগের নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

"সরলতা ও স্বাভাবিকতার দিক দিয়া এই জনসংস্থা কতই না আশ্চর্যজনক ছিল! ইহাতে সৈনিক ছিল না, সিপাহী ছিল না, পুলিশ ছিল না, কোন সর্দারও ছিল না; রাজা, উপরাজা, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ কিছুই ছিল না; জনসংঘে জেল ছিল না, দেওয়ানী মোকদ্দমার নামও তখন লোকে শুনে নাই। তবু সকল কাজই ইহাতে সুগমতার সহিত সম্পন্ন হইত। জন, জনত বা গোষ্ঠী নিজেদেব বিসংবাদ নিজেই মীমাংসা করিয়া লইত। প্রতিশোধ লইবার প্রয়োজন তখন বড় হইত না, এখনকার ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড ইহারই অবশেষ, কিন্তু আগের মত ইহা আর বিরল নয়। জনসংঘে বর্তমান শাসন বিভাগের জটিলতা কিংবা তাহার ব্যর্থ রীতিনীতির কোন আবশ্যকতা ছিল না। সাংঘিক ঘর তখন বহু পরিবারের ব্যক্তি একত্রে ব্যবহার করিত, তখন ভূমিও সমগ্র গোষ্ঠীর হইত, শুধু বাগের একটু ভাগ প্রতি পরিবারের জন্য পৃথক থাকিত।

"জন, গোষ্ঠী এবং ইহার সম্পর্কিত অন্যান্য সংস্থা তখন ব্যক্তির নিকট পবিত্র ছিল। সংঘের অনুশাসন তখন তাহার নিকট অনুল্লঙ্ঘনীয় ছিল। প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত জন মানুষের চোখে লোকোত্তর সংস্থা

বলিয়া প্রতীত হইত ; এবং ব্যক্তির চিন্তা, বেদন, ক্রিয়া সকলই বিনা সর্তে জনের অধীন থাকিত।"

৭। ধর্ম

প্রাকৃতিক শক্তি, অর্থাৎ সূর্য, আগুন, বিদ্যুৎ, বর্ষা প্রভৃতি সমস্ত অ-স্থির পদার্থই আদিম মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করিত। নেঅণ্ডর্থল মানব সম্পর্কে জানা যায় যে মৃতদেহ সংকারে ইহাদের বিশেষ রকম আড়ম্বরের ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে মৃত্যুও যে আদিম মানুষের মনে একটি বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করিত, তাহা অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত হইবে না। তখনকার দিনে রাত্রি, বিশেষ করিয়া অন্ধকার রাত্রি, মানুষের সম্মুখে শুধু কাল্পনিক নহে—বাস্তবিক শত্রুরই আগম ঘটাইয়া দিত। কিন্তু এইসব ভয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে হর্ষের কারণগুলিকেও, মানুষ যে তখন ধার্মিকভাবে গ্রহণ করিত—এমন কোন প্রমাণ নাই। ধার্মিক ভাবের মূল উদ্দেশ্য হইল আত্মসমর্পণ করা, অর্থাৎ এইসব অজ্ঞাত এবং অবাস্তবিক শত্রুর সন্তুষ্টির জন্য নিজের হীনতা প্রকাশ করা। কিন্তু তখন অজ্ঞাত শত্রু সম্পর্কে ভয় থাকিলেও মানুষ তাহার সম্মুখে অস্ত্রত্যাগ করিতে শিখে নাই ; ছলে বা বলে যেভাবেই হউক, সে তখন শত্রুকে তাহার স্ববশে আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। বর্তমান যুগের সভ্য সমাজে ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়—এই রকম কোন বস্তুরই তখন অস্তিত্ব ছিল না ;* কিন্তু ধর্মের জন্য আবশ্যক ভূমি—অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং ভয় সেই সমাজেও বর্তমান ছিল। পরবর্তী যুগে ধর্মের নামে জীবিকা অর্জনকারী কুটিল ও স্বার্থী পুরোহিত বর্গের উদ্ভব হয়, এবং হয়ত তখন হইতে ধর্মের প্রকৃত বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটে।

* মাতাদেবীর পূজা পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির মধ্যেই দেখা যায়· হইতে পারে, ইহা জনযুগে পুরাতন মাতৃতন্ত্রের প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল।

জনসমাজের আচারনিয়ম ও সদাচার খুবই সরল ছিল। ব্যৈক্তিক সম্পত্তি না থাকায় সমাজে তখনও চৌর্যের প্রচলন হয় নাই। সমাজের ব্যক্তিরা তখন প্রতি অস্থিমজ্জায় সাংঘিক ছিল; কোন প্রকার সংঘ-বিরোধী কাজ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে মিথ্যাভাষণ এখনও বড় একটা দেখা যায় না;—কারণ, মিথ্যাভাষণের সঙ্গে সভ্যতা, অর্থাৎ বর্তমান ব্যৈক্তিক সম্পত্তির সভ্যতারই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সমাজের আচার বা রীতি নিয়ম চলিত অবস্থাকে স্থায়ী রাখিবার জন্যই সৃষ্ট হয়; কিন্তু কোন বিশেষ বর্গের স্বার্থ বক্ষায় নিয়োজিত হইলে ইহারও স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যায়; তখন নিয়মই আবার নিগড় হইয়া পড়ে, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলেও সহজে ইহার পরিবর্তন হইতে চায় না। জনযুগের আচার শাস্ত্র প্রকৃতই সরল ছিল, এবং জনজীবনও তেমনই সাংঘিক জীবন ছিল; সংঘের হানিকর সকল কাজই তখন দুষ্কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইত; আর বহু দুষ্কর্ম, অর্থাৎ চৌর্য প্রভৃতি, তখনও সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় নাই,—কারণ ব্যৈক্তিক সম্পত্তি না থাকায় চৌর্যই তখন ছিল না। চৌর্য আরও পরে, অর্থাৎ সাংঘিক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া ব্যৈক্তিক সম্পত্তি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হইয়াছে।

৮। সংক্রান্তিকাল

প্রকৃতির রাজ্যে বস্তুর সীমা নিশ্চিত করা সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার; কারণ প্রকৃতি কোন নির্দিষ্ট সীমাঙ্কের ভিতর পরিক্রমণ করে না—সীমারেখা লেপিয়া মুছিয়া একাকার করিয়া দিয়া প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। জনসমাজের সাম্যবাদও যে কবে পরিবর্তিত হইয়া পিতৃসত্তা বা পুরুষপ্রধান যুগে উত্তীর্ণ হয় তাহাও বলা কঠিন। তবে কালিক

বিচারে জনযুগ ও সভ্যযুগের সংক্রান্তিকালে ইহার উদ্ভব বলিয়া নির্দেশ দেওয়া যায়। পিতৃসত্তার যুগে জনতন্ত্রের সাম্যবাদী রূপ ও তাহার সংঘশাসনে আঘাত লাগে; কিন্তু ইহাতেই সমাজের জনরূপ একেবারে হঠাৎ নষ্ট হইয়া যায় নাই। ক্রমে বৈ্যক্তিক সম্পত্তির সৃষ্টি ও প্রসারের সঙ্গে প্রাচীন গোষ্ঠীবাদের বিলোপ ঘটে; এবং ইহাতে সমাজের জনতান্ত্রিক গঠন ভাঙ্গিয়া যায়। তাই বলিয়া পিতৃসত্তার সমাজে জনতান্ত্রিক রীতিনীতি যে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা নহে। পৃথকভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি বলিয়া পিতৃসত্তাকে জনসত্তাব সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন মনে করিলে ভুল হইবে। পিতৃসত্তার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জনযুগের পরিপূর্ণ অবসান হয় নাই; তবে ইহার প্রভাবে সমাজদেহে কতকগুলি নূতন রূপান্তর হয়, এবং ক্রমে জনযুগেরও অন্তকাল ঘনাইয়া আসে। এঙ্গেল্‌স্ ইহার বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"আসুন, সমাজবিপ্লবের ফলে জন কি অবস্থায় পৌঁছিল তাহা আমরা আলোচনা করি। যে নূতন সমাজ এখন জনের স্থান অধিকার করিল, তাহা জনের সহায়তা ছাড়াই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার উপর জনের কোন প্রতিপত্তি ছিল না। জনের বাঁচিবার জন্য এক বা বহু জনের মিলিত সমগোষ্ঠিক সমাজের প্রয়োজন ছিল; তার উপর অন্যের অধিকারবর্জিত ভূমি এবং সেই ভূমির উপর জনের একাধিপত্যেরও দরকার ছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সর্বত্রই এক জনের নির্দিষ্ট ভূমির মধ্যে অপর জন বা জনসংঘের ব্যক্তিরা আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এখন পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহে এক জন অপর জনকে সম্পূর্ণ নাশ করিয়া দিয়াছে,—কোন কোন ক্ষেত্রে নরভক্ষণ চলিত থাকায় শত্রুকে শুধু সংহার নয়, একেবারে আহারও করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু মানুষকে বন্দী করার প্রথা তখনও সৃষ্ট হয় নাই। পরবর্তীকালে

পিতৃসত্তার যুগে দাসতার সূত্রপাত হয়; তখন হইতে শত্রুকে শেষ না করিয়া দাস করা বেশি লাভজনক বিবেচিত হইতে থাকে। ইহাতে জনের একবংশিকতা আরও নষ্ট হইয়া যায়।”

(খ) পিতৃসত্তা

জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব অবশ্য প্রথম হইতেই সমাজের পুরুষের উপর ন্যস্ত ছিল; জীবিকার সমস্ত সাধন এবং তাহার উপযোগী হাতিয়ারপত্র নির্মাণের ভারও ছিল পুরুষেরই। এইভাবে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং হাতিয়ারের স্বাভাবিক কর্তাই ছিল পুরুষ। পরে পশু-পালন জীবিকার এক নূতন সাধন হইয়া উঠে; তখন পশুর পালন এবং চারণের দায়িত্ব আবার পুরুষই গ্রহণ করে। ইহাতে গৃহপশুও পুরুষের সম্পত্তি হইয়া যায়; পশুর বিনিময়ে প্রাপ্ত জিনিস বা দাসদাসী—ইহাদের উপরও পুরুষেরই স্বামিত্ব স্বীকৃত হয়; পুরুষের অধিকৃত হাতিয়ারের সাহায্যে তৈয়ারী বস্তুপাতিও পুরুষের হইয়া পড়ে; ব্যয়ের পর যে সব জিনিস সঞ্চিত থাকিত তাহাও পুরুষের দখলে আসে। এই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার অবশ্য স্ত্রীজাতিরও ছিল; কিন্তু কথা এই, স্ত্রী কখনও ইহার স্বামিনী হইতে পারিত না।

বন্য যুগের পুরুষ খুব সাংঘাতিক ক্রূর ও দুঃসাহসিক ছিল; এমন কি শুধু শিকারে সংঘর্ষেই তাহাদের দিন কাটিয়া যাইত;—তথাপি স্ত্রীজাতির অধীন থাকায় তাহারা অসন্তুষ্ট ছিল না; পশুচারণার যুগের পুরুষ স্বভাবের দিক দিয়া অনেকটা নম্র; কিন্তু তাহা হইলেও নিজেদের সম্পত্তি—অর্থাৎ স্থায়ী পশুধন সম্পর্কে ইহারা সচেতন ছিল। এই প্রেরণায় পশুর স্বামী পুরুষ স্ত্রীজাতির সিংহাসন কাড়িয়া লয়; এবং নিজে সমাজের স্বামী হইয়া স্ত্রীকে অপপাংক্তেয় করিয়া দেয়।

স্ত্রীজাতির পক্ষ হইতে সর্বত্র ইহার প্রতিবাদের উপায় ছিল না।* ক্রমে নূতন শ্রমবিভাগ আসিয়া স্ত্রী-পুরুষের কর্তব্য নির্ধারিত করিয়া দিল। কর্তব্যবিভাগের সঙ্গে আবার সম্পত্তিতেও নূতন রকমের বিভাগ দেখা দিল। কিন্তু এইবার সম্পত্তিতে স্ত্রীজাতিব মালিকত্বের কোন প্রশ্ন উঠিল না; একমাত্র উপভোগের অধিকারিণী হইয়া স্ত্রী সমাজে বাস করিতে লাগিল। তারপর আবহমান কাল ধরিয়া † এই প্রথাই সমাজে চলিয়া আসিয়াছে।

গৃহকর্মের ভার আদিম যুগ হইতেই স্ত্রীর উপর ন্যস্ত ছিল; কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে ইহার দায়িত্ব বা সম্মান কিছুই আর পূর্বের মত অক্ষুণ্ণ থাকিল না। পূর্বে স্ত্রীজাতি সমাজে প্রধান ছিল,—তাই গৃহকর্ম পরিবারেব উপর তাহার এককর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কবিত; আব এখন আবার সেই গৃহকর্মই তাহার কর্তৃত্বচ্যুতিব কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহা কি ভাবে সম্ভব হইল? পশুপালন শুরু হইবার পর পুরুষের কাজের সম্মুখে স্ত্রীব কাজ নগণ্য হইয়া যায়। কারণ পশুপালন তখন উপযোগিতাব দিক দিয়া সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে মুখ্য; আর স্ত্রীর কাজ হইল অমুখ্য, গৌণ—অর্থাৎ পুরুষেব কাজের পরিশিষ্ট মাত্র। পশুচাবণাব যুগ আজ বহু দিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু এই পুরাতন

---

* কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহার প্রতিবাদই শুধু নয়, স্ত্রীজাতি তাহার অধিকারের সুরক্ষার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ পর্যন্ত করিয়াছে। *Evolution of Property* গ্রন্থে Paul Lafargue লিখিতেছেন: This dispossession gave rise to heroic combats; the women took up arms in defence of their privileges and fought with such desperate energy that the whole of Greek Mythology and even recorded history have preserved the memory of their struggles.

† বর্তমানে অবশ্য ইহার পরিবর্তনেরও লক্ষণ দেখা যাইতেছে; কারণ, পরিবারের বাহিরে স্ত্রীপুরুষের পুরাতন শ্রমবিভাগ আর নাই।

শ্রমবিভাগ এখনও দূর হয় নাই। তাই পুরুষপুঙ্গব কথায় কথায় স্ত্রীকে বিদ্রূপ করিতে পারে, 'তুমিত ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া দিব্যি আরাম করিতেছ! কিন্তু রোজগার কবিতে মাথার ঘাম যে পায় পড়ে তাহা বুঝিতে পার কি?' পুরুষেব এই উক্তি অবশ্য সাধারণভাবে সত্য নয়; কারণ একমাত্র ধনাঢ্য পবিবারের স্ত্রী ছাড়া অপর সকলেই সমাজের জন্য পরিশ্রম করে। তবে স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য বা সমাজে স্ত্রীকে পুরুষেব সমান স্থান পাইতে হইলে শ্রমেবও প্রকারভেদ দরকার। জীবিকা অর্জনে পুরুষেব সমান অংশ লইতে না পারিলে স্ত্রী পুরুষের সমান হইতে পারে না। স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীরও মুখ্য কাজ হইবে জীবিকা অর্জন; আর গৃহকাজ তখন শুধু ইহার পরিশিষ্ট হিসাবেই সঙ্গে থাকিবে।

পুরুষ জীবিকা অর্জনে প্রধান স্থান অধিকার করিবার পব পরিবারে তাহার একাধিপত্যের সমস্ত বাধা দূর হইয়া যায়। মাতৃসত্তা বা স্ত্রীপ্রধানতা এইভাবে সমাজ হইতে বিলুপ্ত হয় এবং তাহার স্থলে পিতৃসত্তা বা পুরুষপ্রাধান্যের নিষ্কণ্টক রাজ্য কায়েম হইয়া পড়ে। একদিন পশুধন তাহার স্বামী পুরুষকে সমাজের প্রধান করিয়া দিয়াছিল; এবং এই পশুধনই পরে সমাজে ব্যক্তির প্রভুত্ব এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যৈক্তিক সম্পত্তিরও পথ খুলিয়া দেয়। এইভাবে পিতৃসত্তার স্থাপনা হইবার পর আদিম সাম্যবাদের প্রভাবগুলি একে একে সমাজ হইতে মুছিয়া যাইতে থাকে।

১। বিভিন্ন দেশে পিতৃসত্তা

(১) **ভারতবর্ষে**—পৃথিবীর প্রাচীন জাতি সমূহের ইতিহাসে পিতৃসত্তাকে প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত করিয়া লইতে হয়; কারণ তখন হইতে ইতিহাসের ক্ষীণ উপকরণ আমাদের হাতে আসিতে আরম্ভ

করে। বৈদিক আর্যেরা ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্বে * তাহাদের পিতৃসত্তা যুগ অতীত হইয়া গিয়াছিল। গঙ্গা উপত্যকায় আসিয়া প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সমসাময়িক কালে তাহারা বেদ রচনা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণীয়, প্রাচীন পিতৃসত্তা কালের স্মৃতি তখনও তাহাদের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। বেদমন্ত্রে শুধু মৃত নহে, জীবিত পিতর বা পিতৃপুরুষেরও স্তুতি এবং সৎকারের বহু দৃষ্টান্ত আছে। খুব সম্ভব অফগানিস্তানে থাকিবার সময় আর্যসমাজ সম্পূর্ণভাবে পিতৃ-সাত্তিক ছিল; পরে পঞ্জাবে পরাজিত আর্যভিন্ন জাতির সম্পর্কে আসিয়া ইহাবা দাসতা যুগে প্রবেশ করে। আর্যদের আভ্যন্তরিক বা পারিবারিক ব্যবস্থা তগনও অবশ্য পিতৃতান্ত্রিকই ছিল; কিন্তু জনপদে অর্থাৎ বহু পরিবারের সম্পর্কে—তাহা তখন প্রজাতান্ত্রিক † হইয়া গিয়াছিল। বস্তুত পঞ্জাবে সিকন্দরের আগমনকাল ‡ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। পরে এই পিতৃতন্ত্রই বাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র এই তুই ধারায় বহিয়া চলিয়াছিল; কিন্তু পঞ্জাবে আর্যদের সংখ্যাধিক্য থাকায় সেখানে গণতন্ত্রই জয়ী হইয়াছে। ভারতীয় আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে পঞ্জাবের নদ-নদীর উল্লেখ আছে,—প্রসঙ্গত অনেক জাতির উল্লেখও সেখানে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, সেখানে কোন বিশুদ্ধ পঞ্জাবী রাজার বর্ণনা নাই। অনুগঙ্গ দেশের তুই একজন শরণার্থী রাজা তখন পঞ্জাব গিয়াছিল,—তাহারা আর্যদের নিকট হইতে সময় সময় অন্যায় সুবিধাও ভোগ করিয়াছিল,—কিন্তু সপ্তসিন্ধুর দেশকে রাজ-তান্ত্রিক করা তাহাদের সামর্থ্যে কুলায় নাই। সিকন্দরের আক্রমণের

* অন্তত বেদ রচনার পূর্বে যে তাহাতে সন্দেহ নাই; † গণতান্ত্রিক; ‡ ৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

সময় অম্ভী, পোরস্ * প্রভৃতি দুই একজন রাজার নাম শোনা যায়। তাহারা প্রকৃতই রাজা ছিল, না গণনায়ক ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। শাক্যদের নায়ক শুদ্ধোধনকেও এইভাবে রাজা বলা হইত। তদ্দিন্ন, দণ্ডপাণি প্রভৃতি আরও কয়েকজন শাক্যনায়কও রাজা নামে পরিচিত। কিন্তু শাক্যদের মধ্যে যে রাজতন্ত্র ছিল না, উহা যে প্রকৃতই গণতন্ত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈশালীদের সমাজও ঠিক এইরূপ গণতান্ত্রিক ছিল; গণের শাসনসদস্যদিগকে তাহারাও শাক্য-দের মত রাজা বলিত। অম্ভী এবং পুরুকে রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেও পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থলে যে গণতন্ত্র ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না; এবং ইহাতে পঞ্জাব অঞ্চলে গণতন্ত্রই যে রাজতন্ত্রের তুলনায় অধিকতর মান্য ছিল—ইহাও প্রমাণিত হয়।

গঙ্গা উপত্যকায় আসিয়া হতিহাসের আদি পর্বেই কুরু, পঞ্চাল এবং কাশী ও কোশলের পূবস্থাপিত রাজ্য দেখিতেছি। বেদের কবি বা ঋষি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি এইসব রাজ্যের রাজাদের কৃপাপাত্র ছিলেন। ঋগ্বেদে সেইজন্য রাজন্যবর্গের দানকর্ম সম্পর্কে অশেষ প্রশংসা ও স্তুতি † আছে। আর্যেরা গঙ্গা উপত্যকায় যাইবার সময় তাহাদের সঙ্গে যে রাজতন্ত্র লইয়া গিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। এই আরম্ভিক কাল সম্বন্ধে বেদও সম্পূর্ণ নীরব; বেদের বর্ণনায় আরও পরবর্তী কালের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। তখন পঞ্চাল ও কুরু প্রদেশের দুইটি শক্তিশালী রাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের মত জবর্দস্ত ঋষি-পুরুষ ইহার পোষক হইয়াছেন; এবং রাজানুগ্রহে তাঁহারা রাজকবি ও পুরোহিতের পদ লাভ করিয়াছেন। তাই এই যুগকে আর

---

* পুরু; † ঋগ্বেদে দাতা রাজার স্তুতি সম্পর্কিত ঋচ্‌গুলি দ্রষ্টব্য।

আর্যাধিপত্যের আরম্ভিক বা অবিকশিত রূপ বলিয়া ভাবা চলে না। এখানে পূর্বের মত জনপদের নাম হইতেই আমাদিগকে পুরা যুগের আভাস লইতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, আর্যজন যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে—সেই অঞ্চলের নাম তাহাদের জন বা গোষ্ঠীর নাম হইতে প্রাপ্ত; এবং জনের নাম তখন বহুবচনান্ত হইত বলিয়া জনপদের নামও বহুবচনান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেইরূপ, 'পঞ্চাল দেশে গিয়াছে' বুঝাইবার জন্য 'পঞ্চালগুলিতে গিয়াছে' বা 'পঞ্চালেষু গতা' এইরূপ পদ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে মনে হয়, আর্যেরা সেখানে যাইবার সময় তাহাদের মধ্যে ব্যক্তি বা রাজার প্রাধান্য ছিল না,—তাহাদের প্রাচীন জন অর্থাৎ গোষ্ঠী তখন অবধি এক রকম অভগ্নই ছিল। কিন্তু মাতৃসত্তা বা সাংঘিক সম্পত্তির কোন নিদর্শন সেখানে পাওয়া যায় না; ইহাতে বৈ্যক্তিক সম্পত্তি অনাদি কাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে—এমন বিভ্রম হয়। এইসব দৃষ্টান্তে আর্যসমাজ যে তখন পিতৃসাত্তিক ছিল ইহাই প্রমাণ হইতেছে। পিতৃসত্তাব যুগে কুরুপঞ্চালের আর্যেরা বহু আর্যভিন্ন জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে আসিয়াছে; এবং এই সংঘর্ষের সেনাসঞ্চালকেরাই পরে রাজা হইয়া সমাজে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছে। রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আবার ধার্মিক কৃত্যকলাপ চালনার জন্য পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ বর্গেবও সৃষ্টি হইয়াছে। তবে কথা এই, বর্গভেদ তখনও তত তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হয় নাই; ঐতিহাসিক কালে * আসিয়াও পঞ্চালের রাজা বিশ্বামিত্র এবং কুরুর রাজ্যাধিকারী দেবাপিকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে দেখা যায়। পিতৃসত্তার প্রথম পাদে পিতর ‡ একাধারে সমাজের শাসন এবং ধর্মকৃত্য উভয়ই সম্পাদন করিত;—ইব্রাণী† এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতির ইতিহাস

---

* ঋগ্বেদের আরম্ভিক সময়; ‡ Patriarch; † য়িহুদী।

হইতে এই সত্যই সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। কিন্তু গঙ্গা উপত্যকায় এই দুই কৃত্যের জন্য রাজা এবং ব্রাহ্মণ দুইটি পৃথক বর্গের সৃষ্টি হয়। প্রথমত রাজা, পুরোহিত—উভয়কেই সমাজ নিজে নির্বাচিত করিয়া লইত; পরে সমাজ হইতে ইহাদের বরণের আর কোন প্রশ্ন উঠে না,—কারণ বহুবিধ অধিকারের মত এই অধিকারও শেষে জন্মগত হইয়া দাঁড়ায়।

সমগ্র ব্রাহ্মণ ও বৈদিক সাহিত্য জুড়িয়া রাজতন্ত্রের * অজস্র প্রশংসা আছে; ইহার আনুষঙ্গিক ভাবে গণতন্ত্রের প্রতি উপেক্ষার নিদর্শনও খুব কম নহে। পূর্বেই বলিয়াছি. পিতৃসত্তা ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই দুই ধারায় বহিয়া চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণেরা রাজতন্ত্রকে তাহাদের বর্গের পরিপোষক বলিয়াও চিনিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তবু সমাজে রাজতন্ত্রের সফলতার কারণ কি? জনপদ সমূহে মিশ্র জনতার সমাবেশই ইহার মূল কারণ। আর্যদের নূতন বসতিতে আর্যভিন্ন জাতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। ইহার মধ্যে অনেককে সংস্কৃত করিয়া আর্যসংঘের প্রবেশপত্রও দেওয়া হইতেছিল; কিন্তু অনার্যদের সাংঘিক গঠন ইহাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। তখন পিতৃ-সত্তাক এবং গণসত্তাক উভয় সমাজই জাতীয় রক্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল—ইহাতে আর্য ও অনার্য জনের আন্তর মিশ্রণ সম্ভব হয় নাই। আর্যদের গণে ‡ তখন জনসত্তা বর্তমান ছিল; কিন্তু হইলে কি হইবে, ইহা শুধু শ্বেত জাতির জনতন্ত্র—ইহাতে জনপদের আদি জন † ব্যতীত কাহারও প্রবেশ অধিকার ছিল না। এই অবস্থায় আর্য ও অনার্য জনের মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব লাগিয়া থাকিত; শাসক ও শাসিতের শ্রেণীবিভেদ ছাড়া এই দ্বন্দ্ব নিরসনের কোন উপায় ছিল না। রাজতন্ত্রের পক্ষে এইবার একটি সুযোগ মিলিল;—রাজতন্ত্র বিরোধী জনগুলির দ্বন্দ্ব নিরসনের

* অর্থাৎ ব্রাহ্মণতন্ত্রের; প্রকৃতপক্ষে এই দুইই এক; ‡ জন বা গোষ্ঠী সমবায়; † যাহাদের নামে জনপদের নাম হইয়াছে।

আশ্বাস দিল, এবং নিজেকে প্রতি জনের উপরই সমদৃষ্টিবান্ বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহাতে অনার্য জন সমাজে বিশেষ কোন প্রাধান্য পাইল না; কিন্তু তবু রাজতন্ত্রকে তাহারা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিল; ইহাতে তাহাদের জনসত্তাও নষ্ট হইয়া গেল; তবু তাহাদের একমাত্র তৃপ্তি এই যে—বিরোধী আর্যজনও ত ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে!

(২) **ফিলস্তিনে** §—বাইবেলের পাঠকের নিকট ইব্রাণী জাতির * পিতৃসত্তার খবর মোটেই নূতন নয়। ইব্রাণীরা মূসা, দাউদ, ইব্রাহিম প্রভৃতি পিতরের ‡ নিকট হইতে পিতৃতন্ত্রের অধিকারী হইয়াছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য স্থানান্তরে গমন এবং অন্যান্য জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের পিতৃসত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। বাইবেলে বর্ণিত মহান পিতরেরা একাধারে সমাজের শাসক এবং পুরোহিত দুইই ছিলেন;—ইহাতে দেখা যাইতেছে ইব্রাণী সমাজে ধর্মকৃত্য ও শাসনকৃত্যের মধ্যে তখনও কোন বিভাগ সৃষ্টি হয় নাই। পরে অসুর, মিশরীয়, পারসিক এবং য়ূনানী† বা রোমক রাজশক্তির নিকট য়িহুদীদের পিতৃতন্ত্র পরাজিত হয়; তখন হইতে পিতরেরা ইব্রাণী সমাজে শুধু প্রধান পুরোহিতেরই কাজ করিয়া আসিয়াছে। য়িহুদীরা প্রাচীন পিতৃতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্য বহুবারই চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু ইহাতে তাহারা কোন স্থায়ী সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

(৩) **ইরাণে**—ইরাণীদের প্রথম রাজা দয়উক্কু¶ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প আছে:—'...ন্যায়ের জন্য তাঁহার কীর্তি নিজের গ্রাম ছাড়াইয়া অন্য গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছিল; এইজন্য বহুলোক নিজেদের বিবাদ মিটাইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। ক্রমে দয়উক্কুর এত সময় ব্যয়

---

§ Palestine; * য়িহুদী; ‡ Patriarch; † গ্রীসীয়; ¶ দেবক (মৃত্যু ৬৫৫ খ্রীঃ পূঃ)।

হইতে লাগিল যে—তিনি এই কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তখন গ্রামে ন্যায়ের ব্যবস্থা না থাকায় চারিদিকে অশান্তি আরম্ভ হইল। লোকজন এইবার ভাবিতে লাগিল—এই অবস্থা চলিলে দেশ ছাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই…তাহা হইতে চল, আমরা একজন রাজা তৈয়ার করি; রাজা রাজ্য সম্পর্কে সমস্ত বিধান দিবে, আর আমরাও সুখে আমাদের কাজকর্ম লইয়া থাকিব।…ইহার পর দয়উক্কুকে তাহারা রাজা নির্বাচন করিল, এবং হগমতন বা হমাদানে তাঁহার রাজধানী বানাইয়া দিল।'*

ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, মদ্রজাতি দয়উক্কুকে রাজা করিয়া পিতৃ-সত্তার স্থলে রাজসত্তা স্থাপন করে। কিন্তু এই উপাখ্যানে যুদ্ধবিগ্রহের কথা বাদ দিয়া শুধু শাসন সম্পর্কেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, মদ্রদেশ পূর্বে অসুরদের প্রভাবের মধ্যে ছিল। মদ্রজাতি স্বতন্ত্রতাপ্রিয় বলিয়া অসুর সাম্রাজ্যের অধীনতা তাহারা মানিয়া নিতে পারে নাই। মদ্রদিগকে দমন করিবার জন্য অসুর রাজাদিগকে বহুবার অভিযান চালাইতে হইয়াছিল। ইহার সর্ব-শেষ অভিযানটি অসুর হদ্দনের চালনায় খ্রীষ্টীয় ৬৭৪ অব্দে সংঘটিত হয়। ইরাণী ইতিহাসের তখনকার যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারটি হয়ত মূলত এইরূপ হইবে:—ইরাণীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাহাদের পিতরদের চালনায় অসুর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রথম পরাস্ত হয়। পরে সমস্ত গোষ্ঠীকে একত্র করিয়া একটি সমন্বিত অভিযানে ইহারা অসুরদিগকে বিতাড়িত করে। এইরূপ সামাজিক যুদ্ধোদ্যোগের জন্য তাহাদের একজন সেনাচালকেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। খুব সম্ভব দেবক তখন জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইরাণীদিগকে সংগঠিত করে—এবং ক্রমে দেশকে

---

* মৎপ্রণীত 'ইরাণ' দ্রষ্টব্য।

শত্রুমুক্ত করিয়া সাধারণের সম্মতিতেই দেশের রাজা হয়। এই রাজতন্ত্র ছাড়া মদ্রেরা অসুর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে কখনও আঁটিয়া উঠিতে পারিত না; কারণ পিতৃসত্তার শক্তি বিক্ষিপ্ত এবং রাজসত্তার শক্তি সংহত। আর এইজন্যই সমাজে পিতৃসত্তার পরে রাজসত্তার উদ্ভব হয়; সঠিক ভাবে বলিতে গেলে—পিতৃসত্তার পরে সামন্তসত্তা, এবং ইহার শক্তিশালী ও বিকশিত রূপ হইল রাজসত্তা।

শ্রমপদ্ধতির উন্নতি, উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং আর্থিক শক্তির বিকাশ ও কেন্দ্রীকরণ এই সমস্তই সমাজের মূল ভিত্তি। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের সময় এই মূল আধারের উপর আবার রাজনীতিক ও সামাজিক শক্তিকেও কেন্দ্রিত করিয়া লইতে হয়। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিজমের বহু পূর্বেই মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। আদিম সাম্যবাদী সমাজ হইতে জনসমাজকে আমরা এই বিষয়ে অগ্রবর্তী দেখি; তাই আদিম কম্যুন * ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার স্থলে সমাজের আরও সংহত রূপ জনসত্তার উদ্ভব হয়। ইহার পর পিতৃসত্তার সময়ে বিস্তৃতির দিক দিয়া না হইলেও—সংহতির দিক দিয়া এই গঠন আরও দৃঢ়তা অর্জ্জন করে। জনতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও স্বেচ্ছাচারিতা এইভাবে প্রায় নষ্ট হইয়া যায়; এবং তাহার স্থলে সমাজে তখন একরূপ সামরিক অনুশাসন প্রচলিত হয়। ইহাতে জনের স্বয়ংপূর্ণ গঠন অবশ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু শক্তির দিক দিয়া তাহাতে জনের লাভই হয়। এই সংহতির জন্য শ্রেণীভেদ বা ব্যৈক্তিক স্বার্থকে স্বীকার করিয়াও পিতৃসত্তা সমাজে কার্যকরী হইয়াছে। ইহার পর সামন্ত যুগে সমাজের বিক্ষিপ্ত শক্তি আরও কেন্দ্রিত হয়—এবং এই রাজকীয় শক্তির মহিমা দেখিয়া সমাজে চক্রবর্তী রাজার কল্পনা† আসে। সামন্ত

* Commune; † ভারতীয় সমাজে।

তখন শুধু আর রাজা হইয়া কৃতার্থ হইতেন না,—তাঁহারা সমগ্র পৃথিবী বা কোন মহাদ্বীপের রাজা অর্থাৎ চক্রবর্তী হইবার বাসনা পোষণ করিতেন।

সমাজশক্তিকে কেন্দ্রিত করিয়া লইবার উপকারিতা আমরা বুঝিলাম; কিন্তু এই কেন্দ্রীকরণ কি ভাবে সম্ভব হইয়াছে তাহা উপরের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট হয় না। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা এই সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করিব—তবে এইখানে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজবিকাশের মূলগত প্রেরণা হইল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিকাশ। পশুপালন শুরু হইবার সঙ্গে সমাজের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এবং পশুধনের গৌরবে পুরুষ তখন সমাজে প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর ধীরে ধীরে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটে; এবং ক্রমে তামা, পিতল ও লোহার বহু নূতন আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়। ইহার প্রভাবে সমাজে ব্যৈক্তিক সম্পত্তিরও সৃষ্টি হইয়া যায়; এবং ক্রমে ব্যক্তির প্রভাবে সমাজের বিক্ষিপ্ত শক্তিও কেন্দ্রিত হইয়া পড়ে।

(৪) **মিশরে**—মানব সমাজের বিকাশে মিশরের দান অসীম। এখন পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক উপাদান হাতে আসিয়াছে—তাহাতে মিশরকে মানব সভ্যতার আদি ভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে। মেসোপোতামিয়ার সভ্যতা * মিশরীয় সভ্যতার নিকট ঋণী; এবং সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা † মেসোপোতামীয় সভ্যতার সমকালীন—এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর প্রভাবও আবার খুবই স্পষ্ট। সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শন হইতে তাহার রহস্য উন্মোচন করা যায় না; কিন্তু এই কারণে তাহাকে মিশরীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী মনে করিবার হেতু নাই।

* হড়প্পা ও মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা; † বাবুল ও অসুর সভ্যতা।

মোটের উপর যুক্তিসহ মত হইল—বাবুল ও অসুর সভ্যতার মত সিন্ধু সভ্যতাও মিশরের নিকট ঋণী—এবং কালিক বিচারে ইহারা উভয়েই মিশরীয় সংস্কৃতির অনুজা। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে মানব প্রগতির একমাত্র উদ্গম স্থানই মিশর।

মানব সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে মিশবেব পরিবেশ খুবই অনুকূল ছিল। নীলের উত্তরবাহী ধারায় মিশরের ভূমি সর্বদা প্লাবিত হইয়া থাকিত। যাযাবর মানুষের নিকট এই উর্বর ভূমির একটা সহজ আকর্ষণ ছিল। বিশেষত অন্তিম হিমযুগের সমাপ্তি সময়ে সাহারা মরুভূমি ছিল না; শ্যামল তৃণগুল্মে সাহারার প্রান্তর তখন আস্তীর্ণ হইয়া থাকিত—ঋতুব কঠোরতা না থাকায় বৎসর ভরা সেখানে ফল পুষ্পের সমারোহ চলিত। তাই শিকার বা ফলমূল সঞ্চয়ের পক্ষে সাহারাতে কোন অসুবিধা ছিল না। খুব সম্ভব শিকার যুগের অন্তে মানুষ নীল উপত্যকায় প্রথম * শস্য বপন করে। তখন সাহারা অতিক্রম করিয়া নীল উপত্যকায় যাতায়াতের পথ সুগম ছিল; কারণ চতুষ্পার্শ্বের প্রান্তর তখনও নির্জল ও বালুময় হইয়া পড়ে নাই। সাহারা তখন যাযাবরদের পশুপালন শুরু করিবার পক্ষে খুব উপযুক্ত স্থান ছিল। কৃষিকাজের জন্য তাহারা প্রথম যে বীজ সংগ্রহ করে—উহা এক প্রকার বন্য যব। প্রথমত তাহা একমাত্র পশুর খাদ্যরূপেই ব্যবহৃত হইত; পরে পশুর উদ্বৃত্ত খাদ্যে মানুষও ভাগ বসাইতে শিখে। পশুর জন্য তৃণ উৎপাদন আরম্ভ হইবার পর মানুষের ঘুরন্তপনার অন্ত হয়; তারপর কৃষি আরম্ভ হইলে মানুষ একেবারে স্থায়ী বসতি স্থাপন শুরু করে। আমরা নীল উপত্যকার বিশেষতা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম—নীলের জল ভূমধ্যরেখার পাহাড় ও ঝিল হইতে

* পৃথিবীতেই সর্বপ্রথম।

নামিয়া আসে। ভূমধ্যরেখায় রাত্রি দিন সমান হয়; সেখানের ষড় ঋতুও হয় একরকম, একরস—এবং বর্ষাও সেখানে প্রতি বৎসর একরূপ হয়। নীলের বান সেই যুগের কৃষকের প্রাণ ছিল। ঋতু ও বানের নিয়মিত আগমন দেখিয়া কৃষক সেখানে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত শস্য বপন করিত। যবক্ষেত বাড়িবার পর ছোট ছোট খাড়ি কাটিয়া তাহারা জল সেচনও শুরু করিয়াছিল। নীলবাসী তাই শুধু কৃষি নহে—ক্ষেত্রে জলসেকের উপযোগিতাও তাহারাই প্রথম আবিষ্কার করে। সম্ভবত নীলের কৃষকই পৃথিবীতে প্রথম ঘুরন্তপনা ছাড়িয়া এক জায়গায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়। এক স্থানে বসতের জন্য তখন ইহারা প্রাকৃতিক পরিবর্তন-গুলিও লক্ষ্য করিবার অবসর পায়;—ইহারা লক্ষ্য করে যে একটি নিশ্চিত সময় অতীত হইলে প্রতি বৎসর নীলে প্লাবন আসে; এবং এই প্লাবনের সময় কয়েক মাস আগের অস্তমিত লুব্ধক আবার আকাশে দেখা দেয়। এই ভাবে লুব্ধকের উদয়াস্তের দিন গুণিয়া ইহারা সৌর-বর্ষের পরিমাণ নির্ণয় করে। ইহার পর নীলের বান বা কোন বিশেষ ঋতুর আগমের জন্য তাহারা আর অনিশ্চিত প্রতীক্ষা করিত না; তখন ঋতুর আগম এবং নীলের স্ফীতি সম্পর্কে তাহারা ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারিত। সাধারণ মানুষের চোখে এইসব সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তিরা ক্রমেই অধিকতর সম্মানের পাত্র হইয়া পড়ে;—ক্রমে তাঁহারা পিতর, মহাপিতর, এবং পরে সামন্ত ও দেশের রাজার আসন পায়। মানুষও ইহাদিগকে আর শুধু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয়, সর্বজ্ঞ, এমন কি সর্বশক্তিমান মনে করিতে থাকে। সমাজবিকাশের ফলে অবশ্য মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়—কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত অজ্ঞানতাকে প্রশ্রয় দিয়া পিতর, মহা-পিতরের সম্মান তাহারা বহুদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ভারতীয় সমাজে আধুনিক জ্ঞানীও 'রাম, রাম' 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' রবে যেমন নৃত্য করেন—প্রাচীন মিশরের স্বেচ্ছাকৃত অজ্ঞানতাও এইরূপই

মানবতত্ত্বজ্ঞদের মতে কৃষি, ক্ষেত্রসিঞ্চন, বর্ষগণনা—এবং এমন আরও বহুতর বিদ্যা—প্রথম নীলউপত্যকায় আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে এই বিদ্যা দজলা-ফুরাতের উপত্যকা * পার হইয়া সিন্ধুউপত্যকা এবং পরে চীন ও প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপমালায় বিস্তৃত হয়—সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা এবং য়ুরোপীয় ভূখণ্ডেরও সর্বত্র ইহাদের প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। ‡ মিশরীয় সভ্যতার আলোচনায়ও দেখিব—পিতৃসত্তার যুগে সেখানে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছে; এবং কৃষি ও পশুপালন এই সম্পত্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ব্যৈক্তিক সম্পত্তি সৃষ্টির পূর্বে সমাজে কলহবিবাদ কম ছিল; আদিম মানুষ যূথবদ্ধ ভাবে ফলমূল অর্জন করিত, শিকার করিত, এবং যূথের অর্জিত সম্পত্তি সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত—এবং প্রয়োজন হইলে যূথবদ্ধভাবেই সকলে উপবাসী থাকিত। ব্যৈক্তিক সম্পত্তি মানুষের লোভ ও স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়া সমাজে কলহ বিবাদের উদ্ভব ঘটাইয়াছে।

২। পরিবার ও বিবাহ

জন সমাজে এক প্রকার শিথিল মিথুন-বিবাহের প্রচলন হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে পতি পত্নীর সম্পর্ক অবশ্য অনেকটা নিশ্চিত হয়, কিন্তু স্ত্রী জাতির জন্য তখনও কোন কঠোর বিধানের সৃষ্টি হয় নাই—বিশেষত মাতৃসত্তার সময়ে এক স্ত্রীর বহুপুরুষসংসর্গ মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু সমাজে এই অবস্থা কাটিয়া ক্রমে পুরুষের আধিপত্য আসিল—এবং সম্পত্তির অর্জন ও স্বামিত্ব উভয়ই পুরুষের হাতে গিয়া

---

* মেসোপোতামিয়া ; ‡ Elliot Smith এর Diffusion theory of the growth of Civilisation.

পড়িল। এই সময় স্ত্রীজাতির পূর্বের স্বচ্ছন্দতাকে পুরুষ আর সহ্য করিল না; ফলে স্ত্রীকে স্বামীর বশবর্তিতা স্বীকার করিতে হইল এবং তাহার একাধিক বিবাহের আর কোনরূপ ক্ষমতা রহিল না। তবে পতির মৃত্যুর পর স্ত্রীর পুনর্বিবাহে সমাজ আপত্তি করিত না। একবিবাহের কড়াকড়ি তখন অবশ্য শুধু স্ত্রীজাতির জন্যই ছিল—পুরুষের বেলায় সমাজের নিয়ম নিগড় বা বিধান এত কঠোর ছিল না। এশিয়াতে বহুবিবাহ বিষয়ে বরাবরই বাড়াবাড়ি আছে—এমন কি এখনও ভারতবর্ষে—এবং অন্যান্য এশিয়াই দেশে—বহুপত্নীকতাকে সমাজ নিন্দা করে না। কিন্তু য়ুনান, * রোম প্রভৃতি দেশে ঐতিহাসিক যুগেই পুরুষের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়—য়ুরোপেও একপত্নীত্বের প্রথা বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বিবাহাদি ব্যাপারে তাই য়ুরোপকে এশিয়াই দেশ হইতে উন্নত বলিতে হয়। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে য়ুরোপে স্ত্রী-পুরুষের যৌন স্বাধীনতা একেবারে সমান—য়ুরোপীয় সমাজে একপত্নীত্ব চলিবার পরও পুরুষের বেশ্যা বা রক্ষিতা সংসর্গের এক প্রকার প্রকাশ্য অধিকার ছিল; কিন্তু স্ত্রীর বেলায় সমাজ এইরূপ সামান্যতম কোন স্খলনও সহ্য করিত না—স্ত্রীর দিক হইতে বিন্দুমাত্র স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ পাইলে সমাজ তাহার জীবন দুর্ভর করিয়া তুলিত। য়ুরোপেও পুরুষের দিকে পাল্লা ভারী হইবার কারণ এই যে—নিজের উৎপাদিত সম্পত্তির মালিক হইয়া পুরুষ তখন সমাজের চৌধুরী বনিয়া গিয়াছে। পিতৃসত্তা যুগে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক ছাড়া অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কেও বহু নূতন পরিবর্তন হইয়াছিল। জনযুগে আদিম সাম্যবাদী রীতিনীতি অনেকটা নির্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু তখনও তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই;

* গ্রীস।

পিতৃসত্তা স্থাপিত হইবার পর সমাজে শ্রেণীভেদ আরম্ভ হয়, তাহার সঙ্গে সাম্যবাদী রীতিনীতি সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়।

৩। অস্ত্র ও হাতিয়ার

পিতৃসত্তা স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বর্বর সংস্কৃতির চূড়ায় পৌঁছিয়া যাইতেছি। পূর্বে মানুষ কাঠ, পাথর এবং পশুর হাড় ও শিঙের অস্ত্র ব্যবহার করিত; কিন্তু এই যুগে তামার আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের শক্তিতে বিপ্লবকরী পরিবর্তন হয়। এখন তামার কুঠার, তলোয়ার, তীর এবং ভল্লের তাহারা ব্যবহার শিখে; এবং পাষাণ-আয়ুধধারী জাতির উপর ইহার ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করে। য়ুরোপীয়দের শক্তিশালী অস্ত্রের নিকট এশিয়া আফ্রিকার জাতি যেমন পরাজিত হইয়াছিল ইহাও ঠিক সেইরূপ। বলা বাহুল্য কৃষির মত ধাতুর আবিষ্কারও প্রথম মিশরেই হয়। মিশরীদের সর্বাপেক্ষা পুরাতন পিরামিড চিয়োফ খ্রীষ্ট জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বের। ইহাতে ব্যবহৃত পাষাণখণ্ডকে ফাড়িবার জন্য তখন তামার ছেনি বা অন্যান্য হাতিয়ারের নিশ্চয়ই প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই * বলিয়াছি যে মিশরীরা পাথরের মধ্যে কাঠ ঢুকাইবার জন্য তাহাতে তামার ছেনি দিয়া ছিদ্র করিত; এবং পরে ঐ পাথরের খণ্ডটিকে জলে ফেলিয়া রাখিলে ভিজা কাঠের স্ফীতিতেই তাহা ফাটিয়া যাইত।

খুব সম্ভব এই যুগে মানুষ দস্তা ও তামার মিশ্রিত ধাতু পিতলের ব্যবহারও শিখিয়াছিল। ধাতুর আবিষ্কার হওয়ায় তখন যে শুধু শিকার বা যুদ্ধ বিগ্রহেরই সুবিধা হইয়াছিল এমন নহে; ইহাতে শিল্পসম্বন্ধী হাতিয়ার অর্থাৎ লাঙলের ফাল এবং এইরূপ আরও অন্যান্য জিনিসেরও উন্নতি

* 'বিশ্বের রূপরেখা' দ্রষ্টব্য।

হয়। মানুষ মাটির বাসন হইতে শুরু করিয়া তখন ক্রমে ধাতুপাত্রের নির্মাণ শিখে—এবং ইহার ফলে রন্ধনকলাও বেশ আর একটু অগ্রসর হইয়া আসে। এইবার তাহারা ভুনা মাংস ছাড়িয়া সিদ্ধ ও পরিপক্ব মাংস ও তরকারি খাইতে আরম্ভ করে; এবং নূতন হাতিয়ারে বন আবাদ করিয়া কৃষির জন্য বহু উপযোগী ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া লয়।

৪। সম্পত্তি

পশুপালনের মধ্য দিয়া পিতৃসত্তা ও পুরুষপ্রাধান্য স্থাপিত হয়—এবং ইহার আনুষঙ্গিকরূপে ব্যৈক্তিক সম্পত্তিরও উদ্ভব ঘটে। কৃষিকর্মের সাহায্যে মানুষ যাযাবর হইতে গৃহস্থ হইয়াছিল; কিন্তু ভূসম্পত্তির উপর তখনও ব্যক্তির কোন অধিকার ছিল না—ভূমির উপযোগ * এবং উপজ, শুধু এইটুকু মাত্র তখন ব্যৈক্তিক ছিল। রুশ এবং ভারতবর্ষে গত শতাব্দীতেও ভূমিতে সাংঘিক অধিকার দেখা গিয়াছে। অমু:রো'র † অনেক তিব্বতী গোষ্ঠীতে এখনও ভূমির উপর পারিবারিক অধিকার নাই—সেখানে ভূমি সমগ্র গ্রামের সামূহিক সম্পত্তি। এই ভূমিতে কেহ এক সঙ্গে দুই বৎসরের বেশি শস্য ফলাইবার অধিকার পায়না। তৃতীয় বৎসর পড়িলে নূতন বণ্টনের জন্য প্রত্যেক কৃষককেই তাহার ক্ষেত ছাড়িয়া দিতে হয়। এক বৎসর পরে কৃষক আবার তাহার পুরাতন ক্ষেতের অধিকার পাইতে পারে,—কিন্তু এইবারও একাদিক্রমে দুই বৎসরের বেশি সে তাহাতে চাষ করিতে পারেনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে শিখ শাসনকাল পর্যন্ত পঞ্জাবেও অনেক স্থানে ভূমির উপর গ্রামিক অধিকার ছিল। তখন প্রত্যেক পরিবারকেই কৃষির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি দেওয়া হইত—কিন্তু তাহা বিক্রয় করিবার বা

---

* ভূমি ব্যবহারের অর্থাৎ জোতের ক্ষমতা; † চীন, কন্সু।

বন্ধক দিবার অধিকার পরিবারের থাকিত না। জারের অন্তিম দিন * পর্য্যন্ত রুশদেশেও কোন কোন স্থানে এই প্রথা বর্তমান ছিল—অক্টোবর বিপ্লবের পর সাম্যবাদী পদ্ধতির সহায়তায় এই প্রথা আরও ব্যাপক এবং কার্যকরী হয়।

সমাজে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির দৌড় আরম্ভ হইবার পর কিছুতেই তাহার রাশ টানা গেলনা। লোভ বাড়িয়া যাওয়ায় মানুষ ক্রমেই ভূমিকে ব্যৈক্তিক করিয়া লইতে আগ্রহী হইল। ভূমি ব্যৈক্তিক হওয়ায় তাহার বিক্রয় বন্ধক বা বিনিময়েরও আর কোন বাধা থাকিল না। কিন্তু ইহাতে সমাজে এক ভীষণ নূতন বিষমতার সৃষ্টি হইল; কোন কোন পরিবার এখন বহু ক্ষেত ও পশুর মালিক হইয়া গেল; কেহ অত্যন্ত কম ক্ষেত ও কম পশুর, এবং কেহ এই সমস্ত সম্পত্তি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল। সমাজের এই নব ব্যবস্থার মূলে কোন উচ্চ আদর্শ বা মহৎ প্রেরণা ছিল না। মানুষের নীচতা, শঠতা, হিংস্রতা এবং সার্বজনিক সম্পত্তির লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষা—এই কয়টি মিলিয়া ব্যৈক্তিক সম্পত্তিকে পাকা করিয়া দিয়াছিল।

বুদ্ধ ও ব্যৈক্তিক সম্পত্তি—সাংঘিক সম্পত্তি নষ্ট হইবার পরও সমাজে উহার প্রশংসক এবং ব্যৈক্তিক সম্পত্তির নিন্দুকের আবির্ভাব হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মুনে-চেন্‌পো † সমাজের দারিদ্র্য ও অসন্তোষ দূর করিবার জন্য সম্পত্তিকে সাংঘিক নয়—তাহা সকলের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। মুনে-চেন্‌পোর সাম্যাদর্শে বুদ্ধের উপদেশাবলীর নিশ্চয়ই অনেক প্রভাব ছিল—কিন্তু বুদ্ধ নিজে সম্পত্তি ব্যক্তিগত ভাবে বিতরণের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহার আদর্শ ছিল সম্পত্তির সংঘীকরণ, অর্থাৎ তাহাতে সমূহের অধিকার

* ১৯১৩ খ্রী০ ; † ৮৩৩-৪৭ খ্রী০, † তিব্বতীয় সম্রাট্।

প্রতিষ্ঠা। এই সম্পর্কে বুদ্ধের বিচার দীর্ঘনিকায়ের * অগ্গঞ্ঞ সুত্তে পাওয়া যাইতেছে। মানুষ ও সমাজের প্রারম্ভ সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া বুদ্ধ বলিতেছেন :—

"...লোকের বিবর্ত হইবার পর জগত জলে জলময় ছিল;... তখন চারিদিকে গভীর অন্ধকার...চাঁদ নাই, সূর্য নাই, নক্ষত্র নাই;... রাত্রি দিনের অস্তিত্ব নাই...মাস পক্ষও প্রকট হয় না; ঋতুও না, বর্ষাও না...স্ত্রীপুরুষও না...

"গরম দুধ শীতল হইলে সরের মত...রসা পৃথিবীর সৃষ্টি হইল... তখন চন্দ্র এবং সূর্য প্রকট হইল...মাস ও বর্ষ, ঋতু ও পক্ষ সৃষ্ট হইল... নাগের ফণার মত পৃথিবী পাপড়ি মেলিল...মদ্রলতার জন্ম হইল এবং সত্ত্ব † মদ্রলতা খাইতে লাগিল...রোপন বপন ছাড়া ক্রমে চাউল জন্মিল ...সত্ত্ব বহুদিন ধরিয়া চাউল খাইল... চক্ষু তুলিয়া পরে পরস্পরের ‡ দিকে তাকাইতে রাগ জন্মিল...উভয়ে তখন মৈথুন করিল; লোকে মৈথুন দেখিলে তখন ধূলি ছুঁড়িত, কাদা দিত, গায়ে গোবর ফেলিয়া দিত, আর বলিত, 'আ বৃষলী! দূরহ দূরহ! এক সত্ত্ব অপর সত্ত্বকে এই করিবে!' আজও অনেক দেশে নববধূ আনিবার সময় তাহার উপর ধূলি ছুড়ে...ইহা আগের সেই কথা মনে করিয়া....কিন্তু লোকে ইহার অর্থ বুঝে না; ইহা একদিন অধর্ম ছিল, কিন্তু এখন তাহা ধর্ম হইয়াছে...মানুষ অবশেষে ঘর বাঁধিতে আরম্ভ করিল...

"এক অলস ভাবিল, 'সকাল সন্ধ্যা দুইবার চাউল আনিবার কষ্ট করি কেন? একবারেই ত দুই বেলার শালি লইয়া আসিতে পারি'... ইহার পর সে একবারেই চাউল লইয়া আসিল...অন্য প্রাণী পরে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, 'চল শালি আনিতে যাই'...'হে সত্ত্ব! আমি ত

* দীর্ঘনিকায় ১৭; মৎকৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য; † প্রাণী, ‡ স্ত্রীপুরুষ।

শালি লইয়া আসিয়াছি'...এখন এই সত্ত্ব পূর্বের সত্ত্বের মত একবারে শালি লইয়া আসিত...তৃতীয় সত্ত্ব ইহা দেখিয়া চার দিনের শালি লইয়া আসিল...ইহার পর প্রত্যেক প্রাণীই শালি জমা করিয়া পরে খাইত.. এই পাপে চাউলের গায়ে তুষ হইল...শালি গাছ তুলিয়া লইলে তখন আর গাছ হইত না; এইভাবে মধ্যে মধ্যে খালি হইয়া...শালির ক্ষেত খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল...

"তখন সকলে একত্র হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল,...'আমাদের মধ্যে পাপ আসিযাছে' ..তাহারা ক্রমে শালির ক্ষেত বাটিয়া লইল; ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে আল বাঁধিযা দিল...এক লোভী সত্ত্ব আপন ভাগ রক্ষা করিয়া অন্যের ভাগ খাইয়া গেল *...তাহাকে ধরিয়া লোকে বলিল, 'হে সত্ত্ব, তুমি ইহা পাপ করিতেছ ..আর এইরূপ করিও না'...দ্বিতীয়বার...তৃতীয়বার ..তাহাকে ধরিয়া সকলে বলিল, 'হে সত্ত্ব, তুমি ইহা পাপ করিতেছ'; পরের বার কেহ হাতে, কেহ লাঠি দিয়া, কেহ ঢিল দিয়া তাহাকে মারিতে লাগিল ......ইহার পর চুরি, নিন্দা, মিথ্যা...এবং দণ্ডকর্ম সৃষ্টি হইল......তখন প্রাণীরা একত্র হইয়া বলিতে লাগিল, 'আমাদের মধ্যে পাপ আসিযাছে...চল আমরা একজনকে নির্বাচিত করি...তিনি নিন্দনীয়কে নিন্দা করিবেন, কর্তব্য কর্মকে নির্দিষ্ট করিবেন, আর বহিষ্কারের যোগ্যকে বহিষ্কৃত বলিয়া দিবেন...আমরা তাঁহাকে আমাদের শালির অংশ দিব'...তখন ইহারা নিজেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বর্ণবান্, দর্শনীয় ও শক্তিশালী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইল...'হে সত্ত্ব! তুমি ন্যায় অন্যায়ের অনুশাসন দাও...নিন্দনীযকে নিন্দা কর, কর্তব্যকে নির্দিষ্ট কর, আর বহিষ্কারের যোগ্যকে বহিষ্কৃত করিয়া দাও...আমরা তোমাকে শালির অংশ দিব'...ইনি 'তাহাই হউক' বলিয়া স্বীকার করিলেন ..মহাজন

* অর্থাৎ চুরি করিয়া।

দ্বারা সম্মত হইলেন বলিয়া ইহার প্রথম নাম মহাসম্মত ; ক্ষেত্রের অধিপতি বলিয়া দ্বিতীয় নাম ক্ষত্রিয় ; ধর্ম দ্বারা সকলের রঞ্জন করেন বলিয়া তৃতীয় নাম রাজা…"

বুদ্ধের পূর্বোক্ত বিচার হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ব্যৈক্তিক সম্পত্তির বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে ভূমিকে বিভক্ত করাই পাপ এবং তাহা মানবের অধোগতির চিহ্নস্বরূপ। কিন্তু অবস্থাবিপর্যয়ে অযুক্তিও যুক্তি হইয়া উঠিতে পারে—তাই ব্যৈক্তিক সম্পত্তিই শেষে বুদ্ধকে দিয়া রাজতন্ত্র স্বীকার করায়। বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সংঘকে ব্যক্তি অপেক্ষা বহু উচ্চে মনে করিতেন ; তাহার নিকট সংঘের স্বার্থ, অন্ততঃ ভোগ্যবস্তুর অধিকার সম্পর্কে, ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা মূল্যবান ছিল। একদিন প্রজাপতি গৌতমী * একজোড়া ধুস্সা † লইয়া বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন, ‡ 'এই ধুস্সা দুইটি আমার নিজের কাটা সুতায় তৈয়ারী ; ইহাদের বয়নও আমি নিজেই করিয়াছি…হে বুদ্ধ, তুমি এই নব বসন দুইটিকে স্বীকার কর।' বুদ্ধ উত্তর দিলেন, 'গৌতমী, ইহা সংঘকে দান করুন—সংঘকে দিলেই আমিও সম্মানিত হইব এবং সংঘও কৃতার্থ হইবে।' গৌতমী আরও অনুনয় করিলে পর বুদ্ধ বলিলেন, 'কোন ব্যৈক্তিক দানকেই আমি সংঘকে দানের চেয়ে শ্রেয়তর মনে করি না।' বুদ্ধ শেষে গৌতমীর আনীত বসন সংঘকেই দান করাইয়াছিলেন।

সংঘসম্পর্কে বুদ্ধের কিরূপ দৃষ্টি ছিল তাহা ভিক্ষুদের আচরণীয় বিনয় গুলি § হইতে জানা যায়। নিম্নে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :

"যদি কোন ভিক্ষু সংঘের মঞ্চ, পীঠ, শয্যা ও উপাধান ব্যবহারের পর বিন্যস্ত করিয়া না রাখে, কিংবা তাহা অপর দ্বারা বিন্যস্ত না করায়,

---

* বুদ্ধের বিমাতা ; † বস্ত্র বিশেষ ; ‡ দক্‌খিণ বিভংগসুত্ত, মজ্ঝিমনিকায় ; সংস্কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য ; § নিয়ম, চর্যা।

অথবা এইভাবে অবিন্যস্ত রাখিয়া বিনা জিজ্ঞাসায় চলিয়া যায়, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।'

"যদি কোন ভিক্ষু জ্ঞাতসারে সংঘের লাভকে ব্যৈক্তিক লাভে পরিণত করে, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"†

বুদ্ধ তাঁহার আর্থিক সাম্যবাদকে সাধারণের মধ্যে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করেন নাই ; পক্ষান্তরে ভিক্ষুকদের জন্য কয়েকটি নিয়ম-নির্দেশ অনিবার্য্য করিয়া দিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। বুদ্ধের নির্দেশ অনুযায়ী ভিক্ষু মাত্র ৮টি জিনিস তাহার ব্যৈক্তিক সম্পত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিত :—(১) একটি ভিক্ষাপাত্র ‡, (২) তিনটি পরিধেয় বস্ত্র, (৩) একটি সূঁচ, (৪) একটি ক্ষুর, (৫) একটি কটিবন্ধ, (৬) একটি জলপাত্র। এই আটবস্তুর অতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই সংঘের হইত এবং ভিক্ষুকে তাহার সুরক্ষার ভার লইতে লইত। কীটাগিরিতে ¶ বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের একটি বিহার ছিল ; একদিন ভিক্ষুরা সেই বিহারের সমস্ত সম্পত্তি এবং শেষ পর্যন্ত বিহারটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। ইহা শুনিয়া বুদ্ধ তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করেন, § "...অপদার্থেরা সংঘের শয়ন আসন বণ্টন করিল কিরূপে ?...এই পাঁচটি বস্তু সর্বদাই অবিভাজ্য ; ইহাদিগকে বিভাগ করা যায় না, বিভাগ করিলেও ইহারা অবিভক্তের মতই থাকিয়া যায় : (১) উদ্যান ও উদ্যানবাটি, (২) বিহার ও বিহারের বাসগৃহ, (৩) তাকিয়া, তোষক, চতুষ্পদী খট্বা...(৪) তামার কলসী, ভাঁড়, বারক,...কটাহ, কুঠার, খনিত্র এবং কোদাল, (৫) তৃণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠপাত্র ও মৃৎপাত্র।'

ভিক্ষুর মৃত্যু হইলে তাহার অষ্টসম্পত্তি সংঘের অধিকারে আসিত—

---

* ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ৫।১৪ ; বিনয় পিটক, † ঐ, ৩।৮০, ঐ, ‡ ইহা ৫ : টির পা কালী, § ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ (মহাবগ্গ)।

ইহাতে কোন ভিক্ষু বা শিষ্যের ব্যৈক্তিক অধিকার থাকিত না। তবে রুগ্ন ভিক্ষুককে কেহ সেবা করিলে ভিক্ষুর মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির অংশ বিহিত হইত। § "মৃত ভিক্ষুর বস্ত্র ও পাত্রের অধিকারী সংঘ ; যদি রোগি-পরিচারক বিশেষ সেবা করিয়া থাকে···তবে সংঘ ভিক্ষুর বস্ত্র ও পাত্র পরিচারককে দিবে।" কিন্তু এই দান সম্পর্কে আবার বলা হইয়াছে :—"উক্ত রোগিপরিচারক ভিক্ষুসংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিবে, 'ভন্তে ‡ সংঘ, অমুক নামের ভিক্ষু মৃত হইয়াছেন ; উহার ত্রিবস্ত্র ও পাত্র রক্ষিত আছে।' ইহা শুনিয়া কোন সমর্থ ভিক্ষু পুনরায় সংঘের নিকট সূচিত করিবে, 'পূজ্য সংঘ অবধান করুন, অমুক নামের ভিক্ষু মৃত হইয়াছেন, তাঁহার পাত্র ও ত্রিবস্ত্র রক্ষিত আছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তবে এই ত্রিবস্ত্র ও পাত্র রোগিপরিচারককে প্রদান করা হউক।'···এই ভাবে বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত জ্ঞপ্তি বা সূচনা শেষ হইলে মূল প্রস্তাব সম্পর্কেবিবেচনা হইত—ইহার নাম অনুশ্রাবণ :—"ভন্তে সংঘ অবধান করুন, অমুক নামের ভিক্ষু মৃত হইয়াছেন। তাঁহার ত্রিবস্ত্র ও পাত্র রক্ষিত আছে। সংঘ এই পাত্র ও বস্ত্র রোগিপরিচারককে প্রদান করিতেছেন। আয়ুষ্মানগণের মধ্যে যিনি ইহা অনুমোদন করেন, তিনি নীরব থাকুন—যিনি অনুমোদন করেন না তিনি তাঁহার বক্তব্য বলুন।" সংঘের সম্মুখে উল্লিখিত প্রস্তাবটিকে তিনবার উপর্যুপরি বিবেচনার জন্য দেওয়া হইত। এই তিনবারের মধ্যে কাহারও আপত্তি থাকিলে তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেন। সংঘে মতভেদ হইলে ভিন্ন বর্ণের কাঠের শলার সাহায্যে * ছন্দ লওয়া † হইত। তৃতীয়বার পর্যন্ত সংঘ নীরব থাকিলে বক্তা তখন ধারণা ¶ প্রকাশ করিতেন :

§ ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ (চুল্লবগ্গ ৫।৩) ; ‡ মাননীয় ; * দুই রঙের কাঠের শালায় যথাক্রমে সম্মতি ও অসম্মতি বুঝাইত ; † ভোট লওয়া ; ¶ 'প্রস্তাব গৃহীত হইল, —এই মত।

সংঘ স্বীকৃত হইয়াছেন; এইজন্য সকলেই নীরব; ইহা আমি লক্ষ্য করিতেছি।" ইহার পর রোগিপরিচায়ক মৃত ভিক্ষুর পাত্র ও ত্রিবস্ত্র গ্রহণ করিত; কিন্তু তাহাতে পরিচারকের ব্যৈক্তিক সম্পত্তির কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত না। বৌদ্ধ সংঘে অষ্টসম্পত্তির বেশি একটি তৃণও কাহারও নিকট থাকিবার উপায় ছিল না। নূতন পাত্র ও বস্ত্র গ্রহণ করিবার পর ভিক্ষুকে তাহার পূর্বসামগ্রী সংঘে জমা দিতে হইত।

বুদ্ধ তাঁহার সাম্যবাদকে পরিমিত ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুধু ভিক্ষুসংঘে চালাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার যে, শতাব্দী না যাইতেই বৌদ্ধ সাম্যবাদ অচল হইয়া গেল; বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং বিফল হইয়া গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে ভিক্ষুরা প্রচণ্ড ব্যৈক্তিক সম্পত্তি জাঁকাইয়া বসিলেন—এবং আজও বৌদ্ধ মঠে সাংঘিকতার যে কথা শোনা যায়—তাহাও শুধু কথাই। বুদ্ধের সাম্যবাদ বিফল হইবার অবশ্য কয়েকটি সমাজিক কারণ বর্তমান ছিল: সেই যুগের দাসতাযুক্ত সামন্তবাদকে সমাজের আর্থিক অবস্থা যেদিকে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ দিতেছিল—বুদ্ধের সাম্যবাদ তাহার অনুকূল ছিল না; দ্বিতীয়তঃ এই সাম্যবাদ শুধু বণ্টনসর্বস্ব সাম্যবাদ, অর্থাৎ ইহাতে শুধু বণ্টনের কথাই আছে—কিন্তু সমাজের উৎপাদনের সঙ্গে ইহার সামান্য সম্পর্কও নাই; তারপর তৃতীয় কথা, বুদ্ধের সময় সমাজ ব্যক্তিবাদী ছিল—এই অবস্থায় সমগ্র সমাজের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া শুধু একস্থানে সাংঘিকতা চলিতে পারে না।

৫। শিল্প ও ব্যবসায়

এই যুগে গৃহশিল্প, পশুপালন, বিনিময় ও কৃষিকর্মের অতিরিক্ত একটি নূতন শিল্প—অর্থাৎ ধাতুশিল্পেরও উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে। অনেক পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে অবশ্য তখনও শিকার এবং ফলসঞ্চয়নই একমাত্র

জীবিকা ছিল ;—এই আদিম বন্য অবস্থা পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যে আজ অবধি বর্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) **পশুপালন**—ভেড়া, ছাগল, গরু, কিংবা মহিষ, ঘোড়া, অথবা গাধা, ইহাদের সমস্তই দেশানুসারে মানুষের গৃহপশু হিসাবে গণ্য হইয়াছিল। জনযুগে পশুর চামড়া, মাংস—তাহার দুধ এবং ইহার সোওয়ার বহিবার ক্ষমতাকে মানুষ সম্পূর্ণ কাজে লাগাইয়াছিল কিনা জানা যায় না ; কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে আসিয়া মানুষ পশুর এই বহুমুখী উপযোগিতা যে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিল তাগাতে সন্দেহ নাই। এই সব জন্তুর মধ্যে একমাত্র ঘোড়া ছাড়া আর সমস্তই আফ্রিকার জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যাইত ; এই কারণে মিশরীয়দিগকে পশুপালনের দিক দিয়াও পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে অগ্রবর্তী মনে করিতে বাধা নাই।

(২) **কৃষি**—বন্য যব হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া মিশরীরা সর্বপ্রথম কি ভাবে কৃষিকাজ আরম্ভ করে—তাহা আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। আর্যেরা ইহার বহু পরে, অর্থাৎ প্রায় ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে, ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। ইহার হাজার বৎসর পূর্বে, প্রায় ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সমসাময়িক কালে তাহারা সিন্ধু উপত্যকায় বাস করিত, তাহাদের দাসতা ও পিতৃসত্তামূলক সমাজে তখন ধানের চাষ হইত ; কিন্তু ফলফলারির চাষ করিবার বিদ্যা আর্যেরা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে তেমন জানিত না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অবশ্য ইহা বহু পূর্বেই প্রচলিত হয় ; এবং এই হিসাবে এঙ্গেলসের কথা—মানুষ শস্য বপনের আগে ফলের গাছ লাগাইয়াছিল—ইহা সত্য।

(৩) **বিনিময়**— জনযুগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের সঙ্গে অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসের অদলবদল বা বিনিময় আরম্ভ হয়। পিতৃসত্তার সময়ে জনযুগের সাংঘিক স্বার্থ নষ্ট হইয়া তাহার স্থলে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা হয় ; এবং ইহার ফলে প্রত্যেকেই নিজের ক্ষণস্থায়ী

ও সুলভ বস্তুর সঙ্গে অন্যের স্থায়ী এবং অধিক মূল্যের জিনিস বিনিময় করিতে ইচ্ছা করে। প্রথম এই বিনিময় ব্যাপারে পশু, এবং আর্যদের বেলায় তাহাদের গোধন, মুখ্য স্থান অধিকার করিত। পরে তামার খোঁজ পাইবার পর হইতে বিভিন্ন ওজনের ধাতুখণ্ডের মাধ্যমে বিনিময়ের কাজ চলিতে থাকে। বিনিময়ে ধাতুর মধ্যস্থতা স্বীকৃত হইবার পরও উৎপাদকেরা বহুদিন তাহাদের পণ্য সোজাসুজি বিনিময় করিত। পিতৃসত্তার যুগে বিনিময়ের খুব প্রসার হইলেও সমাজে তখন পর্যন্ত ব্যবসায়ের জন্য এক বিশেষ বর্গ অর্থাৎ বানিয়া বর্গের সৃষ্টি হয় নাই।

(৪) ধাতুশিল্প—প্রাচীন প্রস্তরাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে মানুষ ক্রমেই কঠিনতর পাথরের অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই অনুসন্ধানের ফলে একদিন প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় তাম্রের আবিষ্কার হয়। তাম্রের একটি গুণ যে, অন্য ধাতুর মিশ্রণ ছাড়াও ইহাতে তীক্ষ্ণতা বা দৃঢ়তার কোন অভাব হয় না। তামার এই গুণের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই মানুষের অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ইহা লৌহযুগের বহুদিন পূর্বের কথা—প্রাচীন মিশর, মেসোপোতামিয়া বা সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা লৌহের ব্যবহার আদৌ জানিত না। খনন কার্যের ফলে এই সব স্থান হইতে যে সকল ধাতুদ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমস্তই তাম্রের। হিন্দীআর্যেরা অফগানিস্তানে পৌঁছিবার সময় পর্যন্ত ‡ লৌহ তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয় চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পুথিপত্রেও সংস্কৃত 'লৌহ' শব্দ তাম্রের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বে লঙ্কায় একটি বিরাট মঠ ছিল; তাহা লৌহমহাপ্রসাদ নামে অভিহিত হইত; কিন্তু এই মঠের ছাত তাম্রে নির্মিত ছিল—এখানেও তাম্র অর্থেই লৌহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত না হইয়াও সংস্কৃত লোহিত † শব্দের অর্থ জানিলেই

‡ ২০০০ খ্রীঃ পূঃ; † প্রাদেশিক 'লোহু' তুলনীয়।

লৌহ শব্দের ইঙ্গিত বুঝা যাইবে। লৌহ প্রকৃতপক্ষে লোহিত বা রক্তবর্ণ ধাতুরই নাম; পরে রূঢ়ি প্রয়োগে ইহার অর্থান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। লৌহ বুঝাইবার জন্য আজকাল সংস্কৃত 'অয়স্' শব্দের প্রয়োগ হয়—পশ্চিমী য়ুরোপীয় ভাষায় আইজন, আইরন প্রভৃতি ইহারই রূপভেদ। কিন্তু বৈদিক কালে এই অয়স্ শব্দও তাম্র অর্থে প্রযুক্ত হইত। লৌহ আবিষ্কারের পর তাম্রবাচক কয়েকটি শব্দই রূঢ়ি প্রয়োগে লৌহবাচক হইয়া গিয়াছে। এই অর্থবিপত্তি পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত লৌহকে 'কৃষ্ণঅয়স্' এবং তামাকে 'তাম্রঅয়স্' বলা হইত। পরে তাম্রঅয়স্ শব্দের ব্যবচ্ছেদ ঘটাইয়া, ইহার পূর্বার্ধ তামা, এবং অপরার্ধ অর্থাৎ অয়স্, লোহার জন্য নির্দিষ্ট হয়। ইহার সঙ্গে লোহিতবর্ণ ধাতু অর্থাৎ তাম্রদ্যোতক 'লৌহ'ও আধুনিক অর্থে লোহাবাচক হইয়া পড়ে।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা লৌহার আবিষ্কার ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং পিতলের আবিষ্কার ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। ইহা সত্য হইলে এই দুই ধাতুকে সামন্ত যুগের দান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহাই হউক, তাম্রের আবিষ্কারের ফলে সমাজে যে কতকগুলি পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছিল—ইহা সত্য কথা। বহু প্রকারের পাত্র, হাতিয়ার, এমনকি মিশর দেশে রঙ পর্যন্ত, তামা হইতে প্রস্তুত হইতে থাকে। এইভাবে তামার ক্রমবর্ধিত উপযোগিতায় ধাতুশিল্প শীঘ্রই * একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসাবে দেখা দেয়। তামার কাজে পারদর্শী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ লোহা এবং পিতল আবিষ্কার করে। পুরাতন তামার কারিগরেরা তখন এই দুই নূতন ধাতুর কাজকর্মেও নিজেকে পারদর্শী করিয়া লয়। তিব্বতে, হিমালয়ে, এবং ভারতবর্ষেরও

* দাসত্ব যুগে পৌঁছিতে পৌঁছিতে।

কোন কোন স্থানে, লোহারকে * আদিম জাতির মধ্যে গণ্য করা হয়। এই সব লোহারের বহু গোষ্ঠী এখনও পুরাতন যাযাবর অবস্থায়ই দিন কাটাইতেছে; ইহাতে মনে হয় লৌহশিল্পের প্রচলন এই সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল। মধ্যপ্রান্ত ও ছোটনাগপুরে আদিম বাসিন্দাদের বস্তিতে ধাতুর কুচি ও ঝামা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেও আদিম জাতিগুলি যে অনেক যুগ আগেই ধাতুশিল্প শিখিয়া লইয়াছিল—ইহা বুঝা যায়।

ধাতুর আবিষ্কারের পরও মানুষ সহসা তাহার পাষাণ অস্ত্রকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। আজও দেখি, সমাজের একদিকে কত উন্নততর আগ্নেয়াস্ত্রেরই নির্মাণের কাজ চলিতেছে; কিন্তু অন্যদিকে সেই আদিম তীর ধনুকের যুগই এখনও শেষ হইতে পারিতেছে না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কারণ, এবং আধুনিক অস্ত্রের মহার্ঘতাও চিন্তা করিবার। ভারতবর্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সাহায্যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে প্রস্তরাস্ত্রের ব্যবহার ছিল বুঝা যায়। এলাহাবাদের নিকটবর্তী ভিটা অঞ্চলে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। পনর শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষেও প্রস্তরাস্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। ইংলণ্ডে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দেও হেষ্টিংসের যুদ্ধের সময় প্রস্তরের কুঠার যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

পিতৃসত্তাযুগে তাম্র আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে মাটির বাসনপত্র তৈয়ার হইত; পরে ধাতুশিল্পের মত মৃৎশিল্পও সমাজে একটি স্বতন্ত্র পেশা হইয়া দাঁড়ায়। তিব্বত প্রভৃতি দেশে মৃৎশিল্পীর জন্য এখনও কোন পৃথক

---

* লৌহকার, কর্মকার।

সামাজিক বর্গ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; সেখানে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই নিজেদের উপযোগী বাসনপত্র ঘরে তৈয়ার করিয়া লয়।

৬। শ্রেণীভেদের আরম্ভ

আদিম সাম্যবাদী সমাজে* ব্যৈক্তিক সম্পত্তি কি তাহা মানুষ বুঝিতে পারিত না; এমনকি সংঘ হইতে তাহার যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে—এই ধারণাই মানুষের ছিল না। তখনকার উৎপাদন সাংঘিক ছিল, এবং উৎপন্ন বস্তুর ভোগও সাংঘিক ছিল: সমাজে উচ্চ নীচ ও ধনী দরিদ্রের বিভেদ তখনও সৃষ্ট হয় নাই—তাই সমাজে তখন শ্রেণীই ছিল না এবং শ্রেণীশাসনও ছিল না। কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে আমরা স্বতন্ত্র জগতে প্রবেশ করিতেছি! তখন জনসত্তা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার সাংঘিক আচার নিয়মও লোপ পাইয়াছে; ইহার স্থলে এক ব্যক্তি—অর্থাৎ গোষ্ঠীপিতা বা পিতর—সমাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে; মানুষের ব্যৈক্তিক অস্তিত্ব বা ব্যৈক্তিক সম্পত্তিরও এখন সৃষ্টি হইয়াছে। ফলসঞ্চয় ও শিকারের অনিশ্চিত জীবনবৃত্তির স্থলে এখন পশুপালন ও কৃষির উদ্ভব হইয়াছে; ফলে আকস্মিক আকাল ও মারীর সম্ভাবনাও পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদনের গতি ধীর ছিল, জনসমাজে আসিয়াও ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে নূতন আবিষ্কৃত ধাতু ও হাতিয়ার পত্রের সহায়তায় উৎপাদনের বেগ বাড়িল—বিনিময়, গৃহশিল্প ও ধাতুশিল্পের সহায়তায় ব্যৈক্তিক সম্পত্তি লাভেরও পথ খুলিয়া গেল। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ও জনসমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছের সমন্বয়ে সৃষ্ট ছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই গুচ্ছগুলিতে

* কম্যুন।

জীবনোপযোগী বস্তুর অনটন হইতে থাকে। ইহাতে বিভিন্ন গুচ্ছের মধ্যে দ্বন্দ্ব, লোভ ও পরস্ব লুণ্ঠনের প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। তখন এই সংঘর্ষে সংখ্যা ও সংগঠনের দিক দিয়া শক্তিশালী গুচ্ছকগুলিই জয়লাভ করে। জনসমাজের সংগঠিত রূপ হিসাবে কিভাবে পিতৃসত্তা সৃষ্ট হয় তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

পিতৃসত্তার যুগে বৈয়ক্তিক সম্পত্তি বৃদ্ধি করার বিষয়ে পিতর ও মহা-পিতরদেরই সর্বাপেক্ষা সুবিধা ছিল। কারণ পশু, ক্ষেত এবং সম্পত্তি অর্জনের অন্যান্য সাধন অধিকাংশই পিতরেরা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সমাজের ভূমিহীন ও পশুহীন মানুষদিগকে ইঁহারা অন্নবস্ত্র দিয়া নিজেদের কাজ করাইয়া লইতেন—এবং তাহাদের শ্রমফল নিজে ভোগ করিতেন, এবং কিছু অংশ নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধিতে নিয়োজিত করিতেন। এই সময় বিনিময়বস্তুর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার নির্মাণের জন্য শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু হইলে কি হইবে, ইহাতে প্রভুর সহিত চাকরের অধিকার-সাম্যের কোন সুবিধা হইল না। বিশেষত আবাদের উপযোগী বহু স্থান তখনও পতিত পড়িয়া ছিল, দেশে অরণ্যের অভাব না থাকায় শিকার বা বন্য কন্দমূলের পথও বন্ধ ছিল না—তাই পিতরদের ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও সম্পত্তিহীন দাসের সংখ্যা তখন তত অধিক হইতে পারে নাই।

কিন্তু শ্রমের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে তখন এক পরিবর্তন আসিয়াছিল। পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুকে সংহার করা হইত, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাকে আহারও করা হইত;—শত্রুকে বন্দী করার নীতি পূর্বগামী সমাজে কখনও দেখা যায় নাই; কারণ, বন্দীর ভরণপোষণের দায়িত্ব লওয়া তখন সাংঘিক সম্পত্তির পক্ষে হানিকর বিবেচিত হইত। ইহার উপর সংঘসম্বন্ধ তখন এত দৃঢ় ছিল যে ইহার মধ্যে অন্যের প্রবেশ তাহারা সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু পিতৃসত্তার সময় এই

সংঘপ্রাণতা শিথিল এবং প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়। হস্তশিল্প, ধাতুশিল্প ও পশুচারণার জন্য তখন ক্রমে শ্রমসমর্থ লোকের প্রয়োজন বাড়িতে থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত খাদ্য হিসাবে খরগোস ও ইঁদুর পোষা হইত। কিন্তু চামড়ার দাম চড়িতে আরম্ভ করিবার পর ইঁদুর বা খরগোসকে আর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হইত না। এইভাবে যুদ্ধবন্দীরও নূতন উপযোগিতা আবিষ্কৃত হওয়ার পর তাহাকে হত্যা না করিয়া বন্দী করা হইত। মোটের উপর শ্রমের প্রয়োজনেই পিতৃসত্তাযুগে দাসত্তার সৃষ্টি হয়, পরে দাস এবং প্রভু এই দুইটি বিরোধী শ্রেণী সমাজে কায়েম হইয়া পড়ে।

পিতৃসত্তাযুগে শ্রমের উপজ বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যৈক্তিক সম্পত্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছিল। ধনশালীদের মধ্য হইতে সমাজে তখন এক নূতন আমীর শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। আমীরেরা আর্থিক শক্তিতে রাজনৈতিক শক্তি করায়ত্ত করিয়া তাহাকে বংশগত রূপ দিতে চেষ্টা করে। এইভাবে পূর্বের সমানতা, সাংঘিকতা সমস্তই ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়---এবং সমাজে দুই বিরোধী শ্রেণী অর্থাৎ শাসক ও শোষিতের সৃষ্টি হইতে থাকে। পূর্ববর্তী সমাজে কোন শাসক ছিল না খুবই সত্য, কিন্তু সামূহিক সম্পত্তির স্বামী সমগ্র জন তখন সশস্ত্র ছিল। জন তাহার সামূহিক সত্ত্ব ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় পরাধীনতা স্বীকার করিতে চাহিল না। তাই শ্রেণীরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রথম দিক দিয়া তেমন কুসুমাকীর্ণ হইতে পারে নাই—বহু হিংস্র সংঘর্ষ এবং রক্তপাতের মধ্য দিয়া নূতন শাসককে তাহার অধিকার স্থাপন করিতে হইয়াছে।

পিতৃসত্তার প্রাথমিক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প ব্যবসায় সমুদয়ই পারিবারিক সীমাতে আবদ্ধ ছিল। শিল্পদ্রব্যের পরিমাণ বা নির্মাণ-কৌশলের দিক দিয়া তখন যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ

নাই। প্রত্যেক পরিবারই এই সময় সুন্দর সুন্দর কাপড়, ধাতু ও মাটির বাসনপত্র—এবং এইরূপ আরও বহু জিনিস তৈয়ার করিতে পারিত। পিতৃসত্তার যুগে শিল্প প্রকৃতপক্ষে সহস্রধার হইয়া উঠে, এবং এইজন্য শিল্পক্ষেত্রে একটি শ্রমের স্থায়ী বিভাগেরও প্রয়োজন হয়। এইভাবে কৃষিকর্ম হইতে হস্তশিল্প ক্রমে পৃথক হইয়া যায় এবং ধীরে ধীরে শিল্পীদের একটি স্বতন্ত্র গুচ্ছ বা জাতির সৃষ্টি হয়। এই শ্রমবিভাগের ফলে শিল্পবস্তুর উৎপাদন বাড়িতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণের দিক দিয়াও ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি হয়। পণ্যদ্রব্যের পবিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জিনিসপত্রের দাম তখন হ্রাস পায়, এবং শিল্পদ্রব্যের উত্তরোত্তর অধিকতর চাহিদাতে শিল্পীর জীবিকা নিশ্চিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এত হইলেও উৎপাদনের ফল তখন সকলের একরূপ জুটিত না—ইহাতে শিল্পের উন্নতি সত্ত্বেও সমাজের বর্গভেদ বর্গদ্বেষ প্রভৃতি বাড়িয়াই চলিতে থাকে।

৭। শাসন

সমাজের শাসনযন্ত্রের উপর সর্বদা তাহার মূল গঠনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। পিতৃসত্তাক সমাজে বর্গভেদ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল—এইজন্য তাহার শাসনযন্ত্রে স্বাভাবিকভাবেই ইহার প্রভাব পড়িতে থাকে। সাংঘিক সম্পত্তির স্থলে ব্যৈক্তিক সম্পত্তিব বিকাশ প্রথম খুব ধীরমন্থর গতিতে আরম্ভ হয়—তখন ব্যৈক্তিক সম্পত্তির আকার, আয়তন, কিংবা প্রভাব, কিছুই এত ব্যাপক ছিল না। নূতন হাতিয়ার, নূতন উৎপাদনরীতি কিভাবে ইহার মূলে প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। সমাজে এক সময় খুব দৃঢ় সংঘপ্রেম এবং সাংঘিক রীতি প্রচলিত ছিল—কিন্তু উৎপাদনের রূপ পতিবর্তিত হওয়ায় বস্তুস্থিতি ভাবুকতাকে নির্বল করিয়া দিল। ইহার ফলে একদিন প্রায় বিনা

বাধায় মাতৃকর্তৃক সমাজ বিলুপ্ত হইয়া গেল। * মাতৃতন্ত্রের শাসনযন্ত্র মানুষের জীবনরীতির এক অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল; তখন ইহাকে সংঘের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইত না—কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে আসিয়া শাসন জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; এবং পিতর, মহাপিতরেরা সমস্ত শাসনক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রিত করিয়া লয়। জনযুগে জীবিকার সাধন সাংঘিক থাকায় জন ইহার রক্ষার জন্য অপরাধীকে শিক্ষা বা শাস্তি দিত; প্রয়োজন হইলে কখনও কখনও তাহারা বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিত, কিংবা কখনও সন্ধিও করিত—কিন্তু সকল সময়ই তাহাদের মূল স্বার্থ থাকিত সাংঘিক। পিতৃসত্তার যুগে জীবিকার সাধন বৈ্যক্তিক হইয়া উঠায় উৎপাদনসম্পর্কও তখন ব্যক্তির সঙ্গে স্থাপিত হয়। ইহার প্রভাবে নিজেদের আভ্যন্তরিক শাসন এবং প্রতিবেশীর সহিত সম্পর্ক—সমস্তই বৈ্যক্তিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। এইভাবে শাসন সমাজের সহস্রের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—এবং তাহাই আবার ব্যক্তিস্বার্থ সুরক্ষার জন্য দূর হইতে তাহাদের উপর উদ্যত হইয়া থাকে। ইহার পরবর্তী সংহতরূপই হইতেছে রাজতন্ত্র এবং বর্গভেদের আরম্ভের সঙ্গেই রাজতন্ত্রের সূচনা—তাই রাজা বিষ্ণুস্বরূপও নহেন এবং তাঁহার রাজ্যও অনাদিকালের নহে, ইহারা উভয়েই বৈ্যক্তিক সম্পত্তির সৃষ্টি—এবং বহু পরবর্তী যুগের সৃষ্টি।

পিতৃসত্তার সময় সমাজে বস্তুব আবশ্যকতা † এবং উৎপাদন খুব বহুমুখীন হইয়া পড়িয়াছিল। ধন উপার্জনের প্রতিযোগিতায় তখন বর্তমান কালের মত হঠাৎ নিঃস্ব হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না;—এইজন্য বর্গশাসনের প্রথম স্তরে ইহার গতি যে কোন দিকে তাহা মানুষ

---

* ৫৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য; † জীবনোপযোগী দ্রব্যাদির আবশ্যকতা।

ঠিক বুঝিতে পারে নাই। জনসত্তাক সমাজে জন বা সংঘের সামূহিক শক্তিই একমাত্র প্রবল ছিল—কাহারও ব্যক্তিগত বিশেষতা থাকিলে তাহাও তখন শুদ্ধমাত্র সংঘের সেবায়ই নিয়োজিত হইত,—অর্থাৎ ব্যক্তির যোগ্যতা, বীরতা, বুদ্ধি এবং পৌরুষ তখন সংঘের অন্তর্গত হইয়াই সার্থক হইত। কিন্তু বর্গসমাজে ব্যক্তির সমাজসম্পর্ক এত গভীর নয়, এখানে ব্যক্তিব শুধু ব্যক্তি হিসাবেই প্রাধান্য আছে; তাহার যোগ্যতা এখন একমাত্র শারিরীক বা মানসিক গুণের উপরই নির্ভর করে না— এই সমাজে ব্যৈক্তিক সম্পত্তি তাহার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যৈক্তিক সম্পত্তির বলে শাসক অপরাপর শ্রেণীকে শ্রমের সুবিধা দিয়া তাহাদের জীবিকার পথ করিয়া দেয়; ইহাতে শাসিত শ্রেণী শাসকবর্গের মনোমত হইয়া গঠিত হইয়া উঠিতে পারে। শ্রেণীসমাজে ধনীশ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও ইহাদের সকলের শ্রেণীস্বার্থ এক: ইহারা প্রত্যেকেই সাংঘিক সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে ব্যৈক্তিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত কারতে চায়;—এইজন্য তাহাদের আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতা ব্যৈক্তিক স্বার্থের পক্ষে কখনও তেমন মারাত্মক হয় না; প্রয়োজন হইলে ইহারা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য সকলে একত্র হইয়াই শত্রুর বিরোধিতা করে;—প্রাচীন পিতৃসত্তা যুগেও ধনীশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য এইরূপ মিলন যথেষ্টই হইয়াছিল।

সমাজে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হওয়ায় নূতন শাসকবর্গের আরও একটি সুবিধা হইল। জনযুগে জনেব চালনা করিয়াও মানুষকে শারীরিক শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে হইত। ইহাতে শিল্পকলা বা এইরূপ অন্যান্য উদ্যোগে ব্যয়ের মত উদ্বৃত্ত সময় তাহাদের হাতে থাকিত না। কিন্তু নূতন যুগে ইরাণের দেবক * বা বুদ্ধের কথিত রাজার † মত পিতরদের

* ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; † ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জীবিকার চিন্তা সমাজের উপর ন্যস্ত হয়। সমাজ তখন দরিদ্র শ্রমজীবী এবং যুদ্ধবন্দী দাসদের সাহায্যে ইঁহাদের জীবিকা যোগাইতে থাকে। ইহাতে শাসনের সামান্য সময় বাদ দিয়া পিতর ও মহাপিতরেরা বাকী সময় 'সঙ্গীত-সাহিত্য-কলায়' নিয়োগ করিতে পারিতেন। পূর্ববর্তী সমাজে মানুষের জীবিকার নূতন উপায় আবিষ্কার করিতে বহু যুগ কাটিয়া যাইত—আহার সংগ্রহের পর অন্য চিন্তা করিবার মত সময় বা শক্তি তাহাদের বড় বেশি থাকিত না। প্রথম দিকে ধাতু বা হাতিয়ার-পত্রের আবিষ্কার উদ্ভাবনও এইজন্য অনেকটা আকস্মিক—ইহাদের অধিকাংশই মানুষের কোন সুবিন্যস্ত চিন্তার ফল নহে। কিন্তু নূতন যুগে পিতরেরা জীবিকা অর্জনের দায় হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের সময় এবং শক্তি নূতন উদ্ভাবনে নিয়োগ করিতে পারিলেন। ইহার ফলে সমাজে বহু নূতন উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার সম্ভব হইল, এবং তাহাতে সমাজে প্রগতির বেগও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়া গেল। এইভাবে সমাজে শ্রমমুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা যত বাড়িয়াছে, নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবনের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই বলিয়া উৎপাদন-শ্রমের দায়মুক্ত সমস্ত ব্যক্তিই নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবনের সহায়ক হইয়াছিল তাহা নহে; বরং ইহাদের অধিকাংশই অন্যের শ্রমসৃষ্ট জীবিকা ভোগ করিয়া একান্ত নিশ্চলভাবে দিন কাটাইতেছিল।

৮। ধর্ম

ধর্মবিষয়ে মানুষের দৃষ্টি সর্বপ্রথম রুধির ও যৌনসম্বন্ধের দিকে আকৃষ্ট হয়। রক্তপাতের ফলে মৃত ও হতচেতন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহারা রুধিরকে জীবন মনে করিত; এবং যৌনসম্বন্ধের দ্বারা নূতন জীবের উদ্ভব লক্ষ্য করিয়া ইহাকে অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখিত. দৈবীশক্তির নিকট হইতে শুভলাভ ও ভয়শান্তির আশায় রুধিরদান সর্বপ্রথম ধার্মিক

কৃত্যে পরিণত হয়। আদিন যুগে মুমূর্ষুর দেহে রক্ত সঞ্চারিত করিয়া তাহার চৈতন্য আনয়নের চেষ্টাও মানুষ করিয়াছিল। কিন্তু এক শরীরের রক্ত অপর শরীরে দান করিতে হইলে যে বৈজ্ঞানিক বিদ্যাবুদ্ধির দরকার তাহা তাহাদের কিছুই ছিল না—এমন কি উনবিংশ শতকেও ইহার নিয়মপ্রণালী খুব কমই আবিষ্কৃত হয়; পরে বিংশ শতকের প্রথম পাদে গত মহাযুদ্ধের সময় এই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু তবুও মনে হয়, হয়ত কোন আকস্মিক সংযোগবশে আদিম মানুষ মূর্চ্ছিতের দেহে রক্ত সঞ্চাবিত করিয়া তাহাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিল; এবং এই সার্থকতার জন্যই হয়ত রক্তকে তাহাবা চিরকাল এত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে,—এবং ইহাকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদজ্ঞানে দেবতার উদ্দেশ্যে তাহারা অর্ঘ্যও দিয়াছে। আদিম যুগে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্ট হইবার পর রক্তদানের মাহাত্ম্য আরও অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। যৌনসম্বন্ধের চমৎকারিত্বের জন্য শরীরের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের জননাঙ্গ তখন সর্বাপেক্ষা রহস্যময়ী শক্তি * বলিয়া বিবেচিত হইত;—এইজন্য দৈবীশক্তির সন্তুষ্টির জন্য জননাঙ্গের রুধির দানই তাহাদের নিকট বেশি উপযোগী বলিয়া মনে হয়। বর্তমান সমাজেও এই প্রথা একেবারে লুপ্ত হয় নাই—বহু জাতি এই আচারকে † এখনও পবিত্র ধার্মিক কৃত্যের অঙ্গ হিসাবে দেখিয়া থাকে। রুধিরদান আদিম সমাজে ধর্মের অঙ্গ হইয়া উঠিলে, ক্রমে পশুবলি এবং নরবলির প্রথাও সমাজে প্রচলিত হইয়া যায়; এবং রুধিরের এইরূপ মাহাত্ম্যের জন্য ইহার বর্ণ, অর্থাৎ লাল রঙও, শেষে দৈবীশক্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। আদিম জাতির শবের সঙ্গে গৈরিক বা রক্তবর্ণের যে সব মৃত্তিকা পাওয়া যাইতেছে—

* রহস্যময়ী শক্তির আধার; † Circumcision.

ইহার মূল কারণও তাহাই ; এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে রক্তিম বেশভূষা বা গুঞ্জামালার যে প্রচলন দেখা যায়—ইহারও এই একই কারণ। * এইভাবে রুধির ও রুধিরের প্রতীক রক্তবর্ণ—উভয়ই ধর্মের আরম্ভিক বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, জননক্রিয়াকে দিব্যশক্তিমত্তার পরিচয় মনে করিয়া আদিম মানুষের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। ইহার ফলে রক্তবর্ণের মত জননক্রিয়ার প্রতীক যৌন চিহ্নাদিও ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা ভগ ও লিঙ্গ পূজাকে আপন ধর্মের অঙ্গ মনে করিত ; হড়প্পা এবং মোহেন জো-ডরোর খননে স্ত্রীপুরুষের জননাঙ্গের অনেক প্রস্তরপ্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। লিঙ্গকে দেবতা জ্ঞান করিবার জন্য বৈদিক আর্যেরা ইহাদিগকে শিশ্নদেব † বলিয়া উপহাস করিত। দক্ষিণ ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে লিঙ্গমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার আকৃতি ঠিক পুরুষলিঙ্গের অনুরূপ। আকৃতির দিক দিয়া কড়ি ও যোনির মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে—এইজন্য কড়ি ক্রমে স্ত্রীঅঙ্গের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়। আদিম জতির মধ্যে শিশুকে ভূতপ্রেতের কুদৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহার শরীরে কড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হইত ; শুধু আদিম জাতিই কেন, ভারতবর্ষের বহু সুসভ্য হিন্দুপরিবারে কড়ি বাঁধিবার রীতি এখন পর্যন্ত টি ঁকিয়া আছে। কোনরূপ আঘাত পাইলে কিংবা ফোড়া হইলে—কালো ঘুন্‌সিতে বাঁধিয়া কড়ি ধারণ করা এখন প্রায় চিকিৎসার অঙ্গস্বরূপ। এইরূপ, পুংঅঙ্গের প্রতীক

---

* অর্থাৎ এখানে রক্তবর্ণের দৈবীশক্তির ধারণায় এই সব আচার গৃহীত হইয়াছিল ;

† শিশ্ন বা লিঙ্গ যাহার দেবতা ; বৈদিক সাহিত্যে ইহাদিগকে অসুর বলা হইয়াছে।

শিবলিঙ্গকে বহু বড় বড় দার্শনিকও ভক্তিগদ্গদ ভাবে পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে পুরাণপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিত যেমন আছেন, আধুনিকপন্থী বিদ্যাধুরন্ধররাও তেমন সংখ্যায় খুব নগণ্য হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদের পূজ্য প্রতিমাটির প্রকৃত রূপ কি?—ইহা নিবদ্ধলিঙ্গ যোনির মৃৎ বা প্রস্তরমূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়! বর্তমান যুগের শিক্ষিত হিন্দুর অবস্থাও যদি এই হয়, তবে ধর্মের ক. খ. পড়ুয়া বর্বর মানুষের দোষ কোথায়?

আদিম সমাজে জননাঙ্গ ও রুধিরের সঙ্গে ভূত, প্রেত এবং মৃতাত্মার ভয়ও ধর্মের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে। তখন মানুষ চাঁদ, সূর্য এবং এইরূপ অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তিকেও দেবতাত্মা বলিয়া মনে করিত। ইহাতে তাহাদের আদিম ভয় ও বিস্ময় একেবারে সর্বময় হইয়া পড়ে; ফলে ভয়শান্তি, দেবতার তুষ্টিবিধান—এই সমস্তই সামাজিক কর্তব্য দাঁড়াইয়া যায়। পিতৃসত্তার যুগে পিতর বা মহাপিতর গোষ্ঠীর শাসনকার্যের সঙ্গে এই ধর্মকৃত্যেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহাতে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির অর্জন ও রক্ষণ ব্যাপারেও তাঁহাদের অনেক রকমের সুবিধা হয়। পিতরেরা এইভাবে সমাজের ধর্ম-পুরোহিত হইয়া দেবতা ও মানুষের মধ্যে মধ্যগ হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। দেবতা তখন আহ্বান মাত্রই পিতরের মস্তিষ্কে আসিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বলিয়া দিয়া যাইতেন। ইহাতে পিতর মনুষ্যলোকের দেব-সন্দেশ-বাহক হন, এবং তাঁহার পদবী, প্রভুত্ব, ব্যৈক্তিক সম্পত্তি সমস্তই প্রশ্নাতীত হইয়া পড়ে;—আর মরণধর্মী মানুষ দেবদত্ত সম্পত্তি কিংবা দেবতাত্মা পিতরের বিরোধিতা করিবেই বা কোন শক্তিতে? তাই দেখিতেছি, বর্গশাসনের মূলে উন্নত উৎপাদনরীতির প্রেরণা ছাড়া ধর্মের সহায়তাও খুব কম ছিল না। এই ধার্মিক প্রভাবের বলে গোষ্ঠীপতি পিতর দেবপ্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হয়, এবং পরবর্তী যুগে রাজা বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্তিত

হইতে থাকে। ইহার পর শতাব্দ সহস্রাব্দ ব্যাপিয়া দেববাদ ও ধর্মবাদ সমাজের উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে—আজ সমাজে বৈয়ক্তিক সম্পত্তিকে উচিত মনে করিবার অবস্থা সৃষ্ট হইয়া থাকিলে আশ্চর্যের কিছু নাই।

পণ্ডিতেরা * মনে করেন, কৃষিকর্ম আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হরিৎবর্ণের প্রতিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কারণ হরিৎ শস্যের বর্ণ, ইহাকে আশ্রয় করিয়া অঙ্কুরের জীবন-বিকাশ হয়—এই সত্যই আদিমমানবের চোখে হরিৎকে জীবনের রূপক হিসাবে গ্রহণ করার প্রেরণা দেয়। হরিৎবর্ণের সঙ্গে জীবন-সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইবার পর ইহাও ধর্মের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ে; এইভাবে ধর্মকৃত্যাদিতে জীবনের প্রতীক রূপে হরিৎবর্ণের চূর্ণ ও অবলেপের ব্যবহার আরম্ভ হয়; তখন তুঁতিয়া, তৈল ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে ইহার নির্মাণ চলিতে থাকে। অবশ্য ক্রমে ধর্মের সম্পর্ক ছাড়া নিছক সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যও ইহার প্রচলন হয়। মিশরের প্রাচীনতম মমিগুলিকে দেখিলে দেখা দেখা যায় যে ইহাদের রঙও হরিৎ—মিশরীরা বহু পূর্বকাল হইতেই বর্ণক নির্মাণের চেষ্টা করিতেছিল—তাই তুঁতিয়া গরম করিয়া মমির জন্য গাঢ় রঙ আবিষ্কার করা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হয় নাই। মিশরীয়দের ধারণা ছিল মমিকে হরিৎ রঙে রাঙাইলে মৃতের অমরত্ব লাভ হয়—এই ধর্মকৃত্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণকের উপযোগিতা পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহারা তামা আবিষ্কার করে। তামার আবিষ্কারকে এইজন্যই আদিম যুগে ঠিক সাধারণ আবিষ্কারের পর্যায়ে ফেলা হইত না। তামা আবিষ্কারের পর ইহাকে তাতাইলে-পিটিলে তাহা যে তীক্ষ্ণ হয় ইহাও মিশরীরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিল—কারণ, বর্ণক নির্মাণের ফলে

* কোন কোন পণ্ডিত।

গুঁতিয়াকে গরম করিয়া ইহাকে চূর্ণ করা এবং এইরূপ অন্যান্য প্রক্রিয়ায় ফল তাহারা বুঝিত।

হরিৎ ও রক্তবর্ণের মত পীতবর্ণও একদিন মানুষের নিকট জীবনপ্রদ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল—ইহার কারণ প্রভাতসূর্যের বর্ণের সঙ্গে পীতবর্ণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মিশরে স্থায়ী বাস স্থাপনার বহু পূর্বেই চন্দ্রমা আদিম মানুষের শিকার ও নির্ভয়তার দেবতা হয়। স্ত্রীলোকের রজোধর্মের সঙ্গে চান্দ্রমাসের ঐক্য দেখিয়াও তাহারা খুব বিস্মিত হইয়াছিল—এইজন্য চন্দ্র শুধু আর শিকার বা নির্ভয়তার দেবতাই রহিল না, ক্রমে রজপ্রবর্তক এবং জীবজন্মের সহায়ক দেবতা বলিয়াও গণ্য হইল। নীল উপত্যকায় আসিয়া মানুষ নীলের বাঢ় ও ষড়ঋতুর সঙ্গে লুব্ধক এবং সূর্যের সম্বন্ধ আবিষ্কার করে—ইহাতে পুরাতন চন্দ্রমার সঙ্গে আবার সূর্য এবং লুব্ধকও জীবনদাতা দেবতা রূপে গণ্য হয়। সময় অতীত হইবার সঙ্গে পিতর, সামন্ত এবং রাজারা মৃত্যুর পর তারকালোকে স্থান পাইতে থাকে। * ভারতবর্ষেও এইরূপ সপ্তর্ষির প্রতিকল্প বলিয়া একটি তারকামণ্ডলকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে এই শ্রদ্ধা ও কল্পনা ফলিত জ্যোতিষের ভিত্তি স্থাপনা করে—এবং ক্রমে দৈবজ্ঞতার মোহ ব্যক্তি ও সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

ধর্মবিষয়ক অন্যান্য ধারণার মত গাভীকে পবিত্র জ্ঞান করিবার প্রথাও সর্বপ্রথম মিশরেই সৃষ্ট হয়। তাই বলিয়া প্রাচীন মিশরবাসীরা যে গাভীকে অবধ্য মনে করিত ইহা ভাবিবার কোন হেতু নাই। ভারতীয় আর্যদের যজ্ঞীয় পশুর মত মিশরেও গাভীকে দেবতার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলি বিবেচনা করা হইত। গো-দুগ্ধের জীবনরক্ষণ শক্তিতে বিস্মিত হইয়া

---

* পিতর, সামন্ত ও রাজাদের অমরত্ব লাভের কল্পনা।

মানুষ এক সময় গাভীকে দিব্য ও পবিত্র বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে। মিশরীয়রা গাভীকে চন্দ্রমার সঙ্গে, আকাশকে গাভীর সঙ্গে, এবং মাতা-দেবী বা দিব্য মাতাকে আকাশের সঙ্গে জুড়িয়া চরাচরব্যাপী এক দেবপরম্পরা সৃষ্টি করে। গাভীর স্তনের নীচে দুগ্ধ পানরত মানুষকে দেখিয়া মিশরীয়দের মনে এক কল্পনার উদ্রেক হইয়াছিল—দুগ্ধ দানের সময় মানুষের উপর গাভীর আনত শরীরকে তাহারা আকাশীয় গোলার্ধের মত মনে করে; এবং এইরূপে গোমাতা, আকাশমাতা এবং দেবীমাতায় এক পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

সভ্য মানব সমাজ (১)

সভ্য মানব সমাজ বলিতে আমরা নিশ্চয়ই কোন স্বার্থত্যাগপরায়ণ উচ্চ মানব সমাজের কথা বুঝিব না; কারণ পিতৃসত্তা কি ভাবে স্বার্থান্ধতাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার পর হইতে সমাজের সামুহিক স্বার্থ চিরদিনই অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে; এবং তাহার স্থলে ব্যক্তিস্বার্থ বা বৈ্যক্তিক সম্পত্তি মানুষের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিস্বার্থপূর্ণ সভ্যতাকে আমরা তিনটি পৃথক অবস্থায় ভাগ কবিতে পারি:' (১) দাসতা যুগ, (২) সামন্তবাদী যুগ, এবং বর্তমান (৩) পুঁজিবাদী যুগ। সভ্যতার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এঙ্গেলস্ লিখিয়াছেন, "সমাজবিকাশের একটি বিশেষ অবস্থার নাম হইতেছে সভ্যতা;—ইহাতে শ্রমবিভাগ, শ্রমজাত বস্তুর বিনিময়, এবং বিনিময় ও শ্রমবিভাগের সহিত সম্পর্কিত পণ্যোৎপাদন—পূর্ণতা লাভ করে; ইহার ফলে পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থায় এই সময় এক বিপ্লবকরী পরিবর্তন উপস্থিত হয়।"

পণ্যউৎপাদনের যে অবস্থায় আসিয়া সভ্যতার বিকাশ আরম্ভ হয়, তাহার সম্বন্ধে এঙ্গেলস্ বলিতেছেন: "আর্থিক দিক হইতে ইহার বিশেষত্ব হইতেছে, (১) ধাতুধনের সঙ্গে মুদ্রা, পুঁজি ও সুদের ব্যবসায়ের আরম্ভ, (২) উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে এক নূতন মধ্যগ বর্গ বা বানিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, (৩) ভূমির উপর ব্যক্তির স্বামিত্ব, ইহাতে তাহার রেহান-বিক্রয়ের অধিকার, এবং (৪) উৎপাদনক্রিয়ায় দাসদিগের শ্রমের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিয়োগ।" সভ্য সমাজের পরিবার, রাজনীতিক বিশেষত্ব এবং বৈ্যক্তিক সম্পত্তি সম্বন্ধে এঙ্গেল্সের বক্তব্য হইতেছে:

"সভ্যতাযুগে পরিবারের যে গতি দেখা যায় তাহাতে একবিবাহ, স্ত্রীর উপর পুরুষের শাসন এবং পূর্বের সামুহিক সম্পত্তি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টন—ইহার অন্যতম বিশেষত্ব। সভ্যতা যুগের সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপনার সূত্র হইল রাজ্য; এবং এই রাজ্য সকল সময় এবং সকল অবস্থায়ই ধনিক শ্রেণীর রাজ্য—পীড়িত ও শোষিতদিগকে আয়ত্তে রাখার জন্য ইহা একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সভ্যতার অপর দুইটি বিশেষত্ব হইল—সামাজিক শ্রমবিভাগের আধারের উপর নগর ও গ্রামের বিরোধ স্থাপন করা, এবং সকল সম্পত্তিকে হস্তান্তরিত হইবার অর্থাৎ অপরের অধিকারে যাইবার ব্যবস্থা করা। ইহাতে, এমন কি, সম্পত্তির মূল মালিকের মৃত্যুর পরও তাহার প্রদত্ত অধিকার নষ্ট হয় না,—কিন্তু জনসংস্থার উপর এই অধিকারের ফলে খুব প্রচণ্ড ও প্রত্যক্ষ ভাবেই আঘাত আসে। এথেন্সে * সোলোনের সময় † পর্যন্তও এই প্রকার কোন অধিকার বর্তমান ছিল না; ইহার প্রথম প্রবর্তন হইয়াছিল রোমে এবং জর্মণীতে ভক্তজর্মণরা যাহাতে বিনা বাধায় তাহার সম্পত্তি মঠে দান করিয়া দিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে পুরোহিতেরা ‡ তাহার প্রবর্তন করিয়াছিল।"

হিন্দীয়ুরোপীয় জাতি—য়ুনানী, ইরাণী, এবং ভারতীয় প্রভৃতি হিন্দীয়ুরোপীয় জাতি বহু পূর্বেই § সংসারে সভ্যতার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল; এবং বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গঠনের কৃতিত্বও প্রায় সম্পূর্ণভাবে য়ুরোপীয় জাতিরই ¶ প্রাপ্য। কিন্তু তাহা হইলেও মিশর, মেসোপোতামিয়া বা সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের তুলনায় ইহাদের

---

* য়ুনান; † ৫৯০ খ্রীঃ পূঃ; ‡ খ্রীষ্টীয় যাজকদল; § ষষ্ঠ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে; ¶ ইহারা হিন্দীয়ুরোপীয় জাতিরই প্রশাখা।

সভ্যতা বহুদিনের অর্বাচীন। মিশরীয়েরা * পিতৃসত্তা-দাসতা যুগ অতিক্রম করিয়া সামন্তবাদে পৌছিবার সময় হিন্দীয়ুরোপীয় জাতি উরাল ও বাল্টিকের মধ্যে বাস করিত। তাহাদের সমাজে আদিম বন্য বা জন সমাজের প্রাথমিক বর্বর অবস্থা তখনও ভালরূপ অতীত হয় নাই—এমন কি পশুপালন প্রভৃতিতেও তাহাদের দক্ষতা তখন পর্যন্ত খুব সামান্যই ছিল। ভাষাতত্ত্ব হইতে জানা যায়, য়ুনানী ও ভারতীয় আর্য তাহাদের দেবতার জন্য পিতর বিশেষণ ব্যবহার করিত; এবং কখনও কখনও দেবজাতি বা কোন বিশেষ দেবতার নাম † হিসাবেও ইহার প্রয়োগ হইত। ইহাতে মনে হয় এই দুই জাতি অর্থাৎ সমগ্র শতম্ ‡ ও কেন্টম্ § পরিবার তখন পিতৃসত্তা যুগে পৌছিয়া গিয়াছিল। গাভীর জন্য ইহাদের মধ্যে তখন প্রচলিত সাধারণ শব্দ ছিল—গৌ, কৌ, এবং স্থলভেদে গব্, গাব্ ইত্যাদি। গাভীবাচক এই সব শব্দের অস্তিত্ব থাকায় হিন্দীয়ুরোপীয় সমাজ যে তখন গাভীর সহিত পরিচিত ছিল ইহাও প্রমাণ হয়। রুস ও সংস্কৃত, এই উভয় ভাষায়ই ভেড়া বুঝাইবার জন্য একমূল শব্দ পাওয়া যাইতেছে—সংস্কৃতে ভেড়ার নাম হইল 'অবি', আর রুসীতে তাহা 'ইবিস্'; এইরূপ কুকুরের অর্থবোধক শব্দ সংস্কৃত হইল 'শ্বক', এবং রুসীতে তাহা 'সোবক'। ইহাতে মনে হয়, অন্যেরা না হইলেও অন্তত হিন্দীস্লাভ অর্থাৎ সমগ্র শতম্ পরিবার তখন পশুপালনে সমর্থ হইয়াছে। এই অবস্থায় পৌছিবার পর হিন্দী, ইরাণী ও স্লাভ-লিথুয়ন শাখায় শতম্‌গোষ্ঠীর বিভাজন হয়,—তাহাতে শাখা গোষ্ঠীগুলিকে পশুপালন বিদ্যা আর নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে হয় না। কিন্তু কৃষি বা শস্য সম্পর্কিত কোন সাধারণ শব্দ শতম্ বা কেন্টম্ কোন পরিবারেই

* মেসোপোতামিয়ন এবং সিন্ধুবাসীরাও; † জুপিতর, দ্যৌস্পিতর; ‡ হিন্দু, ইরাণী, স্লাভ; § য়ুনানী, লাতিনী, জর্মনিক।

পাওয়া যাইতেছে না—তাহাতে প্রমাণ হয় যে ইহারা এক পরিবারগত থাকার সময়ে কৃষি অবস্থায় পৌছিতে পারে নাই। নীল উপত্যকা, মেসোপোতামিয়া এবং সূসা প্রদেশের অধিবাসী খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পুর্বেই কৃষিস্তরে পৌছিয়াছিল। সংস্কৃত ও ইরাণী ভাষায় কৃষিসম্বন্ধী শব্দ * খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আসিয়া পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে হিন্দীয়ুরোপীয় জাতি যে সেমেতিক † ও হেমেতিক ‡ জাতির বহুপরে § শিকার ও পশুপালন স্তর অতিক্রম করিয়াছিল—তাহা প্রমাণ হয়।

পরে মেসোপোতামিয়া ও য়ুনানে সম্প্রসারণের সময় হিন্দীয়ুরোপীয় জাতির অশ্ব তাহার পক্ষে পরম সহায়ক হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায়, সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূবে তাহারা অশ্বমাংসের স্বাদিষ্ট ভোজনের সঙ্গে অশ্বকে সোওয়ার পিঠে লইয়া দৌড়াইতেও শিখাইয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন, চেঙ্গিসের দ্বিগ্বিজয়ে ঘোড়া ও বারুদ যেমন কাগকরী, এমন কি অপরাজেয় হইয়াছিল, হিন্দীয়ুরোপীয়ের অশ্বও সভ্য জাতির উপর তাহাদের বিজয় লাভের তেমনই সহায়ক হইয়াছে। শতম্ কেণ্টম্ সংযুক্ত কালে সমস্ত হিন্দীয়ুরোপীয় জাতি ¶ এক ভূপ্রদেশে জনযুগের অন্তিম এবং পশুপালন বা পিতৃসত্তা যুগের প্রারম্ভিক অবস্থায় বাস করিত। তাহাদের ভাষায় অশ্ব বুঝাইবার জন্য কোন প্রাচীন একমূল শব্দ পাওয়া যাইতেছে না; ইহাতে শতম্-কেণ্টম্ সংযুক্ত কালে তাহারা যে অশ্বপালনে সমর্থ হয় নাই ইহাই বুঝা যায়। ইরাণী ভাষায় ঘোটকের জন্য 'অস্প' এবং সংস্কৃতে 'অশ্ব'—এই দুই শব্দের অস্তিত্বে হিন্দীইরাণীরা এক পরিবারগত থাকার সময় তাহারা অশ্বপালন আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। তবে তখনও যে

* যব, গোধূম ; † মেসোপোতামিয়া, সূসা ; ‡ মিশরী ; § সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন জাতিরও পরে ; ¶ বর্তমান হিন্দী, ইরাণী এবং য়ুরোপীয় জাতিসমূহের পূর্বজ।

ঘোড়ার মাংস বা তাহার দুধ খাওয়া ছাড়া ইহার আর অন্য উপযোগিতা আবিষ্কৃত হয় নাই তাহা নয়—কারণ মূলগত ভাবে দেখিতে গেলে 'আশু' শব্দের সহিত অশ্বের সম্পর্ক সহজেই ধরা পড়ে, এবং ইহাও সত্যই যে 'আশু চলৎশক্তি সম্পন্ন' * পশুর নামই তখন 'অশ্ব' হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ হইতে হিন্দীয়ুরোপীয় জাতির সভ্যতাকে আমরা দেশকাল ও অবস্থাভেদে নিম্নোক্তরূপ বিভক্ত করিতে পারি :—

পরিবার	দেশ	কাল	অবস্থা	ব্যবস্থা
শতম্-কেণ্টম্ †	দক্ষিণী রুস	৩০০০ খ্রীঃপূঃ (?)	জন, পিতৃসত্তা	শিকার
হিন্দীস্লাভ	বোল্‌গা-পামীর	২৫০০ খ্রীঃপূঃ (?)	জন, পিতৃসত্তা	পশুপালন
হিন্দীইরাণী	পামীর ‡	২২০০ খ্রীঃপূঃ (?)	পিতৃসত্তা	কৃষি
হিন্দীআয	অফগানিস্তান	২০০০ খ্রীঃপূঃ	পিতৃসত্তা	কৃষি
হিন্দীআয	সপ্তসিন্ধু ¶	১৮০০ খ্রীঃপূঃ	পিতৃসত্তা, দাসতা	কৃষি, বাণিজ্য
হিন্দীআয	গঙ্গা উপত্যকা	১৫০০ খ্রীঃপূঃ	দাসতা, সামন্তবাদ	গোরক্ষা, বাণিজ্য

হিন্দীয়ুরোপীয় জাতির বিকাশ ধারা হইতে দেখা যায় যে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করার পূর্ব পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে দাসতার উদ্ভব হয় নাই। হিন্দীয়ুরোপীয় পরিবারের তিনটি জাতি অর্থাৎ হিন্দী আর্য, § ইরাণী আর্য এবং য়ূনানীদের পক্ষে অন্য জাতিকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের জন্মভূমি দখল করিয়া লইবার সুযোগ হইয়াছিল। হিন্দী আর্যেরা খ্রীষ্ট পূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর

---

* দৌড়ের উপযোগী—তাই সোওয়ার বহনকারী ; † হিন্দীয়ুরোপীয় ; ‡ উত্তর সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ আমু এবং সির নদীর উপরিপ্রদেশ ; রুসীতে এই স্থানকে এখনও সেমী-রামিস্ বা সাতনদী বলা হয়। হিন্দুদের উত্তর কুরু এবং ইরাণীদের আর্যানা বৈজ এই দেশই ; হিন্দী ও ইরাণীরা এখানে এক পরিবারগত হইয়া বাস করিত ; ¶ পঞ্জাব ; § ভারতীয় আর্য।

সমসাময়িক কালে অফগানিস্তান হইতে সিন্ধু উপত্যকায় উপনীত হইলে সেখানকার সভ্যজাতির সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধে; এই সংঘর্ষে বর্বর আর্যেরাই জয়ী হয় এবং আর্যভিন্ন জাতি হইতে বহু দাস গ্রহণ করিয়া তাহারা তখন দাসতা যুগে প্রবেশ করে। ইরাণী আর্যেরা মিডিয়া দেশে * পৌঁছিবার পর মেসোপোতামিয়ায় সভ্য জাতির সঙ্গে † তাহাদিগকেও এইভাবে যুদ্ধ করিতে হয়; ৬০৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে হুঅক্ষত্র ‡ কর্তৃক অসুরদের রাজধানী নিনেবে অধিকৃত হইলে এই যুদ্ধের অন্তিম পরিসমাপ্তি ঘটে। ইরাণী আর্যেরা অবশ্য সেই সময়ের মধ্যে দাসতা যুগ অতিক্রম করিয়া সামন্তবাদী যুগে পৌঁছিয়া গিয়াছে। পশ্চিম ইরাণে মিতন্নী আর্যদিগকে ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মেসোপোতামিয়ার সভ্য জাতির সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ করিতে হয়—বোগজকুইতে প্রাপ্ত একটি শিলালেখ হইতে ইহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে। এই শিলালেখে বৈদিক আর্যদের কয়েকটি দেবতার নাম দেখিয়া অনেক প্রত্নবিদ্ মিতন্নীদিগকে ভারতীয় আর্যের শাখা বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু পিতৃসত্তা যুগে ইরাণীয় আর্যভূমি অতিক্রম করিয়া কোন ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর পক্ষে সেখানে যাইয়া বসতি স্থাপন করা সহজসাধ্য নয়। জর্থুস্ত্রের ধর্মসংস্কারের পর কোন কোন বৈদিক দেবতা অবশ্য ইরাণীয়দের চোখে ঘৃণিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল;—কিন্তু জর্থুস্ত্রের পূর্বে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। ইরাণীদের প্রথম রাজা দৈঅক্কু বা দেবকের § নাম হইতে ইরাণী ও ভারতীয় আর্যদের মধ্যে 'দেব' শব্দ একার্থবাচক ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। এইজন্য ইহাই সম্ভব যে মিতন্নীরা জর্থুস্ত্রের ধর্মসংস্কারের বহু পূর্বে ইরাণী আর্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাহাই হউক, মেসোপোতা-

* মদ্র, বর্তমান হমদানের নিকটস্থ দেশ; † অসুর জাতি; ‡ মৃত্যু ৫৮৫ খ্রীঃপূঃ; § মৃত্যু ৬৫৫ খ্রীঃ পূঃ।

মিয়ার অসুর ও অন্যান্য আর্যভিন্ন জাতির সহিত সংঘর্ষের পর ইরাণী আর্যও দাসতা যুগে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ য়ুনানেও হিন্দী-য়ুরোপীয় জাতির পূর্বে মিশরীয় সভ্যতার প্রতিনিধি ক্রেত * সভ্যতার সহিত সম্পর্কিত কোন ভূমধ্যদেশীয় জাতি বাস করিত। কিন্তু হিন্দী-য়ুরোপীয় ঘোড়াওয়ালারা সেখানে পৌছিবার পর তাহাদের সভ্যতাও সিন্ধু-উপত্যকা ও মেসোপোতামীয় সভ্যতার মত চূর্ণ হইয়া যায়; অন্যান্য দেশের মত য়ুনানেও হিন্দীয়ুরোপীয় আর্যেরা একই ভাবে বিজয় লাভ করিয়া পশুপালন হইতে দাসতা স্তরে উপনীত হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যে হিন্দীয়ুরোপীয়দের দাসতাযুগে প্রবেশের সময় ১০০০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত—এবং ইহা শুধু দাসতাই নয় তাহাদের সভ্যতা যুগে প্রবেশ করিবারও সময়।

সভ্যতার গুণদোষ বিচার করিতে গিয়া এঙ্গেলস্ লিখিয়াছেন: "ইহা এমন একটি সামাজিক আধারের উপর সংগঠিত যে তাহার সহায়তায় জনসমাজের পক্ষে অনেক অসম্ভব কাজও সভ্যতার পক্ষে করা সম্ভবপর হয়, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া সভ্যতাকে মানুষের সমস্ত উচ্চবৃত্তির সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করিয়া তাহার সর্বাপেক্ষা নীচ আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিগুলির সাহায্য নিতে হয়। সভ্যতার প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত বিচার করিলে দেখিব লোভ চিরদিনই তাহার সহচর—ধন, আরও ধন, আরও অধিক ধন—তাহাও সামাজিক বা সামূহিক ধন নহে,—নীচ, মহানীচ বৈ্যক্তিক ধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই নীচ লক্ষ্য পূর্ণ করিতে গিয়া সভ্যতার ঝুলিতে সময় সময় বিজ্ঞান, কিংবা কলার উচ্চবিকাশের ফল যদি আসিয়া পড়িয়া থাকে—তবে তাহাও শুধু এই জন্য যে, ইহা ছাড়া বর্তমানে ধনের উপর তাহার যে অধিকার আছে, সেই অধিকার লাভ সম্ভব হইত না।"

* Crete.

সভ্যতার রূপকে আরও নগ্ন করিতে গিয়া এঙ্গেলস্ লিখিতেছেন: "প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার আধার হইল এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর অর্থাৎ অনধিকারী শ্রেণীর শোষণ—এইজন্য দেখি ইহার সমগ্র বিকাশই একটি স্থায়ী বিরোধের ভিতরে অহরহ ঘুরিয়া ফিরিতেছে; এখানে উৎপাদনে এক পাদ উন্নতি হইলেই তাহা সঙ্গে সঙ্গে শোষিত বা সংখ্যাগুরু দলকে এক পা পিছে টানিয়া আনে; কারণ, স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে যাহা এখানে লাভ, সাধারণ জনতার পক্ষে তাহাই অনিবার্য ক্ষতির কারণ। সভ্য সমাজে এক শ্রেণী সমাজের সমস্ত নূতন স্বতন্ত্রতার অধিকারী হইয়া বসে—কিন্তু অন্য শ্রেণীর জন্য শোষণ ও উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছুরই ব্যবস্থা হয় না। যন্ত্রের উপযোগ বা তাহার ব্যবহারকে আমরা ইহার সর্বাপেক্ষা জ্বলন্ত উদাহরণ হিসাবে লইতে পারি—হস্তশিল্পী ও মিল-মালিকের উপর যন্ত্রের প্রভাব যে কি রূপে পতিত হইয়াছে তাহা আজ পৃথিবীতে কাহারও অবিদিত নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বর্বর সমাজে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে কোন ভেদ সৃষ্টি করা খুবই কষ্টকর হইত; কিন্তু সভ্যতা ইহাদের মধ্যে তুলনাত্মক পার্থক্য বা ভেদকে এতই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে মূর্খও তাহা বুঝিতে পারে। সভ্যতা এক শ্রেণীকে নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সমস্ত অধিকার দিয়া দেয়; এবং ইহার বিরোধী শ্রেণীর মাথার উপর শুধু কর্তব্যের বোঝাই চাপাইয়া রাখে।...সভ্যতা যত অগ্রসর হয় তাহার সৃষ্ট দুরবস্থাকে সে ততই দানপুণ্যের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে; এইভাবে অবস্থা সহনীয় করিবার প্রচেষ্টা ছাড়া অনেকক্ষেত্রে দুঃখদৈন্যের অস্তিত্বকেও সে অস্বীকার করিয়া বসে।

সংক্ষেপে বলা যায়, সভ্যতা এমন এক খাসা অবস্থার সৃষ্টি করে যাহা পূর্বেকার সমাজে ত দূরের কথা, সভ্যতার আরম্ভিক কালেও

ইহার কোন অস্তিত্ব দেখা যাইত না।...আর শেষ অবধি তাহার ধৃষ্টতা এতদূর পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছায় যে তখন শোষণ ব্যাপারকেও সে শুধু শোষিত শ্রেণীরই স্বার্থ বলিয়া প্রচার করে;—আর শোষিতেরা এই কথা না বুঝিলে কিংবা তাহার বিরোধিতা করিলে—তাহা তাহাদের হিতকারী শোষকদের প্রতি চরম কৃতঘ্নতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়।"

মানবতত্ত্ববেত্তা মোর্গন * তাঁহার গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে সভ্যতা সম্পর্কে সম্মতি দিতে গিয়া বলিতেছেন: "সভ্যতার আগমনের পরে ধনের এত বৃদ্ধি, ইহার রূপের এত প্রকারভেদ, এবং ইহার উপযোগ এত বিস্তৃত, ও মালিকদের সুবিধার জন্য ইহার এত রকমের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা হয় যে সাধারণের পক্ষে ইহার নিয়ন্ত্রণ আর সম্ভব থাকে না। মানুষের মস্তিষ্ক নিজের এই কৃতি দেখিয়া তখন নিজেই বিস্ময়ে চকিত হইয়া পড়ে; কিন্তু তবু ইহাও সত্য যে, ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসিবে যখন মানুষের বুদ্ধি সম্পত্তির উপর বর্তমান অধিকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবে, রাজ্য এবং রাজ্যের রক্ষায় ন্যস্ত সম্পত্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিবে, এবং সম্পত্তির অধিকারীগণের অধিকারের সীমাও নির্ধারিত করিয়া দিবে।...সমাজের স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থ অপেক্ষা বহুগুণে মূল্যবান; তাই ভবিষ্যতে এই দুই প্রকারের স্বার্থের মধ্যে ন্যায়োচিত এবং একটির সহিত অপরটির অনুকূল সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। সম্পত্তি অর্জন করিয়া যাওয়াই মানুষ জাতির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে... অতীতে সম্পত্তির উন্নতির জন্য যেরূপ বিধান সৃষ্টি হইয়াছিল, এখনও তাহার উন্নতি ও সুরক্ষার জন্য সেইরূপ ভবিষ্যৎবিধান সৃষ্ট

---

* ইঁহার 'প্রাচীন সমাজ' বা *Ancient Society* (১৮৭৭ খ্রীঃ) নামক গ্রন্থের সহায়তায় এঙ্গেলস্ 'পরিবার, ব্যৈক্তিক সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

হইতেছে। সভ্যতার আরম্ভিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যে সময় অতীত হইল, তাহা ভবিষ্যতের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মতন নগণ্য। প্রচলিত সমাজ ও সম্পত্তির ধ্বংস আজকাল একটি সামাজিক শক্তির চরম উদ্দেশ্য হইয়া উঠিতেছে; তবে কথা এই, এই শক্তির ভিতরও তাহার আপন ধ্বংসের বীজ নিহিত হইয়া আছে। রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রজাসত্তা, সমাজে ভ্রাতৃভাব, অধিকার ও লাভের সমানতা, এবং সর্বোপরি অনিবার্য সার্বজনিক শিক্ষা সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নত স্তরেরই সূচনা। মানুষের জ্ঞান, অনুভব ও প্রতিভা তাহাদিগকে এই ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে...ভবিষ্যৎ সমাজে প্রাচীন জনসমাজের স্বতন্ত্রতা, সমানতা ও ভ্রাতৃভাবের এক উন্নততর পুনরুজ্জীবন দেখা যাইবে।"

এখানে স্মরণ রাখা দরকার, মোর্গন শুধুমাত্র উগ্রপন্থী রাজনীতিজ্ঞই ছিলেন; সমাজতন্ত্রবাদের তিনি কোনরূপ ধার ধারিতেন না; পূর্বে তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা আমেরিকার ইণ্ডিয়ন জাতির জন ও অন্যান্য প্রাচীন সামাজিক অবস্থার অধ্যয়নের ফল। ভারতবর্ষে বেরিয়র এলবিন মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি গোণ্ড জাতির সম্পর্কে আসিয়া তাহাদের জীবনরীতি সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। এই এলবিনও সমাজতন্ত্রবাদী নন; এমন কি স্টেট্‌সম্যানের * মতে 'ইঁহার গবেষণার সহিত আদিম জাতিদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের কোন সম্পর্ক নাই।' এলবিন একটি বেতারভাষণে † বলিয়াছিলেন, "এখানকার আদিবাসীরা প্রায় সর্বদাই খুনের অপরাধ স্বীকার করিয়া খুন করিবার কারণ কি তাহা বলিয়া দেয়। তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিবাদের অস্তিত্ব নাই—

* দিল্লী সংস্করণ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ ইং; † স্টেট্‌সম্যান, দিল্লী সংস্করণ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ ইং।

ইহারা সর্বপ্রথম সমাজ, গোষ্ঠী এবং আপন আপন গ্রামের ইষ্ট চিন্তা করে। নিজেদের প্রতিবেশীর সঙ্গে একত্র হইয়া, এক স্থানে ঘরদরজা বানাইয়া ইহারা বসতি করে; প্রত্যেক বাড়ীর জন্য ইহাদের কোন পৃথক পৃথক উঠানের ব্যবস্থা নাই। সাম্প্রদায়িকতা যে কি বস্তু তাহা ইহারা মোটেই জানে না; এমন কি তাহাদের ভাষায় সমাজ বুঝাইতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা মানুষের সঙ্গে অভিন্নার্থক। ইহাদের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও শোকাবহ কথা এই যে, শিক্ষিত জাতির সংস্পর্শে আসিলেই তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিবাদ জাগিয়া উঠে; ইহার ফলে তাহাদের গ্রামিক ব্যবস্থা বদলাইয়া যায়—বহু অংশে বিভক্ত হইয়া সামাজিক ভদ্রাসন তখন ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে ..আর ইহারা নিজে শিক্ষিত হইলে তখন ঘোরতর মোকদ্দমাবাজ এবং সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠে—ইহাতে তাহাদের পুরাতন পারস্পরিক মৈত্রী একেবারে সমূলে নষ্ট হইয়া যায়।"

সভ্যতা মানুষকে ধনে, জ্ঞানে ও শক্তিতে সত্যই সমৃদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু একমাত্র স্বার্থ,- অর্থাৎ হীন ব্যৈক্তিক স্বার্থ ই ইহার নিচেকার ভিত্তি, শুধু এই ভিত্তির উপরই সভ্যতার বিশাল সৌধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাই ইহা মানবগুরুকে মানবোচিত গুণ হইতে বঞ্চিত করিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

(ক) দাসতা যুগ

পিতৃসত্তা যুগে যুদ্ধবন্দীদিগকে হত্যা না করিয়া তাহাদিগকে দাস করার প্রথা প্রচলিত হয়—ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে আরও বলিয়াছি যে, সেই যুগে কৃষি, গৃহশিল্প ও ধাতুশিল্পের প্রসার ঘটায় সমাজে শ্রমসমর্থ ব্যক্তির প্রয়োজন বাড়িয়াছিল। তখন সমাজে সম্পত্তি উৎপাদনের উপযোগী বহু বিচিত্র সাধনই বর্তমান ছিল;

তাই এই সাধনকে সৃষ্টিকরী করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনশ্রমেরও চাহিদা বাড়িয়া যায়। সমাজে এইভাবে শ্রমের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবার ফলেই তখন দাসপ্রথার সৃষ্টি হয় এবং ইহাতে কিছুদিনের মধ্যে সামাজিক উৎপাদনপদ্ধতির সহস্রমুখী বিকাশ ঘটে।

"দাসতাই সর্বপ্রথম কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের সৃষ্টি করে। এবং ইহারই আশ্রয়ে য়ূনান প্রভৃতি † পুরাতন জগতের সমৃদ্ধি সম্ভব হয়। দাসতা ছাড়া য়ূনানের সাম্রাজ্যস্থাপন সম্ভব হইত না, কিংবা ইহা ব্যতীত রোমান রাজ্যেরও সৃষ্টি হইত না; ‡ আর রোমান বা য়ূনান রাজ্য ছাড়া আধারশূন্য ভাবে বর্তমান য়ূরোপও জন্মলাভ করিত না··· এখানে ভুলিলে চলিবে না, আমাদের আর্থিক, রাজনীতিক বা বুদ্ধিগত বিকাশের মূলে দাসতার সাহায্য আবশ্যক এবং সর্বস্বীকৃত ছিল। এই অর্থে ইহাও বলা চলিবে যে দাসতা ব্যতীত বর্তমান অর্থাৎ এইরূপ আধুনিক সমাজবাদও § সম্ভব হইত না......

"ইহা সত্য যে তখন শত্রুকে নাশ না করিয়া দাস করা সমাজের আর্থিক, রাজনীতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক হইয়াছে। সেই সময়ের সমাজ ¶ দুইটি পরস্পরবিরোধী স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই দুই স্বার্থের প্রতিযোগিতার সঙ্গে দাসতার দ্বারা বস্তুর অধিক উৎপাদনে সমাজের প্রগতি সম্ভব হয়। পূর্বে নাককান কাটিয়া, কলিজা বাহির করিয়া কিংবা অন্যান্য ক্রুর যাতনা দিয়া যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা

আদিম সাম্যবাদী সমাজ হইতে অগ্রবর্তী জাতির মধ্যে তখন শুধু দাসদের শ্রমেই বস্তুর সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপাদন চলিতে থাকে; এবং পরে এই প্রথাই আবার চলিত সমাজব্যবস্থার অন্তরায় হইয়া তাহার বিনাশের সহায়ক হয়; † ভারত, রোম, গ্রীস ইত্যাদি; ‡ ভারতের চক্রবর্তীরাজ্য কিংবা ইরাণের শাহনশাহীও সৃষ্টি হইত না; § Socialism; ¶ উপনিষদ্ এবং বুদ্ধকালীন ভারত তুলনীয়।

হইত। কিন্তু তাহার তুলনায় দাস হইয়া বাঁচিয়া থাকাও এই সব হতভাগ্যের পক্ষে অনেকটা ভাল হইয়াছিল। *

"দাসতা ছাড়া আমেরিকার কার্পাস সুলভ হইত না,—আর কার্পাস না হইলে আধুনিক শিল্পোদ্যোগও সম্ভব হইত না। দাসতার ফলে পরাজিত দেশ অর্থাৎ উপনিবেশের মূল্য বাড়িয়াছে; এবং এই উপনিবেশের জন্যই পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে... এইজন্যই দাসতা তখন সমাজের পক্ষে একটি মূল্যবান আর্থিক অস্ত্র ছিল। দাসতা ব্যতীত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল দেশ উত্তরী আমেরিকা এখনও পিতৃসত্তা যুগে পড়িয়া থাকিত; এমন কি দাসতা রহিত করিতে পারিলে, আমেরিকা হয়ত পৃথিবীর জাতির তালিকা হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত।"

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস্ উপরের কথাগুলি লিখিয়াছেন;—তখনকার সামাজিক অবস্থায় তাঁহার এই উক্তি অভ্রান্ত ছিল।

১। পরিবার ও বিবাহ

যৌনব্যাপারে প্রথমত পুরুষের মত স্ত্রীজাতিরও স্বচ্ছন্দতা ছিল; কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে স্ত্রীজাতির পূর্বের যৌনস্বাচ্ছন্দ্য রহিত হইয়া যায়। তখন স্ত্রীপুত্রের দায়ভাগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একবিবাহ প্রচলিত হয়; —তবে এই একবিবাহ সমাজে বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতির উপরই প্রযুজ্য হইতে থাকে। দাসতাযুগে প্রবিষ্ট হইবার পর বহু জাতির মধ্যেই এক-বিবাহের প্রাধান্য দেখা যায়; য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যে তখন হইতে এই প্রথা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। তবে এই নিয়ম পুরুষের বেশ্যা বা

* আযভট্ট গণিতের অনুশীলনে একস্থানে লিখিয়াছেন: একটি ১৬ বৎসরের দাসীর দাম ৩২ নিষ্ক হইলে, ৩০ বৎসর বয়স্কা একটি দাসীর মূল্য কত হইবে?

রক্ষিতা সংসর্গের বাধক ছিল না। দাসতাযুগে দাসীরা প্রভুর সম্পত্তিস্বরূপ ছিল—এইজন্য সামাজিকভাবে বিবাহ না করিয়াও তাহাদিগকে ভোগ করা চলিত। এশিয়াতে একবিবাহ কখনও কঠিন সামাজিক নিয়ম হয় নাই; এখানকার ইতিহাসে প্রথম হইতেই * বহুপত্নিতার চলন দেখা যায়; ইহাদের † প্রাচীন গ্রন্থে বা উপাখ্যানে বহুপত্নিতাকে কখনও নিন্দা করা হয় নাই। ইস্লামীয়রা জনবৃদ্ধির জন্য সর্বদা একসঙ্গে চারিটি বিবাহ করিত;—দাসীসংসর্গ রহিত করিবার জন্য তাহাদেরও কোন সামাজিক নিয়ম ছিল না; এমন কি পুরুষের জন্য ইহাতে সমাজের অনুমোদনই ছিল। হিন্দু জাতির মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীর সংখ্যানিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা হয় নাই—বরঞ্চ কৃষ্ণ, দশরথ প্রমুখ আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্তে ‡ ইহা ধর্মানুমোদিত হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুদের আদর্শ রাজার মধ্যে অবশ্য রামের কথাও উল্লেখ করিতে হয়ঃ রামচন্দ্রের জীবনে এক-পত্নিতার আদর্শ যথেষ্ট মর্যাদা পাইয়াছে সত্য, কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ শুঙ্গকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত হইয়াছিল,—এবং তখন য়ুনানী শাসকেরা ভারতের পশ্চিম ভাগে বাস করিতেছে। এই অবস্থায় রামায়ণের একপত্নিকতায় য়ুনানী প্রভাবও কতটুকু আছে কে বলিবে?

বহুপত্নিতার বিষয়টিকে তখন সকল পুরুষই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিত এইরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের মূল প্রেরণা হইতেছে সম্পত্তি,—এবং সম্পত্তিশালী শোষকেরা ছাড়া বহু-বিবাহের বিলাসিতা অন্যের পক্ষে তেমন সম্ভব ছিল না। পিতৃসত্তা যুগে পদার্পণ করিয়াই পুরুষ সমাজের প্রধান হয়; এবং সম্পত্তির উৎপাদক হওয়ায় তাহার প্রভাব প্রতিষ্ঠা আরও বাড়িয়া যায়।

---

* অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই; † হিন্দু, ইরাণী, চীনী ইত্যাদি;
‡ ষোড়শ সহস্র পত্নী (!)

পুরুষের অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে স্ত্রী-জাতির অধিকারেরও আনুপাতিক হ্রাস হয়; এবং এইভাবে স্ত্রী ক্রমে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া যায়। স্ত্রীর প্রতি যে সোহাগ বা প্রেম দেখানো হয়, তাহাও ইহাদিগকে কোন মানুষিক মর্যাদা দিবার জন্য নয়। স্ত্রী পুরুষের ভোগবস্তু, এবং আদর সোহাগ বা প্রেম এই ভোগেরই আঙ্গিক। উপনিষদকারও বলিতেছেন: 'ভার্যার কামনার জন্যই ভার্যা প্রিয় নয়, প্রকৃত পক্ষে আত্মকামনার জন্যই ভার্যা প্রিয়।' * পুরুষের প্রধানতার জন্য পরিবারে পুত্রের মান বাড়ে, এবং কন্যা আবার সেই অনুপাতেই অনাদৃতা হয়। পিতৃসত্তা যুগ হইতে আগাইয়া আসিয়াও সমাজে এই ভাবের ন্যূনতা হয় নাই। তাই পুত্রের জন্মের সঙ্গে পরিবারে গীতবাদ্যের সমারোহ পড়িয়া যায়; কিন্তু কন্যা আসিলে গীতবাদ্য ত দূরের কথা, সমগ্র পরিবার ম্রিয় ও বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে;—এমন কি মাতা অর্থাৎ স্বয়ং প্রসূতিও এই ভাব হইতে ত্রাণ পায় না। দাসতা ও সামন্তবাদের যুগে কন্যাজন্মের ফলে পিতার কি মনোভাব হইত, তাহা বুদ্ধের সমকালীন † রাজা প্রসেনজিতের কন্যাজন্ম উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায়:

"প্রসেনজিত কোসল বুদ্ধসমীপে উপবিষ্ট আছেন…এমন সময় এক পুরুষ আসিয়া তাঁহার কর্ণে নিবেদন করিল, "দেব, মল্লিকা দেবীর কন্যা জাত হইয়াছে।" এই বাক্যে কোসলপতি ক্ষুণ্ণ হইলেন…অনন্তর বুদ্ধ খেদ নিবারণের চেষ্টা করিয়া বলিলেন,…রাজন্, কখনও কখনও স্ত্রীও পুরুষ অপেক্ষা শীলবতী, মেধাবিনী, শ্রেয়সী…এবং শ্বশুরকুলের মানধাত্রী ও পতিব্রতা হয়…কিন্তু কোসলপতি পূর্ববৎ ক্ষুণ্ণই রহিলেন। ‡

---

* 'ন বৈ ভাযায়াঃ কামায় ভার্যা প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ভার্যা প্রিয়া ভবতি; † খ্রীঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩; ‡ সংযুক্ত নিকায় ৩।২।৬ (মল্লিকাসুত্ত, মৎকৃত 'বুদ্ধচর্যা'—পৃঃ ৩৯৩ দ্রষ্টব্য)।

বুদ্ধের যুগ পার হইয়া অনেক দূরে আসিয়াও ভারতীয় সমাজে এই ব্যাধির প্রকোপ কমে নাই। রাজপুত সমাজে নবজাতা কন্যাকে নুন খাওয়াইয়া কিংবা নাকমুখের উপর ফুল বা নাড়ী রাখিয়া তাহাকে হত্যা করা হইত। এখনও বহু জাতির মধ্যে কন্যাবধের প্রথা একেবারে রহিত হইয়া যায় নাই। পিতৃসত্তাক যুগে পরিবারে পুরুষের শাসন প্রচলিত ছিল; এবং পরিবার বৃহৎ হইলে সেখানে শাসনভার কুলজ্যেষ্ঠের উপর অর্পিত হইত। সংযুক্ত পরিবার চালনার জন্য তখন জ্যেষ্ঠকে পরিবারের প্রত্যেকের উপর সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইত। ভারতীয় যুক্ত পরিবারগুলিতে এখনও এইরূপ সমদৃষ্টির অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু পুঁজিবাদের আঘাতে ভারতবর্ষের যুক্তপরিবারেও ক্রমে দৃষ্টিসাম্যের অভাব ঘটিতেছে। তার উপর শিক্ষাপ্রাপ্তরা ব্যৈক্তিক স্বার্থ সম্বন্ধে বেশি সচেতন হওয়ায় যুক্ত পরিবারে ধীরে ধীরে ভাঙ্গনও ধরিতেছে।

(প্রাচীন ভারতে বিবাহ)

বিবাহাদি যৌনসম্বন্ধ বিষয়ক রীতিনীতিকে অনেক ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিও চিরকালীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ লইলে তাহাদের ধারণা যে কত অমূলক তাহা সহজেই বোঝা যায়। মহাভারতে কথিত আছে, সত্যযুগে ধর্ম চতুরঙ্গে † পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু ত্রেতায় তাহা শুধু যজ্ঞকর্মে পর্যবসিত হয়, দ্বাপরে যজ্ঞ রহিত হইয়া তপ ও দানের মাহাত্ম্য বাড়ে, এবং কলিতে শুধু ভক্তিই একক ও

† জপ, তপ, দান, ভক্তি।

অদ্বিতীয় হয়। বিবাহাদি ব্যাপারেও ধর্মের মত এইরূপ যুগোপযুক্ত পরিবর্তন হইয়াছে,—প্রাচীন গ্রন্থাদি অন্বেষণ করিলে ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা হয় না।

(ক) মৈথুন স্বাতন্ত্র্য—এক সময় মৈথুন মানুষের নিকট আহার নিদ্রা ও অন্যান্য শরীর-ধর্মের সমান বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনও বহু জনযুগীন জাতির মধ্যে মৈথুন বিষয়ে পূর্ণ নিঃসঙ্কোচতা বর্তমান আছে। কালিফোর্ণিয়ার ইণ্ডিয়নদের * মধ্যে গত শতাব্দীতেও এইরূপ অবস্থার অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। আমেরিকার চিপ্পয়েরা † এই বিষয়ে ভ্রাতা ভগিনী বা মাতাপুত্রেরও কোন বিচার করিত না। কাদিঅক, ‡ যজীদী § কারিব ¶ প্রভৃতি আধুনিক জাতির মধ্যেও এইরূপ যৌনস্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান ছিল। পুরাতন আইরিশ ও পারসীক সমাজেও † ইহাদের মত নির্বাধ যৌন সম্পর্কের প্রচলন দেখা যাইত। অনেক দেশে

---

* "The indigenous Indians of California, couple after the manner of inferior mammals, without the least formality, and according to the caprice of the moment." *Evolution of Marriage*, Letourneau, (3rd edition, pp. 43).

† "The Chippeways frequently co-habit with their mothers and oftener still with their sisters and daughters."...Idid, pp. 65.

‡ "Kadiaks unite indiscriminately brothers with sisters and parents with children." Ibid, pp. 65.

§ "Yazidics a sect of Arabs unite in the darkness without heed as to adultry or incest..." Ibid, pp. 44.

¶ "The Caribs married at the same time a mother and daughter. The ancient Irish married, without distinction, their mother, and sisters." Ibid, pp. 66.

† "Justin and Tertullien tell that the Parthians and Persians married their own mothers. In ancient Persia religion sanctified the unions of a son with his mother." Ibid, pp. 44.

কমীনদের * নববধূকে প্রথম সামন্তের ভোগের জন্য অর্পণ করিবার রীতি ছিল—এই প্রথা অঞ্চল বিশেষে আজও বর্তমান আছে দেখা যায়। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি দলিল হইতে ফরাসী কাউন্টরাও নিজ জমিদারীতে ইহা চালাইত † জানা যায়। মধ্যযুগীয় য়ুরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও সামন্তরা প্রজাপত্নীর কৌমার্য মোচন করিয়া দিত। সামন্তশ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় মঠের যাজকেরাও তখন ইহার সুযোগ লইতে ছাড়িত না।

যৌন বিষয়ের এই সব নির্বাধ স্বচ্ছন্দতায় আমাদের আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস-পুরাণ অনুসন্ধান করিলেও এই রকম উদাহরণের অভাব ঘটিবে না। তবে, এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়ত এখন অনুচিত হইবে; কারণ, পরবর্তী যুগের হিন্দুরা এই সব তথ্য উদ্‌ঘাটন করা ক্রমেই অপছন্দ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাভারতের মধ্যস্থতায় পরাশরের সত্যবতী সমাগমের ‡ কথা অবশ্য আজ সর্ববিদিত; তবে কথা এই, মহাভারতকার সত্যবতীর লজ্জা ঢাকিবার জন্য মুনির দিব্যশক্তির সাহায্যে নদীতে কুয়াশার সৃষ্টি করিয়াছিলেন;—কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্তকার উত্তথ্যপুত্র

---

† (পূর্ব পৃষ্ঠা হইতে) ইরাণীদের মাতৃবিবাহের প্রসিদ্ধি ভারতবর্ষের ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থকারেরও জ্ঞাত ছিল: 'মাতৃবিবাহো হি তদ্দেশজন্মনঃ পিণ্ডখর্জুরস্য দেশান্তরেষু মাতৃবিবাহাভাবেহভাববৎ' (বাদন্যায়, পৃঃ ১৬; ধর্মকীর্তি, ৬০০ খ্রীঃ); 'মাতৃবিবাহ... পারসীকদেশ...' (বাদন্যায় টীকা, পৃঃ ১৫; শান্তরক্ষিত, ৭৪০-৮৪০ খ্রীঃ)।

* Serf; † In a French title deed of 1507 we read that Count d' Eu has the right of prelibation in the said place when anyone marries." Ibid.

‡ মহাভারত, আদিপর্ব (৬৩)

দীর্ঘতমা * মানুষের সম্মুখেই † স্ত্রীসমাগম সম্পন্ন করেন। সেই যুগে ঋতুকালীন বিরামের পর স্ত্রী যে কোন পুরুষের সংসর্গ যাচ্ঞা করিতে পারিত; শর্মিষ্ঠাও ঠিক এই ভাবেই যযাতির নিকট রতিভিক্ষা ‡ করিয়াছিল। মহাভারতে উক্ত আছে, পুরুষ এই ক্ষেত্রে কামার্তাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে গর্ভপাতের পাতকী § হইতে হয়। ইহা হইতে পাবে, প্রাচীন যুগে জনসংখ্যা বর্ধনের জন্য এইরূপ বিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল। উলুপী অর্জুনের সহবাস প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল, ⫲ 'স্ত্রী জাতির অনুরোধে এক রাত্রি সঙ্গত হওয়া যায়, ইহাতে কিছুমাত্র অধর্ম হয় না।' মাতা বা গুরুভার্যা গমনকে পরবর্তী কালে মহাপাপ বলিয়া বিহিত করা হইয়াছিল; কিন্তু উতঙ্ক ¶ গুরুস্ত্রীর ঋতুশান্তির জন্য তাহার সহগমন করায় তাহার কোন পাপ হয় নাই। চন্দ্রমা আপন গুরু বৃহস্পতির ভার্যার সহিত যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করে; ইহাতে বুধের জন্ম হইলে তাহার পিতৃত্ব লইয়া গুরুশিষ্যে কলহ বাধে, এবং পরে স্বয়ং তারার মধ্যস্থতায় ইহার নিষ্পত্তি হয়। গৌতমপত্নী অহল্যাব ইন্দ্র-অপবাদও এইরূপ প্রসিদ্ধ ব্যাপার; কিন্তু এই অপরাধে গৌতম পত্নীকে চিরকালের জন্য ত্যজ্যা মনে করেন নাই।

(খ) বিবাহ প্রথা সনাতন নয়—আজকাল বিবাহ ব্যাপার এক পবিত্র ধার্মিক আচারে পরিণত হইয়াছে; ইহা শুধু ভারতে নহে, বহির্ভারতেও বিবাহ ধর্মকৃত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের

---

* ইনি ঋগ্বেদের বহু সূক্তের কর্তা, পরে তিনি গৌতম নামে প্রসিদ্ধ হন, তাঁহার বংশধর গৌতমগোত্রীয় নামে খ্যাত; † মহাভারত, আদিপর্ব (১০); ‡ ঐ, আদিপর্ব (৮২); § ঐ, আদিপর্ব (৮৩); ⫲ ঐ, আদিপর্ব (২১৪); ¶ ঐ, আদিপর্ব (৩)

পুরাতন গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে এই প্রথা যে চিরাচরিত নয় তাহা বোঝা যায়। পরে আমরা পঞ্চশিখ গন্ধর্বের সঙ্গে দেবকন্যাদের অস্থায়ী বিবাহের কথা আলোচনা করিয়াছি। পুরাণে দেবকন্যা ও অপ্সরাদের অস্থায়ী বিবাহের বহু উপাখ্যান বর্ণিত আছে। মহাভারত পাঠে জানা যায় * উত্তর কুরুতে বিবাহ প্রথার তখন কোন অস্তিত্বই ছিল না। পরবর্তী যুগের গ্রন্থে উত্তর কুরু বলিতে একটি কাল্পনিক দেশের মত বুঝাইয়াছে; কিন্তু উত্তর কুরুর সম্বন্ধে এত প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান এবং উত্তর কুরু নামে ভারতবর্ষে একটি প্রদেশ থাকাতে মনে হয়, আর্যেরা ভারতে আসিবার পূর্বে তাহাদের কোন বসতির নাম উত্তর কুরু ছিল। সম্ভবত সপ্তসিন্ধুর দেশ পামীরে অবস্থানকালে জনসমাজগত আর্যেরা ঐ অঞ্চলের নামই উত্তর কুরু দিয়াছিল। এই উত্তর কুরুর স্ত্রীরা মহাভারতকারের মতে স্বচ্ছন্দ ছিল, অর্থাৎ তাহারা কোনরূপ বিবাহবন্ধন † স্বীকার করিত না। মহাভারত হইতে অবশ্য বিবাহবন্ধন প্রথমত একেবারে ছিল না বলিয়াই বোঝা যায়; তখন এক ব্যক্তির স্ত্রীকে অপর ব্যক্তি সংসর্গের জন্য লইয়া যাইতে পারিত। উদ্দালক ঋষির স্ত্রীকে তাহার পতির সমক্ষেই অন্য ঋষি যৌনক্রিয়ার জন্য লইয়া যাইতেছিলেন;—এই সময় তাহার পুত্র শ্বেতকেতু ইহার বিরোধিতা করিলে উদ্দালক ইহাকে ধর্ম বলিয়া বিবৃত করেন। কিন্তু শ্বেতকেতু ‡ ইহাতে আহত হইয়া এই প্রথা রহিত করিতে কৃতসংকল্প হন; এবং পরে ঋষি হইয়া তিনি অস্থায়ী বিবাহের স্থলে স্থায়ী বিবাহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দালক ও শ্বেতকেতু উভয়েই উপনিষদের ঋষি; এই হিসাবে তাহাদের সময় খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ছয় সাত শতাব্দী § পূর্বে হইবে। তাই, মহাভারতের প্রমাণ হইতেই, অন্তত

---

* ঐ, আদিপর্ব (১২২); † ঐ, অনুশাসন পর্ব (১০২); ‡ উদ্দালকের পুত্র; § মৎকৃত 'দর্শন দিগ্দর্শন' দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দ পর্যন্ত ভারতে বিবাহবন্ধন যে শিথিল ছিল, তাহা বুঝিতে পারি।

(গ) বিবাহবন্ধন শিথিল—মহাভারতের যুগে আসিয়াও ভারতবর্ষের বিবাহবন্ধন যে তেমন দৃঢ় হইয়াছিল তাহা মনে হয় না; কারণ, দেখা যাইতেছে যে, নারী অন্যপূর্বা হইলে তখনকার সমাজের বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। কুন্তী কুমারী অবস্থায় কর্ণের জননী হইয়াছিলেন, কুমারী গঙ্গার গর্ভে শান্তনু-সুত ভীষ্মের জন্ম হয়; এইরূপ পরাশর ও কুমারী সত্যবতীর সঙ্গমের ফলে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইহার পর সত্যবতী * পুনরায় শান্তনুর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। কুন্তীর সপত্নী মাদ্রী মদ্রদেশীয়া † ছিলেন, এবং সেইখানেই তাঁহার জন্ম হয়; কর্ণ এই মদ্রীয়দের নির্বাধ যৌন আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। গন্ধারপতি শল্য তাঁহাকে উপহাস করিলে তিনি মদ্র ও গন্ধারের স্ত্রৈণ আচারনীতির ‡ উল্লেখ করেন। কর্ণের শ্লেষোক্তিতে মনে হয়, মদ্র-গন্ধারে ¶ মাতা পুত্র, পিতা পুত্রী, বধূ শ্বশুর, মাতুল ভাগিনেয়ী, কিংবা জামাতা শাশুড়ী, এমন কি দাসদাসী বা অতিথি অপরিচিত প্রভৃতির সঙ্গেও যৌন আচারে বাধা ছিল না। কর্ণের উক্তিতে জানা যায় সেখানকার স্ত্রীরা নিজে আগ্রহী হইয়া পুরুষকে সহবাসে লিপ্ত করিত; অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে তাহারা কামগীতি গাহিত, সুরাপান করিত এবং নির্লজ্জার মত নৃত্য করিত; সেখানে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল না, নারীরা অনাচারী ছিল—এইজন্য নিজের ইচ্ছামত তাহারা নায়ক নির্বাচন করিত।

---

* ঐ, আদিপর্ব (৬৩), বনপর্ব (৩০৬); † বর্তমান শেয়ালকোটের আশপাশের জিলা; ‡ ঐ, অনুশাসন পর্ব (১০২); ¶ গঙ্গাউপত্যকা হইতে মদ্রগন্ধারের রীতিরেওয়াজ পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

এক স্ত্রীর বহু পতির নিদর্শন আমরা প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যার * অন্যতমা দ্রৌপদীতেও দেখিতেছি। তারপর আপন কন্যা, আপন ভগিনী এবং নাতিনীর সহিতও বহু বিবাহের নিদর্শন পুরাণগ্রন্থাদিতে মিলিয়া যাইতেছে। ইক্ষ্বাকুর নির্বাসিত কুমারেরা তাহাদের ভগিনীদিগকে বিবাহ করিয়া † শাক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করে ;—শ্যাম দেশের রাজবংশে ভ্রাতাভগিনীর বিবাহের প্রথা আধুনিক কালেও বর্তমান আছে। দশরথ জাতকের § লেখন অনুসারে সীতাদেবী রামচন্দ্রের ভার্যা এবং ভগিনী দুইই ছিলেন। ব্রহ্মার নিজ পুত্র সরস্বতীর প্রতি তাহার কামাসক্তির কথাও পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যাপার; ইহা ছাড়া ব্রহ্মা তাঁহার পুত্র দক্ষের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সঙ্গে বিনা বিবাহে স্ত্রীপুরুষের অস্থায়ী যৌনসম্বন্ধের কথাও মহাভারতে প্রচুর আছে : হিড়িম্বা ও ভীমের সম্পর্কও সম্পূর্ণ অস্থায়ী ছিল,—কিন্তু তাহাতে ঘটোৎকচের জন্ম হয় ; ‡ এইরূপ ভরদ্বাজ ও ঘৃতাচীর সঙ্গমের ফলে দ্রোণ, জানপদী ও গৌতমের সঙ্গমে কৃত, ব্যাস ও ঘৃতাচীর সহবাসে শুক, বিশ্বামিত্র ও মেনকার প্রণয়ে শকুন্তলা, এবং উর্বশী ও পুরুরবার মিলনে তাহাদের সাত পুত্রের জন্ম হয়। রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার সহিত অর্জুনের মিলনকালও তিন বৎসরের অধিক ছিল না ; কিন্তু ইহার ফলেই বভ্রুবাহন জন্মলাভ করে।

এই সব নিদর্শন ছাড়া পাণ্ডব কালে নিয়োগ এবং দেবর প্রথারও বহু নিদর্শন আছে। এই প্রথা অনুসারে মৃত বা জীবিত পতির পুত্রকামনায় স্ত্রী অন্য পুরুষের বীর্যনিষেকে গর্ভবতী হইতে পারিত। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এইরূপেই ব্যাসের ঔরসজাত নিয়োগ পুত্র ছিল ;

---

* অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী ;—লক্ষ্যণীয় যে ইহাদের প্রত্যেকেই একাধিকভর্তৃকা ; † মৎকৃত 'বুদ্ধচর্যা' দ্রষ্টব্য ; § জাতক দ্রষ্টব্য ; ‡ আদিপর্ব (১৫৫)

বলি রাজার সন্তান না থাকায় তিনিও গৌতম দ্বারা আপন পত্নী সুদেষ্ণার নিয়োগ করাইয়াছিলেন্—তাহাতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং সুহ্ম নামে * তিনি চারিটি পুত্রলাভ করেন। শারদণ্ডায়ন রাজা পথিক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া তাহা দ্বারা নিজ পত্নীর গর্ভোৎপাদন করাইয়াছিলেন। সৌদাস রাজাও প্রথমে এইরূপ নিঃসন্তান ছিলেন; তিনি স্ত্রী মদয়ন্তীকে বশিষ্ঠ দ্বারা নিয়োগ করাইয়া পুত্রলাভ করেন। দেবর প্রথাও প্রায় নিয়োগেরই অনুরূপ, কারণ ইহাতে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত সংসর্গের অনুমোদন আছে। 'দেবর' বহু প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ; রুষ ভাষায় ইহার অনুকল্প 'দেবৃ'; দেবর ও দেবৃ এই উভয় শব্দেই পতির অনুজ ভ্রাতাকে বুঝাইয়া থাকে। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে লিখিয়াছেন, 'দেবর কেন? কারণ সে দ্বি—অর্থাৎ দ্বিতীয় 'বর' †—ইহার অর্থ হইতেছে পতির অনুপস্থিতিতে ভ্রাতৃবধূর উপর দেবরের অধিকার বর্তায়। বাল্মীকি রামায়ণে মারীচ বধের সময় লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সাহায্যার্থে বাহির না হইলে সীতা বলিয়াছিলেন, 'রামের মৃত্যুর পর তুমি আমাকে চাও, এই জন্যই রামের আর্তনাদ শুনিয়াও তুমি যাইতেছ না।' রামায়ণে পতির জীবৎকালেই বালীর স্ত্রী তারা সুগ্রাবের এবং মন্দোদরী বিভীষণের পত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছে।

পত্নীদান—যূনানী ইতিহাসে বন্ধুর তৃপ্তির জন্য আপন স্ত্রী অর্পণ করার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। সক্রেতিস অল্কিবিয়াদিস্‌কে নিজ পত্নী জন্তিপের সহিত সহবাস করিতে দিয়াছিলেন। এই রকম দৃষ্টান্ত অবশ্য সেই দেশে আরও প্রচুরই আছে—ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থেও দানধর্মের খাতিরে স্ত্রী অর্পণের বর্ণনা পাওয়া যায়। যুবনাশ্ব তাহার প্রিয় পত্নীকে দান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন; ‡ মিত্রসহ আপন পত্নী মদয়ন্তীকে

* আদিপর্ব (২১৫); † 'দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে।' ‡ শান্তিপর্ব (১৩৪)

বশিষ্ঠের উপভোগে দিয়া * এইরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হন। সুদর্শন অতিথি সেবায় নিজ পত্নী অর্পণ করিয়া † অমর কীর্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে ভারতবর্ষেও অন্যান্য দেশ ও জাতির মত স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের স্বচ্ছন্দতা ছিল তাহা প্রমাণ হয়।

২। অস্ত্র ও হাতিয়ার

মিশরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পিরামিড নির্মাণের সময়ে ‡ মিশরীয়েরা নিশ্চয়ই তাম্রের ব্যবহারও জানিত। § এইজন্য খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের সময় অন্তত একটি জাতি তাম্রযুগে প্রবেশ করিয়াছিল। তাম্রের আবিষ্কারের কাল অবশ্য আমরা সঠিক ভাবে কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না—কিন্তু পিরামিডের দৃষ্টান্তে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে মানুষ যে ইহার ব্যবহার জানিত তাহা বুঝিতে পারি। তাই বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্রই যে তখন তাম্রযুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল ইহা সত্য নহে। আমেরিকার ইঙ্কা, অজেতক, কিংবা মায়া প্রভৃতি সভ্যজাতি ষোড়শ শতাব্দীতেও তাম্র-পিত্তলের যুগে ¶ বাস করিতেছিল। গত শতাব্দীতেও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীরা ধাতুর কোন রকমের ব্যবহারই জানিত না—এমন কি তাহাদের কুটিরের আশেপাশে সোনার তাল পড়িয়া থাকিলেও তাহা তাহারা স্পর্শ করিত না।

দাসতাযুগে পৃথিবীর কোন স্থানেই পিত্তল বা লৌহের আবিষ্কার হয় নাই—অন্তত মিশর, মেসোপোতামিয়া ও সিন্ধুউপত্যকায় যে তখনও ইহার ব্যবহার ছিল না—এই সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। পিত্তলের

---

*শান্তিপর্ব (১৩৪) ; † অনুশাসন পর্ব (২) ; ‡ খ্রীঃ পূঃ চার সহস্রাব্দ ; § ৭৩ পৃষ্ঠায় এই অনুমানের কারণ বর্ণিত আছে ; ¶ অর্থাৎ তখনও তাহারা লৌহযুগে প্রবিষ্ট হয় নাই।

আবিষ্কারের কাল ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সমসাময়িক হইবে; তাহারও প্রায় তিন শত বৎসর ব্যবধানে অর্থাৎ প্রায় ১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সময় লৌহ আবিষ্কৃত হয়। তবে পৃথিবীর সমস্ত জাতি তখন হইতেই পিত্তল বা লৌহের ব্যবহার আয়ত্ত করিয়া লয় নাই। দাসতাযুগে লৌহ পিত্তলের আবিষ্কার না হওয়ায় সেই যুগে অস্ত্রপাতির কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই—প্রাচীন ধাতুদ্রব্যের উপর কারুকার্য এবং পুরাতন তাম্রাস্ত্রকে নূতন প্রণালীতে তীক্ষ্ণ করার কাজ তখন কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছিল।

৩। সম্পত্তি

দাসতা যুগকে আমরা পিতৃসত্তা ও সামন্তবাদী যুগেব সন্ধিকাল বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। ইহার মধ্যে প্রথম যুগটির সম্পর্কে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যায় না—শুধু কয়েকটি কাহিনী, তাহাও আবার শুধু য়িহুদি জাতির কাহিনী, এবং ইহার সঙ্গে কয়েকটি মাত্র আধুনিক পিতৃসত্তাক জাতির * সাক্ষ্য লইয়াই আমরা এই যুগের পরিচয় পাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সামন্তযুগে অন্ধকার হইতে মধ্যাহ্নালোকে না হইলেও, অন্তত ইতিহাসের অরুণোদয় কালে যে আমরা পৌছিতেছি তাহা নিশ্চয়। দাসতাযুগে সম্পত্তির উৎপাদন এবং উৎপাদনের সাধনসমূহের সামাজিক বন্ধনের বিশেষ কোন পতিবর্তন হয় নাই। পিতৃসত্তাক যুগের মত এই সময়ও সম্পত্তিতে পুরুষের অধিকার এবং উত্তরাধিকার রক্ষিত ছিল। পশুপালন, কৃষি, শিল্প এবং বিনিময় ব্যাপারেও দাসতাযুগ পিতৃসত্তা যুগের অনুকল্প ছাড়া কিছুই নয়—দাসতা যুগেও সম্পত্তি মাত্রেই ব্যৈক্তিক ছিল এবং ব্যক্তির তাহার দান বিক্রয়ের অধিকারও ছিল।

---

* যে সব জাতি এখনও আদিম পিতৃসত্তাক স্তরে রহিয়া গিয়াছে।

৪। শিল্প ও ব্যবসায়

দাসতা যুগে কৃষির উন্নতি হইলেও এই সময়ের শিল্পোন্নতিই অধিকতর উল্লেখযোগ্য। কৃষি অপেক্ষা শিল্পে তখন বৈয়ক্তিক অর্থাগম বেশি হইত,—এইজন্য দাসদের শ্রম তখন বিশেষভাবে শিল্পক্ষেত্রেই নিয়োজিত হইতে থাকে।

(ক) হস্তশিল্প—দাসতা যুগে আসিয়া কৃষি, শিল্প এবং গ্রাম ও নগরের মধ্যে এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি হয়। প্রথমত কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এই প্রকারের শ্রমবিভাগ বর্তমান ছিল না; তখন মানুষ কৃষিকর্ম করিয়াও আবশ্যকীয় শিল্পদ্রব্য নিজ পরিবারে প্রস্তুত করিয়া লইত। বহু পশ্চাদপদ জাতির মধ্যে এই পদ্ধতি এখনও বাঁচিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিনিময় ও ব্যবসায়ের জন্য উন্নত ধরণের জিনিসের চাহিদা ক্রমে বাড়িতে থাকে;—ইহাতে যে আঙ্গুরের শরাব একদিন ঘরে প্রস্তুত হইত, তাহার জন্যও মদ্যবিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে। দাসতা যুগে পরাজিত শত্রু, ক্রীতদাস কিংবা তাহাদের সঙ্কর পুত্রপৌত্রের দ্বারা বিশেষজ্ঞের * কাজ চলিত; অনেক সময় শিল্পস্বামী স্বয়ং অথবা তাহার আপন লোকজনও, শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া উৎপাদনের সাহায্য করিত। ভারতবর্ষে সামন্তবাদের সময় পরাজিত দাসদের মধ্য হইতেই প্রায় সমস্ত শিল্পী জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। আর্যদের মধ্যে এক সময় সীবনবয়ন এবং এইরূপ পুরাতন শিল্পকাজের প্রচলন থাকিয়া থাকিতে পারে—কিন্তু সামন্তবাদে পৌঁছিবার পূর্বে তাহারা সকল প্রকার শিল্পকর্ম † পরিত্যাগ করিয়াছিল।

পিতৃসত্তার শেষ অবস্থায় দাসতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ স্বামী ও দাস এই

---

* অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ শিল্পীর; † ৩৮ পৃষ্ঠার টীকায় শিল্পীকর্মকে অপবাদসূচক বলা হইয়াছে।

দুই পৃথক বর্গে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার আনুষঙ্গিকভাবে স্বামী ও দাসদের মধ্যে তখন একটি নূতন রকমের শ্রমবিভাগও সৃষ্ট হয়। এই বিভাগ অনুযায়ী দাসদের উপর নিজে শোষিত হইয়া প্রভুর সম্পত্তি বাড়াইবার জন্য পরিশ্রম করার ভার পড়ে ; এবং স্বামী কিংবা প্রভুরা দাসদিগকে শুধু শাসন অর্থাৎ প্রকারান্তরে শোষণ করিবার দায়িত্বই বাছিয়া লন। ব্যৈক্তিক সম্পত্তির প্রেরণা থাকায় এই অবস্থায় সমাজের বহুতর আর্থিক উন্নতি হয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপাঁতিরও বহু নূতন নূতন বিকাশ ঘটে। শিল্পের বিকাশ হওয়ায় তখন আবার নূতন করিয়া শ্রমবিভাগেরও প্রয়োজন পড়ে ; এবং ইহাতেই শেষ পর্যন্ত কৃষি ও শিল্প পৃথক হইয়া যায়। এইবার কিছু লোক শুধু শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহাকে তাহাদের ব্যবসায়ে * পরিণত করে। অবশ্য গ্রামে বাস করিবার সময় শিল্পীরা যে তখনও একেবারে ক্ষেতখামার করিত না এমন নয়। তবে এই শ্রমবিভাগের ফলেই ভারতবর্ষে কামার, ধুপী, নাপিত এবং বাড়ুই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতের সৃষ্টি হয় ; এবং ধীরে ধীরে ইহাদের বিবাহাদি সম্পর্ক পর্যন্ত নিজস্ব পেশার গণ্ডিতে সীমিত হইয়া যায়। পূর্বোক্ত বিভাগ দুইটি † ছাড়া এই সময় আর একটি তৃতীয় রকম শ্রম-বিভাগেরও সূচনা হয় ; উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে ক্রমে একটি মধ্যগ শ্রেণী অর্থাৎ ব্যবসায়ীবর্গের উদ্ভব ঘটে —তবে সামন্তবাদী যুগের পূর্ব পর্যন্ত ইহারা ভারতবর্ষে কোন স্বতন্ত্র শ্রেণী বা জাতে পরিণত হয় নাই। দাসতা যুগে সমাজের উৎপন্ন পণ্যের ক্রয়বিক্রয় অবশ্য বাণিয়াদের করায়ত্ত ছিল না ; কিন্তু সমাজের বহুবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় তখন খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। এইভাবে বিনিময় বাড়িয়া যাওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়।

* জাত ব্যবসায়ে ; † দুইটি শ্রমবিভাগ—কৃষি ও শিল্প।

(খ) বাণিজ্য—দাসতাযুগে বাণিজ্য যে কোন বিশেষ বর্গের পেশা হইয়া উঠে নাই ইহা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। এই সময় প্রত্যেক শিল্পীকেই নিজেদের পণ্যবস্তু ফিরি করিয়া বেড়াইতে হইত—কখনও বাজারে বা মেলায় কাঁচামাল বা মুদ্রাকল্প ধাতুর * সঙ্গে তাহার বিনিময়ও চলিত। এই বাণিজ্যের বিনিময়বস্তু অর্থাৎ পণ্য যে তখন শুধু নির্জীব পদার্থই ছিল তাহা নহে—ইহাতে সজীব পশু, এমন কি ইহার সঙ্গে জীবন্ত মানুষও † সামিল ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজে মুদ্রার প্রচলন তখনও ছিল না—তাই মুদ্রার বদলে মানুষ জিনিসপত্রই কর্জ নিত, আর এই কর্জের সুদও মুদ্রার স্থলে বস্তুর দরের উপর তাহার পরিমাণ দিয়া নির্ধারিত হইত। ভারতবর্ষে ছয় মাসের মেয়াদে আসলকে দেড়গুণ করিয়া দিবার চুক্তিতে শস্য কর্জ দিবার প্রথাও ‡ এইরূপ।

৫। বর্গ ও বর্গসংঘর্ষ

পিতৃসত্তার যুগে পুরাতন বর্গবিহীন সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাহার স্থলে দাসতা ও শোষণের নূতন বর্গযুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সামাজিক বর্গবলিতে আমরা প্রকৃত পক্ষে কি বুঝিব ?… উৎপাদন ব্যাপারে অভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির সমূহই সামাজিক বর্গ… এই বর্গ বা শ্রেণীর ব্যক্তি উৎপাদনে একই প্রকারের কাজ করে…এবং অপর বর্গের ব্যক্তি সমুদয়ের সঙ্গে একই প্রকারের সম্বন্ধ রক্ষা করে…এই

---

* তখন ধাতুখণ্ডে মুদ্রার কাজ চলিত ; † দাসদাসী প্রভৃতি ; ‡ ভারতের গ্রামাঞ্চলে এখনও ইহা বর্তমান আছে ; শস্যের বিনিময়ে পশু কর্জ দিবার প্রথাও দেখা যায়।

মানুষকে উৎপাদনবস্তু অর্থাৎ শ্রমের উপকরণ হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়…' এইভাবে দাসতার সমাজে ধনী নির্ধন, দাস প্রভু কিংবা শাসক শাসিত প্রভৃতি বর্গ পরস্পর হইতে পৃথক ; এই সকল বর্গের স্বার্থও আবার তেমনই পৃথক এবং বলিতে পারি ইহারা পরস্পর-বিরোধী। তাই পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দাসতার সমাজেও ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই বর্গসংঘর্ষ অবশ্য সকল সময়েই খুব উগ্র হইয়া উঠিতে পারিত না, কারণ বৈয়ক্তিক সম্পত্তির বলে বর্গের মধ্যেও আবার স্বার্থের তারতম্য সৃষ্টি হইয়াছিল ; এবং ইহার ফলে এক বর্গের ভিতরও স্বার্থিক একতা সর্বদা সম্ভব হইত না।

দাসতাযুগে প্রভুর নিকট হইতে দাসেরা কোন সহানুভূতি পাইত না—ইহার মূলে আর্থিক স্বার্থত ছিলই, তার উপর দাসেরা এক সময় শত্রুগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। চিরকাল আর্থিক পরাধীনতা ও দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে করিতে দাসেরাও * মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া উঠিত—কিন্তু তাহাদের বর্গশক্তি সংহত না হওয়ায় শাসকদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করিয়া গুরুতর দণ্ডবিধান করিতে অসুবিধা হইত না। আর একটি কারণ এই যে, দাসতার যুগে বর্গের সীমাভাগও তত স্পষ্ট ছিল না—একবর্গের মধ্যে তখন বহু রকমের উপবর্গ এবং বহু অসমস্বার্থের অস্তিত্ব ছিল। এইজন্য সেই সময় কোন বর্গের বিপক্ষে নিজেদের সমগ্র শক্তি কেন্দ্রিত করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই আপন শ্রম দিয়া শোষিতবর্গ তখন শুধু শোষক শ্রেণীর সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিত—ইহার প্রভাবে অবশ্য সমাজও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইত—কিন্তু এই সমৃদ্ধির স্রষ্টা হইয়াও শোষিতেরা নিজেদের অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারিত না। দাসতা ও সামন্তবাদী

---

* শুধু দাসই নহে, সমস্ত শোষিতই।

যুগের বর্গসংঘর্ষের রূপ অবশ্য বলিতে গেলে প্রায় একই রকম—পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সামন্তবাদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে উভয়েরই একত্র আলোচনা করিব।

৬। রাজ্যশাসন

এই যুগে রাজ্যশাসনক্ষমতা বা রাজসত্তা দাসের মালিকদের হাতে ছিল—তাই দাসদিগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা রাজ্যশাসনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ধার্য হয়। সমাজে তখন দাস ও প্রভু ছাড়া অন্যান্য স্ব-তন্ত্র ব্যক্তিও যথেষ্ট ছিল—এবং রাজ্যশাসন ব্যাপারেও ইহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি তখন একেবারে কম ছিল না।

দাসতাযুগ পিতৃসত্তাযুগেরই বিকশিত রূপ; এইজন্য দাসতাযুগের শাসনতন্ত্রও পিতৃসত্তার অনুরূপ। দাসতার সমাজে পিতৃসত্তা কালের মতই ব্যক্তির পরিপূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই—তাই শাসনযন্ত্র উচ্চবর্গের হিতার্থে নিয়োজিত হইলেও সমাজের মধ্যমদিগকে * একেবারে উপেক্ষা করা চলিত না। এমন কি অনেক সামাজিক ও ধার্মিক সভায় স্বয়ং প্রভুবর্গই ইহাদিগকে সম্মানিত করিতেন। ইহাতে মধ্যমদের অভিমান খুব প্রবলভাবে চরিতার্থ হইত এবং দাসদের স্তর হইতে তাহাদের পার্থক্যও প্রতিপন্ন হইত।

৭। ধর্ম

ধর্মবিষয়ে সামন্তবাদী যুগ ও দাসতাযুগের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই—এইজন্য ইহার আলোচনাও আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে সামন্তবাদের বর্ণনা প্রসঙ্গেই করিব। এখানে প্রসঙ্গত ইহা বলিয়া রাখা যায় যে, 'ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া তাহার নাম ধর্ম।' † এই

* দাস ও প্রভুর অন্তর্বর্তী স্তরের ব্যক্তি; † 'ধারনাদ্ ধর্মমিত্যাহুঃ'

প্রবচনের সত্যতা বা উপযুক্ততা সম্পর্কে আমাদের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই *; কারণ ধর্ম চিরকালই চলায়মান এবং প্রগতিশীল সমাজকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। দাসতাযুগেও ধর্ম প্রভুবর্গের স্বার্থের সঙ্গে সমাজশক্তির বিরোধ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে; এবং এই ধর্মই দাসকে প্রভুর অধিকারের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপন পাপ বলিয়া শিখাইয়াছে।

---

* ধর্মের উৎপত্তি ও তাহার বিকাশধারা বুঝিবার জন্য ৯২—৯৮ পৃষ্ঠা এবং তৎসম্বন্ধে সামন্তবাদী যুগের শেষের দিকে ধর্ম ও সদাচার বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

সভ্য মানব সমাজ (২)

(খ) সামন্তবাদী যুগ

দুইটি বিরোধী বর্গে বিভাজিত হইবার পর সমাজের শাসনযন্ত্র বা রাজ্যও ধনিকবর্গের আয়ত্তে চলিয়া যায়; ইহাতে দীনহীন দাস ও নির্ধনদিগকে করগত রাখিবার কোন বন্দোবস্তেই আর ত্রুটি থাকে না। কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থসম্পর্কিত বিরোধিতা তখন ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। ধনিকদের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি সেই সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করিত। এই বিভিন্ন ভৌগলিক প্রদেশগুলিই তখনকার বিভিন্ন রাজ্য এবং তাহার শাসনকর্তারা সেই সব অঞ্চলের সামন্ত অথবা রাজা। অন্যের রাজত্বের প্রতি লোভলিপ্সা থাকায় এই সব রাজ্য ও রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ কখনও বন্ধ হইত না। তখনকার যোদ্ধসম্প্রদায় জনযুগীন গোষ্ঠীর মত তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল না—পার্শ্ববর্তী শত্রুর সৈন্যবল বুঝিয়া প্রত্যেক রাজ্যকেই তখন নিজেদের বাহিনী প্রস্তুত করিতে হইত; প্রাচীন যুগের গোষ্ঠীযুদ্ধে প্রত্যেক সেনানী নিজেই নিজের নায়ক ছিল—তখন বাহিনী ছিল না, এইজন্য সেনানায়কেরও প্রয়োজন ছিল না—আদিম অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত কৌশল ও বীরত্বে তখন যুদ্ধ করিত। এক কোষ বা সেল * বিশিষ্ট প্রাণীর শরীর চালনা যেমন অনায়াস হয়—প্রাচীন যুগের যোদ্ধাদেরও তখনকার গোষ্ঠীসংঘর্ষে তেমনই সুবিধা হয়। কিন্তু এই যুগে † সেনার সংখ্যা শতের অঙ্ক

---

* Cell ; † অর্থাৎ সামন্তবাদী যুগে আসিয়া।

ছাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে সহস্রাধিকে পৌঁছিয়া যায়—আর যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকতর নূতন ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রেরও ব্যবহার হইতে থাকে। সৈনিকদের মধ্যেও এইজন্য অস্ত্রশিক্ষা, সংগঠন এবং সামূহিক শক্তি-প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা পড়ে; এবং ইহার ফলে সেনাবাহিনীর জন্য নূতন করিয়া নায়কোচিত গুণসম্পন্ন সেনানায়কেরও আবশ্যক হয়। পিতৃসত্তার যুগে, বলিতে পারা যায়, এই সব সৈন্যনেতাদের পাঠশালার শিক্ষা একরূপ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তখন সৈন্যদল গঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিই যে সমাজে নেতৃত্ব করিবার অধিকতর সুবিধা পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। তদুপরি পরস্ব লুণ্ঠনের লাভ ও লোভ * মানুষকে তখন নিত্যই যুদ্ধে ও সমরাভিযানে আকৃষ্ট করিয়া লইতেছিল। বুদ্ধের এক সমসাময়িক রাজার উপাখ্যান হইতে আমরা এই মনোবৃত্তির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিব; বুদ্ধের শিষ্য রাষ্ট্রপাল † কুরুদেশের ‡ রাজা কৌরব্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

"তোমার একজন বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধেয় পুরুষ পূর্বদিশা হইতে আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি পূর্বদিশা হইতে আসিতেছি…সেখানে একটি সমৃদ্ধ জনবহুল দেশ দেখিয়া আসিলাম…তাহাতে অগণিত অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিক…অগণিত গজদন্ত, মৃগচর্ম…এবং অজস্র সুবর্ণ ¶…বহু সুলভ লাবণ্যবতী নারী…মহারাজ, এত সৈনিক হইলে আপনি ঐ দেশ জয় করিতে পারেন…বিজয়ী হউন রাজন্!'—তাহা হইলে তুমি কি কর রাজা?…"

"…আমি তাহাও জয় করিয়া আমার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই।"

---

* তুলসীদাস বলিতেছেন, 'জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ'—অর্থাৎ লাভ যত অধিক হয়, লোভও তত বাড়িয়া যায়; † রট্টপাল সুত্ত (মজ্ঝিমনিকায়, ২৪২); ‡ মেরঠ জিলা; ¶ প্রাকৃতিক ও নির্মিত উভয়বিধ।

রাজা কৌরব্যের উক্তর সামন্ত যুগের চিরঅতৃপ্ত লোভের একটি চমৎকার উদাহরণ। কোন দেশের সঙ্গে শত্রুতা থাকুক বা নাই থাকুক, কিংবা সেই দেশের লোকে কোন অহিত করুক বা নাই করুক—কিন্তু ধন, সুবর্ণ কিংবা সুন্দরী স্ত্রীর অধিকারী হইলে তাহারও নিস্তার নাই। জনযুগেও অবশ্য যুদ্ধ হইত—কিন্তু তাহা প্রায়ই সমগ্র সমাজের স্বরক্ষা ও লাভের জন্য হইত।* রাজা কৌরব্যের মত শুধু পরধন ও পরস্ত্রীর লালসায় তখন কেহ যুদ্ধ করিত না। কিন্তু বৈয়ক্তিক সম্পত্তির বংশানুক্রমিক প্রভাবের পরে লোকনায়কও লোভান্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাই লোভের পূর্তিকর সকল রকমের কাজই সামন্ত সমাজে ন্যায্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। যুদ্ধে বিজয়লাভের ফলে সেনানায়ক তখন শুধু বীরতারই খ্যাতিলাভ করিত না—যুদ্ধজয়ের ফলে তাহাদের ব্যক্তিক সম্পত্তি এবং শাসনাধিকার বৃদ্ধিরও বহু সুবিধা হইত। এই ভাবে সেনানায়ক সামন্তেরা এই যুগে আসিয়া সমগ্র শাসনসূত্রের কর্ণধার হইয়া বসে, এবং পরে এই শাসনক্ষমতাই আনুবংশিক হইয়া সমাজে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। প্রাচীন মিশর, মেসোপোতামিয়া বা সিন্ধুউপত্যকার সভ্যতায়ও পিতৃসত্তা যুগের নায়কেরা † রাজতন্ত্রের স্রষ্টা হয়। কিন্তু পরবর্তী য়ূনানী ‡ ও ভারতীয় এবং সম্ভবত ইরাণী সমাজেও রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র এই দুই ধারায়ই সমাজের বিকাশ হইতে থাকে। ভারতবর্ষের পঞ্জাব, যুক্তপ্রান্ত, এবং বিহারের প্রজাতন্ত্র বা গণ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। ভারতে পুরাতন জাতির সহিত নূতন নিত্য-আগত জাতির মিশ্রণ না হইলে এখানে বর্ণভেদ এত জটিল হইত না; এবং তাহা না হইলে হয়ত বা প্রজাতন্ত্র কিংবা এই গণপরম্পরাও এখানে এত বিস্মৃত হইত না।

---

* অর্থাৎ সেই যুদ্ধের স্বার্থ বৈয়ক্তিক হইত না; † অর্থাৎ পিতৃসত্তা ও দাসতাযুগের সেনানায়কেরা; ‡ গ্রীসীয়।

পূর্ববর্তী অণুচ্ছেদে সামন্ততন্ত্রকে আমরা অনেকটা ব্যাপক অর্থেই ধরিয়া লইয়াছি—ইহাতে ধনতন্ত্রের প্রাক্কালীন রাজতন্ত্রের যেমন স্থান আছে তাহার সমকালীন প্রজাতন্ত্রও ঠিক তেমনই স্থান পাইয়াছে ; কিন্তু রাজতন্ত্রই হউক, আর প্রজাতন্ত্রই হউক—দেশের রাজনীতিক ও সৈনিক শক্তিকে উভয়েই শোষকবর্গের হিতের জন্য ব্যবহার করিয়াছে। সমাজের অক্ষুণ্ণস্বার্থ বর্গের মুখে এইজন্য সামন্ততন্ত্রের এত অজস্র প্রশংসা শোনা যায়—সামন্তযুগ তাহাদের নিকট সত্যই সুবর্ণযুগ ছিল ; কিন্তু আজ সত্যযুগ ও সুবর্ণ যুগের দিন গিয়াছে, তাই শ্বাস টানিয়া ইঁহারা অতীত দিনকে স্মরণ করিয়া শুধু দুঃখিত হন।

সামন্তযুগে মানবসংস্কৃতির প্রকৃত বিকাশ হইয়াছিল—পশ্চাৎবর্তী যুগ হইতে এই সময় বিকাশের বেগও তীব্র ছিল। কিন্তু ইহা নাই বা হইবে কেন ? জীবন তখন শুধু আবশ্যক বস্তুপাতি সংগ্রহ করিতেই ব্যয়িত হইয়া যাইত না। এই কাজের জন্য সামন্তযুগে দাস ও শ্রমিকের ফৌজ সদা মজুত থাকিত। এইভাবে অন্যবর্গের শ্রমসাহায্যে ভদ্রজনের নিকট উৎপাদনশ্রম তখন নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হয়। বস্তুসংগ্রহের * চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া ভদ্রেরা সাহিত্য, কলা, দর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে সময় ও শ্রম নিয়োগ করে। দাস ও শ্রমিকের শ্রমসৃষ্ট সমৃদ্ধির উপর † এইভাবেই সমাজে সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয় ; কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইহাতে দাস বা শ্রমিকের কৃতির কথা ইতিহাস মোটেই স্মরণ রাখে নাই—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে প্রভুর সৃষ্টির গৌরবে শ্রমিকও নিজের বর্গস্বার্থ ভুলিয়া গিয়াছে।

---

* জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক জিনিসপত্র ; † ইহারা নিজে অভুক্ত থাকিয়া এবং বহু ক্রূর যাতনা সহ্য করিয়া সমাজের জন্য ধন সৃষ্টি করিয়াছে ; আর প্রভুবর্গ সেই ধনে সমৃদ্ধ হইয়া সমাজে কলা দর্শন প্রভৃতির সুসমৃদ্ধচর্চা চালাইয়াছে।

মিশরে সেখানকার শাসকদের শরীর এবং আত্মাকে অমর করিবার প্রচেষ্টায়ই কলার প্রথম সূত্রপাত হয়। সামন্তেরা ক্রমে সমাজে দেবতার আসন লাভ করিবার পর তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া ধার্মিক কলাও বিস্তৃতি লাভ করে। সামন্ত যুগের কলা সমাজের বস্তুস্থিতিকে স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রগতিশীল করিবার আদর্শে সৃষ্ট হয় নাই। তখনকার কলাকর্মের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের মূল সমস্যা হইতে মানুষকে ভুলাইয়া রাখা—অর্থাৎ বর্গস্বার্থপূর্ণ সমাজের সমস্ত বিরোধ ও অন্যায়কে লুকাইয়া রাখা! কোন কলাকার, সাহিত্যস্রষ্টা বা দার্শনিক এই আদর্শ না মানিলে তাহার কৃতিকে সমাজ গ্রহণ করিত না—সেই কাব্য, দর্শন ও শিল্পকে অপাংক্তেয় করিয়া তাহা লুপ্ত ও বিস্মৃত করিয়া দেওয়া হইত। সামন্তযুগের কলানায়ক ছিল সামন্ত এবং তাহার নিজেরই বর্গ; এইজন্য ইহার পশ্চাতে সামন্তীয় বর্গস্বার্থ এবং সামন্তবাদের প্রেরণা ক্রিয়াশীল থাকিলে আশ্চর্য কি?

১। বিভিন্ন দেশের সামন্তবাদ

(১) মিশর—মিশরের ইতিহাস হইতে জানা যায় সেখানকার গোষ্ঠীপিতা পিতরেরাই নিজেদের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে সামন্ত শাসকে পরিণত হয়। ইহার পর ধর্মের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টি ইহলোক হইতে সরাইয়া নিয়া পরলোকের দিকে নিবদ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহার ফলে তখন সাধারণ মানুষ সমাজের স্বামী ও শাসকের অন্যায়ের প্রতি উদাসীন হইয়া ন্যায় ও বরপ্রাপ্তির জন্য একমাত্র দেবতার দিকে তাকাইয়া থাকিতে শিখে। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন † মিশরের অন্তর্গত থেবার পুরোহিত রাজারা

† ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ, *Ancient Records of Egypt*—Vol. I, pp. 126—Breastead (1906).

শক্তি ও প্রভাবের দিক দিয়া প্রায় অনন্য হইয়া উঠিয়াছিল। জনসংখ্যা বর্ধন, পরস্বের প্রতি লোভ এবং দেশের অভ্যন্তর আভ্যন্তর ও বাহ্যিক অবস্থার জন্য যুদ্ধজয়ের প্রতিও তখন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। কিন্তু যেখানে পুরোহিত রাজা সেনাসঞ্চালনে সমর্থ ছিল না বলিয়া সেখানকার সেনাচালকেরা ক্রমে সমাজে প্রধান * হইয়া বসে। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে প্রথমত মানুষ ও দেবতার এক অপরূপ সংমিশ্রণ ঘটাইয়া রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনা হইয়াছিল। সেখানকার সমাজের উপর তখন বিশেষ প্রাধান্য ছিল দেশের রাজার—এবং মিশরীয়দের দৃষ্টিতে এই রাজা ছিল দেবঅংশসম্ভূত অর্থাৎ তিনি মানুষ হইয়াও ছিলেন দেবতা। তখনকার মিশরে স্বয়ং রাজা এবং তাহার কয়েকজন সর্দার বা সামন্ত সমগ্র দেশের ভূস্বামী হইত; তাহার ফলে তখন মিশরে জনতার অধিকাংশই হইত দাস কিংবা কর্মী; † আর এইসব দাস, কর্মী ও ভূ-স্বামীর মধ্যে মধ্যম বর্গীয়ের সংখ্যা তখন খুব বেশি ছিল না—সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহা সংখ্যায় যেমন নগণ্য শক্তিতেও তেমনই নগণ্য ছিল। তাই পুরোহিতদের শাসনের সময় পুরোহিত এবং তাহাদের সহায়ক যোদ্ধৃবর্গ ছাড়া অন্যের বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না। সাধারণ—অর্থাৎ কৃষক, মাল্লা, লোহার, বাড়ুই কিংবা বানিয়া বা দাস—ইহাদের সকলের অবস্থাই তখন খারাপ ছিল। এই সব নিপীড়িত মানুষ সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে কখনও কখনও বিদ্রোহও করিয়া বসিত; তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তখন দুই একজন ধার্মিক নেতা কিংবা ভবিষ্যবক্তাও জুটিয়া যাইত, এবং কখনও 'ধর্মাত্মা' হিসাবে পরিচিত দুই একজন রাজাও যে মিলিত না তাহাও নয়। এই সব রাজারা প্রজার সহিত রাজার সম্বন্ধকে পুত্রের

* অর্থাৎ সামন্ত, সামন্তরাজা এবং রাজা; † Serf, কমীন।

সহিত পিতার সম্বন্ধের অনুরূপ বলিয়া প্রচার করিতেন। ২৬২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মিশর হেঙ্কু নামে এইরূপ একজন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। ইতিহাসে হেঙ্কুর সমদৃষ্টি ও ন্যায় সম্পর্কে প্রশংসা আছে—এই হেঙ্কু নিরন্নকে অন্নদান করিতেন এবং নির্বস্ত্রকে বস্ত্র দিতেন—তাঁহার রাজ্যে দাস এবং কর্মীরাও রাজপুরুষের কাজ পাইত। পুরালেখ হইতে জানা যায় হেঙ্কু দুর্বলকে পীড়া দিতেন না—সহায়হীনকে ভীত করিতেন না, তিনি গ্রামীন জনতার পরিপোষক এবং পরম হিতৈষী ছিলেন। কিন্তু তবু হেঙ্কুর রাজত্বে বৈক্তিক সম্পত্তির লোভ কত বড় হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায়।...হেঙ্কু বলিতেছেন: 'মানুষের হৃদয় বড় নির্মম এবং নির্লজ্জ; ইহারা সর্বদাই প্রতিবেশীর সম্পত্তি লুঠিতে চায়...সৎকর্মীর এথানে বিন্দুমাত্র কদর নাই...যে দুষ্কর্ম করে তাহারই প্রভাব...ও প্রতিপত্তি সর্বাপেক্ষা বেশি।'

এই যুগে মিশরের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করিত—কারণ ব্যবসায়পত্রের তখনও খুব বেশি উন্নতি হয় নাই। নীল নদের বন্যা এবং ভূমির বণ্টন ও কর নির্ধারণের জন্য মিশরীয়দের অঙ্কগণিত ও রেখাগণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদে তাহারা বহু নূতন গণিতসূত্রের আবিষ্কার করে, এবং এইভাবে অন্যান্য বহু বিষয়ের মত গণিত বিষয়েও তাহারা পৃথিবীর সভ্য জাতি সমূহের অগ্রণী হয়। ইহা ছাড়া মিশরবাসীরা সর্বপ্রথম অক্ষর অর্থাৎ চিত্রলিপি আবিষ্কার করে; এবং ধর্মবিষয়ক আবিষ্কার উদ্ভাবনেও ‡ তাহারাই পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য হয়। সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ পিতামাতা এবং সমাজের নিকট হইতে দেখিয়া শুনিয়া যাহা শিখিত তাহাই পর্যাপ্ত হইত। কিন্তু জ্ঞানের ভাণ্ডারে বহু জিনিস জমিয়া যাওয়ার পর

‡ দেবতা নির্মাণ, ধর্ম নির্মাণ ইত্যাদি।

এই ভাবের শ্রুতিপাঠ আর সম্ভব হইত না—দেখিয়া শুনিয়া যে যৎসামান্য বিদ্যা আয়ত্ত হইত, তাহা সমাজের প্রয়োজনের কাছে তুচ্ছ হইয়া যাইত। এইজন্য সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিক্ষার জন্যও নূতন রকম বন্দোবস্ত করিতে হয়। সমাজের প্রথম অবস্থায় মানুষের চলা, বলা, ধরা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজের শরীরসঙ্কেত আশ্রয় করিয়া চিত্রকলার বিকাশ ঘটে—তাহার পর এই সব আকৃতিচিত্রের সাহায্য লইয়াই মানুষের ভাষা প্রকাশের জন্য আদিম অক্ষর অর্থাৎ চিত্রলিপির সৃষ্টি হয়। প্রাচীন কালে চীনালিপিও প্রথমতঃ ঠিক এইরূপ ভাবে চিত্রলিপি হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল ; এমন কি এখনও তাহা ধ্বনি বা বর্ণলিপিতে রূপান্তরিত হয় নাই—তবে চীনের প্রাচীন চিত্রলিপিতে ক্রমে এত পরিবর্তন হইয়াছে যে বর্তমান সঙ্কেতলিপি দেখিয়া তাহাতে প্রাচীন চিত্র-ইঙ্গিত আর আবিষ্কার করা যায় না। মিশরে শিক্ষার নানারূপ প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পর তাহা হইতেও শাসক এবং পুরোহিতরাই বেশি লাভবান হয়। তবে ইহা হয়ত সত্য যে চিত্রের ইঙ্গিত থাকার জন্য প্রথম প্রথম মিশরীয় লিপিগুলিকে অধিকাংশ লোকই একরকম বুঝিতে পারিত। কিন্তু সময় অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—এবং ইহার ফলে লিপির প্রাথমিক সরলতা আর অক্ষুণ্ণ থাকিল না ; তাই সাধারণের পক্ষে তখন ইহা বোধের সম্পূর্ণ অগম্য হইয়া গেল। মিশরের পুরোহিত শাসকেরাও বর্তমানকালীন শাসক সম্প্রদায়ের মত জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে চাহিত না—তাহাদের মধ্যে অন্ধকার, অজ্ঞানতা এবং মিথ্যাবিশ্বাস যত বেশি থাকে ততই শাসকের পক্ষে সুবিধা ছিল—কারণ মূর্খকে শাসন করা সোজা, ইহারা কখনও প্রতিবাদ করে না, এবং প্রভুর হালুয়ার হাঁড়িতে ভাগও বসাইতে জানে না।

প্রাচীন মিশরীয় সামন্তবাদ ভৌতিক অর্থাৎ পার্থিব সুখকেই একমাত্র

প্রকৃত ও বাস্তব সুখ বলিয়া জ্ঞান করিত; এইজন্য পুরোহিতদের বহু চেষ্টায়ও সাধারণ মানুষ ইহজীবনের সুখদুঃখ ভুলিয়া গিয়া স্বপ্নস্বর্গকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সম্ভবত পরলোকের জন্য জন্মমৃত্যু উৎসর্গ করিবার মত মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করিতে সমাজের তখনও বাকী ছিল। মিশরীয়দের প্রাচীন ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলিতে আমোদ প্রমোদের বিশেষ প্রকার বন্দোবস্ত হইত—এই সময় নেশা বা শরাবের কোনরূপ দুর্লভতা থাকিত না—তাহার উপর গীত, বাদ্য, নৃত্য সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা থাকিত। মিশরীয় সমাজে সময় কর্তনের জন্য ভারতীয় দাবা-পাশার অনুরূপ গুটিখেলা এবং ব্যসনেরও প্রচলন ছিল। পুর্বেই বলিয়াছি নীল উপত্যকায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপত্তির ভয় বড় বেশি ছিল না—তার উপর জনসংখ্যার পরিপোষণের জন্য কৃষি ও পশুপালন ব্যবস্থাও সেখানে একরূপ পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও দলিতশোষিতকে আয়ত্তে রাখিবার জন্য সেখানে সিপাহী-শাস্ত্রীরও প্রয়োজন হইত; তবে উচ্চতরবর্গেরা ক্রমে বেশি আমোদী হইয়া যাইবার পর এইভাবের অস্ত্রধারী জীবন আর তাহাদের সহ্য হইত না—তখন আপন বর্গ হইতে সৈনিক বা সেনানায়ক নিযুক্ত না করিয়া তাহারা রাজ্যরক্ষার জন্য ভাড়াটিয়া সৈন্য পোষণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথমত এই বৈতনিক সৈনিকেরা প্রভুর দাস অর্থাৎ সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ ছিল—কিন্তু ক্রমে তাহাদের শক্তি এত প্রবল হইয়া পড়ে যে থেবার পুরোহিত শাসন ইহার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া যায়।

প্রাচীন মিশরীয় সমাজের শ্রেণীবিন্যাসেও ঘোরতর বিরোধ ছিল; এইজন্য মধ্যে মধ্যে এই বিরোধের আকস্মিক বিস্ফোট ঘটিলে তাহাও আশ্চর্যের কিছু নয়। ডেলক্রুইক * একটি মিশরীয় পুরালেখ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, প্রাচীন মিশরের দাসেরাও একবার সমগ্র শাসনযন্ত্র

* Delbruick.

হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর ধরিয়া মিশরের শাসক সম্প্রদায় তাহাদের 'দৈবী' অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে। অতীতকালে এইরূপ সমস্ত জন-বিদ্রোহকে শাসক ও পুরোহিতেরা ধর্মবিরোধী ও দৈববিরোধী বলিয়া প্রচার করিত—এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তরবারির জোরে তাহা দমিত করিয়া দিতে তাহাদের অসুবিধা হইত না। এখানে আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমাজের পরিবর্তন-কামীরাও অনেক সময় ঈশ্বর এবং ধর্মের নাম লইয়াই তাহাদের কাজ আরম্ভ করিত। লোদী ও সুর বংশের শাসনকালে * মেঁহদি † তখনকার সামন্তবাদ ও শাহনশাহীর বিরুদ্ধে একপ্রকার সাম্যবাদী মত প্রচার করিতে থাকে। ইহার ফলে সামন্তী সমাজের অত্যাচারিত বর্গের মধ্যে মেঁহদির প্রতিপত্তি ও প্রভাব দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছিল। এমন কি ক্রমে শাহী ফৌজের হাজার হাজার সিপাহীও কাজ ছাড়িয়া দিয়া মেঁহদির অনুগত হইয়া যায়—কিন্তু এইবার বাদশাহ আর আগের মত স্থির ও অবিচলিত থাকিতে পারিলেন না—পূর্বে যাহাকে একটি ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায় ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, এখন তাহারই নিকট হইতে বিপদ আশঙ্কায় তিনি ধৈর্য হারাইলেন। বাদশাহ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুদিন পর মেঁহদিকে তাঁহার নিকট ডাকাইয়া পাঠাইলেন; মেঁহদি চল্লিশ কদম দূর হইতে জমিনের উপর দুইবার ঝুঁকিয়া সিজদা বা কুর্ণিশ বাজাইলেন না—তিনি সোজা বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুসাফার জন্য তাঁহাব হাতেব উপর নিজের হাত রাখিয়া দিলেন। মেঁহদি সত্য সত্যই সকল মানুষকে সমান ভাবিতেন, সেইজন্য মানুষের আর্থিক সাম্যও তাঁহার নিকট ন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাই ধর্মাস্ত্র ধারণ করিয়া মেহদি অকুণ্ঠস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'আমি পৃথিবীর অন্তিম

---

* ১৭-১৬ [illegible]; † জৌনপুরের জনৈক ফকির।

পয়গম্বর মেঁহদি,…সোজা খোদার তরফ হইতে আমি প্রেরিত হইয়াছি,… দুনিয়ার সমস্ত ঝুটা ও অন্যায় দূর করিয়া…এখানে সাম্য ও সমানতার রাজ্য কায়েম করিব।' ইহাতে বাদশাহ নিরুপায় হইয়া মেঁহদির বিরুদ্ধে নরকবাসের ফতোয়া * লইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মেঁহদির প্রভাব তখন এত প্রবল যে শাহী দরবারের মোল্লারা তাঁহার বিরুদ্ধে নরকের ফতোয়া দিলেন না। † এখানে উল্লেখযোগ্য, শোষক বা শাসক প্রথমে যে শোভন আচরণ করে তাহা শুধু দেখাইবার জন্যই—কিন্তু শেষ অবধি উদ্দেশ্যপূরণের ব্যাঘাত হইলে সমস্ত শোভনতা ত্যাগ করিতেও ইহাদের বাধে না। মেঁহদি ও তাঁহার অনুযায়ীদিগকে বাদশাহ কিরূপ নির্দয়ভাবে কতল করাইয়াছিল এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। হইতে পারে ভারতবর্ষে এখনও মেঁহদির অনুযায়ী কিছু কিছু লোক বর্তমান আছে—তবে অন্যান্য দল পূর্বগামীর আত্মদানকে যে ভাবে কাজে লাগায় ‡ ইহারাও তাহা হইতে স্বতন্ত্র নয়।

মিশরীয় সমাজের বিরোধগুলিকে আমরা পাঁচটি পৃথক্ পৃথক্ বিষয় হইতে বুঝিতে পারি ঃ—

(১) সমাজে উচ্চবর্গের কর্তব্য কি, এবং তাহাদের তাহা পালনের উপায়ই বা কি? § (২) মিশরীয় সমাজের বর্গদ্বেষ, অসন্তোষ ও

---

* 'কুফ্রকা ফতোয়া'—ইহা মোল্লাদের সমর্থিত ধার্মিক বহিষ্কার; † ইহার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি কারণও অবশ্য থাকিতে পারে—বাদশাহ তাঁহার দরবারের মোল্লাদের সঙ্গে অত্যন্ত হীন ব্যবহার করিতেন; তাই বাদশাহের প্রতিপত্তিহানিতে মোল্লারা পক্ষান্তরে খুশীই হইতেছিল; ‡ অর্থাৎ ক্রমে তাঁহাদের আত্মদানের মানবকল্যাণ উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহা শুধু দলের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রচারে নিয়োজিত হয়; § উচ্চবর্গ শাসনের ন্যায্য অধিকারী—এই ধারণা এবং তাহা পালনের জন্য শোষণও ন্যায্য—এইরূপ বিশ্বাস।

বিদ্রোহ ; * (৩) আদর্শ রাজা ও শাসক সম্পর্কে বহুবিধ সদ্‌গুণের উল্লেখ ; † (৪) শাসক ও অধিকারীবর্গের স্বার্থে আইন প্রণয়ন ; ‡ এবং সর্বোপরি (৫)' ধর্ম অর্থাৎ ধার্মিক আচার ও প্রচারের সাহায্যে সমাজের পরিবর্তন বন্ধ করা। ¶

(২) ভারত—হিন্দু ভারতের সামন্তকালের দিকে তাকাইলে আমরা পূর্বের প্রায় সকল রকম ব্যাপারই এখানে দেখিতে পাইব। এখানেও মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারেরা দেশের রাজা এবং প্রজার কর্তব্য সম্পর্কে বহু প্রকার বাগ্‌বিস্তার করিয়াছেন। মোটের উপর শাসক এবং রাজার জন্য এখানেও প্রজার কায়িক শ্রম এবং জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ উৎসর্গ করিতে বলা হইয়াছে—কিন্তু প্রজার অধিকারের তালিকায় পরজন্ম বা পরলোকের স্বর্গস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুরই নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। এইভাবে ভারতীয় শাস্ত্রকারও সমাজের অসাম্যকে লেপিয়া মুছিয়া তাহার উপর এক আকর্ষক ধার্মিক আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে। সমাজকে একদেহ পুরুষ কল্পনা করিয়া সমাজের বিভিন্ন বর্গকে তাহার প্রত্যঙ্গ কল্পনা করার উদ্দেশ্য বর্গবিদ্বেষকে নরম করা। এই চেষ্টায় বেদের পুরুষসূক্তে লেখা হইয়াছে—'ব্রাহ্মণ ইহার মুখ, রাজন্য ভুজ, বৈশ্য জঙ্ঘা এবং শূদ্র ইহার পাদস্বরূপ। গীতা প্রভৃতি পরবর্তী গ্রন্থে স্বধর্মে নিধনকে শ্রেয় বলিয়া পুরুষসূক্তের উদ্দেশ্যকেই পাকা করা হইয়াছে।

আর্য ও অনার্যের মধ্যে কে শাসক হইবে ইহার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ পঞ্জাব অঞ্চলেই শেষ হইয়া যায়; তাহার পর গঙ্গাতটে পৌছিতে পৌছিতে

---

* প্রাচীন পুরালেখ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ; † এই সমস্ত গুণের উল্লেখ শুধু তখনকার শাসকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য ; ‡ আইনের আশ্রয়ে তাহাদের লুণ্ঠনকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করা ; ¶ বর্গদ্বেষকে দমিত রাখা এবং বর্গস্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখা।

সমস্ত আর্যভিন্ন জাতিই যুদ্ধের ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া অস্ত্রত্যাগ করে। পরে ধীরে ধীরে শাসকদের স্বার্থ ও আদেশ অনুসারে তাহারা নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হয়। এইজন্য গঙ্গাতটের জীবনযাত্রা তখন যথেষ্ট সমৃদ্ধ থাকিলেও সাধারণ সম্প্রদায়ের তাহাতে বড় লাভ ছিল না : রাজ্যের সকল ঐশ্বর্য সেই সময় পার্থিব শাসক ক্ষত্রিয় এবং দৈবিক শাসক ব্রাহ্মণ—এই দুই সম্প্রদায়ের হস্তগত হইয়া পড়িত। ভারতবর্ষে এই দৈবিক শাসক অর্থাৎ পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ বর্গকে আমরা গঙ্গার উর্বর মৃত্তিকার উপজ বলিতে পারি। এই স্থানে আসিয়া আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইটি পৃথক্ বর্গের সৃষ্টি হইয়াছিল—কিন্তু তখন উভয় বর্গই নিজেদের স্বার্থগত বিরোধের মধ্যে একটি স্থায়ী সমন্বয় করিয়া লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই স্বার্থসমন্বয় পরবর্তী কালেও প্রায় তিন, সাড়ে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতীয় পুরোহিত সম্প্রদায় যে প্রথম প্রথম নিঃস্বার্থ ও ভোগশূন্য জীবন যাপন করিত—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা : বেদ, উপনিষদ্ বা বুদ্ধকালীন যে কোন গ্রন্থ হাতে লইয়া দেখুন,—দেখিবেন কত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র রাজদত্ত অর্থ ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখের সপ্তস্বর্গে অধিষ্ঠান করিতেছেন,—বহু যাজ্ঞবল্ক্য জনকের গোগৃহ হইতে সহস্র স্বর্ণক্ষুরা * গাভী দক্ষিণা লইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন,—এমন কি দেখিবেন, ঋষি আপন পত্নীদ্বয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের চিন্তা করিতে করিতে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। আর বুদ্ধকালীন ভারতে ব্রাহ্মণের 'ভোগশূন্য' জীবন সম্বন্ধে জানিতে হইলে ত্রিপিটক † খুলিয়া চকি, সোনদণ্ড, কুটদন্ত প্রভৃতির ধনসম্পত্তির বিবরণ পড়িয়া দেখুন। ব্রাহ্মণের

* গাভী দান করিবার সময় তাহার শিঙ ও ক্ষুর সোনারূপায় মুড়িয়া দেওয়া হইত ; † মৎকৃত 'বুদ্ধচর্যা' দ্রষ্টব্য (পৃঃ ২২২, ২৩২, ২৪২)—ব্রাহ্মণ-ধম্মিয়-সুত্ত (সুত্তনিপাত ২।৭)।

পুরাতন ও তৎকালীন স্বার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে বুদ্ধ একস্থানে* বলিতেছেন :—

"...রাজার সম্পত্তি—তাহার সালঙ্কারা নারী, উত্তম অশ্বযুক্ত ও চিত্র বিচিত্র এবং সূচীকর্মকৃত রথ, বহুপ্রকোষ্ঠ অট্টালিকা...এই সমস্ত দেখিয়া ব্রাহ্মণের লালসা হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিল, তাহার নিকটও রাজার মত... গবাদি পশু অজস্র হউক, অলঙ্কৃতা স্ত্রী অসংখ্য হউক...এবং মনুষ্যের অন্য ভোগ্যও অপরিমিত হউক। ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র রচনা করিয়া ইক্ষ্বাকু রাজার নিকট গেল—'তুমি প্রভূত ধনধান্যবান্, তোমার বিত্ত অপরিসীম, যজ্ঞ কর।' রাজা অশ্বমেধ, পুরুষমেধ,†, বাজপেয়, নিরর্গল‡ প্রভৃতি যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে বহু বিত্ত দিলেন ..উত্তম অশ্বযুক্ত সুন্দর রথ দিলেন...এবং বহুপ্রকোষ্ঠ অট্টালিকা ধনেধান্যে পূর্ণ করিয়া দিলেন।...ব্রাহ্মণের তৃষ্ণা আরও বাড়িল...মন্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণ আবার ইক্ষ্বাকুর নিকট গেল—'যেমন জল, ভূমি, হিরণ্য...কিংবা ধন বা ধান্য, তেমনি গাভীও মানুষের নিমিত্ত সৃষ্ট...ইহা ভোগবস্তু; রাজা যজ্ঞ কর!...এইবার ব্রাহ্মণের অনুশাসনে রাজা যজ্ঞে বহু সহস্র গোবধ করিলেন।"

অন্যান্য দেশেও পুরোহিত ও শাসকের স্বার্থকে এই একই ভাবে সমন্বিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। সেখানেও রাজারা দান-দক্ষিণা প্রভৃতিরূপে পুরোহিতকে তাঁহাদের ভোগবস্তুর একটা অংশ ছাড়িয়া দিতেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে রাজন্যদের শোষণকে নির্বিরোধ ও ধর্মানুমোদিত রাখিবার জন্য পুরোহিতকে উৎকোচ দান ছাড়া কিছুই নহে। ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের এই স্বার্থসমন্বয় ব্যাপার আরও গভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল—এখানকার রাজারা পুরোহিতকে শুধুমাত্র ভোগসম্পত্তি দান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহারা স্ব-ইচ্ছায় সমাজে নিজেদের স্থানও ব্রাহ্মণের নীচে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

---

* বুদ্ধচর্য্যা, পৃঃ ৩৯৫ ; † যে যজ্ঞের বলি মানুষ ; ‡ সর্বমেধ যজ্ঞ।

(৩) **বাবুল**—বাবুলের প্রাচীন শাসকদের মধ্যে হম্মুরবীর * পূর্বেকার আর কাহারও নাম জানা যায় না। এই সব নানা কারণে হম্মুরবীর ধর্মশাস্ত্রকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলিয়া অনুমান করিতে হয়; ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সুসার † প্রত্নতাত্ত্বিক খননে হম্মুরবীর অনুশাসনের একটা প্রতিলিপি পাওয়া যায়। এই পাথরটির চারিদিকেই লিপি উৎকীর্ণ আছে; এই প্রস্তরলেখের উচ্চতা হইবে আট ফুট, এবং মোট ৩৬০০ পংক্তিতে এই অনুশাসন সমাপ্ত। নীচের দিকে ইহার প্রস্তরভিত্তির পরিধি প্রায় সাত ফুট—অবশ্য উপরের দিকে স্বভাবতই ইহা অপেক্ষা কিছু কম। পেরিসের লুব্রে সংগ্রহালয়ে হম্মুরবীর এই অনুশাসনটি রক্ষিত আছে; এই অনুশাসনের কিছু লেখা অস্পষ্ট হইয়া গেলেও নিনেবে প্রতিলিপি হইতে তাহা অংশত পূর্ণ করিয়া লওয়া যায়।

হম্মুরবী জানিতেন যে সমাজের দলিত শোষিত বর্গের সহিষ্ণুতারও সীমা আছে; এইজন্য শোষকবর্গের আপন কল্যাণেই এই সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে যাওয়া উচিত নয়। বাবুলের শোষক শোষিত উভয়েই তখন প্রায় একই জাতি, ধর্ম ও বর্ণের অনুগত ছিল—কিন্তু তাহা হইলেও এই বর্ণসাম্যের ভিত্তিতে বর্গগত অসাম্যকে তখন চাপিয়া রাখা চলিত না। এইজন্যই হম্মুরবী ব্যবস্থা দিয়াছিলেন ‡—'কোন ব্যক্তি তাহার উচ্চ-বর্গীয়ের 'চক্ষুপীড়ক' হইলে ইহার শাস্তিস্বরূপ তাহাকে নিজের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিতে হইবে।' হম্মুরবীর ন্যায়ই আবার বলিতেছে—'কোন ব্যক্তি তাহার নিম্নবর্গীয়ের 'চক্ষুপীড়ক' হইলে ইহার শাস্তিস্বরূপ তাহাকে এক মীনা রূপা জরিমানা দিতে হইবে।' ইহাতে দেখা যায় হম্মুরবী বর্গবিদ্বেষের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার ন্যায়ের বিধান

---

* হম্মুরবী (২১২৪-২০৮৩ পূঃ); † ইরাণ; ‡ *The Code of Hamburabi*, Section 196 (F. R. Harder, Chicago University Press, 1904).

সকলের জন্য একরূপ করিতে পারেন নাই। হম্মুরবীর অনুশাসন বলিতেছে—'যদি কোন রাজগীর কাহারও জন্য দালান তৈয়ারী করে—কিন্তু তাহা উপযুক্ত পরিমাণ মজবুত না করে, এবং ইহারই ফলে যদি দালান ধ্বসিয়া গিয়া গৃহস্বামীর মৃত্যু হয়—তাহা হইলে রাজগীরেরও মৃত্যু বিহিত হইবে'—এইরূপ, 'যদি দালান ধ্বসিয়া গিয়া গৃহস্বামীর পুত্রের মৃত্যু হয়—তাহা হইলে রাজগীরেরও পুত্রের মৃত্যু বিহিত হইবে'—কিন্তু, 'যদি দালান ধ্বসিয়া গিয়া গৃহস্বামীর কোন দাসের মৃত্যু হয়—তাহা হইলে রাজগীর মৃত দাসের বদলে গৃহস্বামীকে একটি নূতন দাস সংগ্রহ করিয়া দিবে।' হম্মুরবীর বিধানে তাঁহার নিজের বর্গহিতই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য পাইয়াছিল। সেই সময় বাবুলে দাসদাসীরা প্রকৃতপক্ষে প্রভুবর্গের অস্থাবর সম্পত্তি ছিল—এইজন্য তাহাদের শাস্তির বিধানও অন্যান্য বর্গের তুলনায় গুরুতর হইয়াছে ; মোটের উপর হম্মুরবীর দৃষ্টিতে তাঁহার বর্গস্বার্থ প্রথম স্থান পাইত, এবং মানবতা, মানব-হিতৈষণা প্রভৃতি ইহার পরে আসিত।

(৪) চীন : (ক) কনফুসিয়স *—কনফুসিয়স চীনদেশীয় সামন্তবাদের অন্যতম প্রধান, হয়ত বা সর্বপ্রধান পরিপোষক ছিলেন। এইজন্য চীন, কোরিয়া এবং জাপান—এই তিন দেশের শাসকবর্গই কনফুসিয়সের মতকে আজও গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। কনফুসিয়সের সমাজে বর্গব্যবস্থা খুব পাকাপাকি রকমে তৈয়ার করা হইয়াছিল—সমাজপ্রগতির সঙ্গে তখন ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। সেই সময় চীন দেশে শাসক, শিক্ষিত ও কৃষক—এই তিন বর্গ ছিল ; কৃষকের সংখ্যা তখন বর্তমানের সংখ্যা হইতেও অনেক বেশি ছিল বলিয়া মনে হয়। কনফুসিয়স কৃষকদিগকে অজ্ঞান রাখিয়া তাহাদিগকে সমাজের

* ৫৫১-৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ।

উচ্চতর বর্গের অন্ধানুসরণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তারপর কনফুসিয়সের শিক্ষায় পূর্বজ পূজা অতিরিক্ত রকম প্রাধান্য পাইয়াছিল—ইহার উদ্দেশ্য অবশ্য তখন খুবই গভীর ছিল—সমাজের মানুষ এই শিক্ষার প্রভাবে বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া অতীতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিত—ফলে শাসকবর্গের পক্ষে নির্বিচারে ন্যায় অন্যায় কাজ করিয়া যাওয়াও সম্ভব হ'ত।

(খ) মোতী *—মোতী চীনদেশে প্রায় কনফুসিয়সের সমকালীন বিচারকই ছিলেন; তিনি সমাজের বর্গস্বার্থের স্বরূপ বুঝিয়া তাহার প্রতিকারের উপায়ও নির্দেশ করেন। কিন্তু সামন্তস্বার্থের অনুকূল না হওয়ায় মোতীর শিক্ষা দূরদেশে বিস্তৃত হওয়াত দূরের কথা, এমন কি, চীনেও ইহার প্রভাব হইতে জনসাধারণকে তখন মুক্ত করিয়া লওয়ার চেষ্টা হয়। মোতী সমাজের আন্তর বিরোধকে কনফুসিয়সের মত স্বাভাবিক মনে করিয়া তাহাকে চাপিয়া রাখিতে চান নাই, কিংবা লাউত্‌জুর ‡ মত সামন্তবাদের অনুগমন করিয়া মানুষকে প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাইবার জন্যও নির্দেশ দেন নাই। মোতী ঐকান্তিক এবং একনিষ্ঠ ভাবেই সমাজের দুঃখ ও বিরোধের কারণ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন—এইজন্য প্রাচীন সামন্তবাদী চীনের যুদ্ধ, লোভ এবং দুষ্কৃতিকে তিনি কখনও সমর্থন করিতে পারেন নাই। সামাজিক বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে মোতী বলিতেন, ইহারা মানুষের আবশ্যকতার জন্যই সৃষ্ট, তাই কনফুসিয়সের মত ইহাকে শুধু পূজা করা নিরর্থক।

(গ) য়ুনান †—সামন্তবাদীযুগে লিপি, ভাষা, সাহিত্য, কলা—এই সকল বিষয়েই বিশেষরূপ বিকাশ ঘটিয়াছিল; কিন্তু এই বিকাশ হইতে সমাজের সাধারণ মানুষের অবস্থা তখন কি ছিল, তাহা সঠিক বোঝা

---

* ৪৭০–৩৯১ খ্রীঃ পূঃ; ‡ ৬০০ খ্রীঃ পূঃ; † গ্রীস।

যায় না। কারণ সেই সময়ে সমাজের শাসকসম্প্রদায় একরূপ সর্বশক্তিমান হইয়া পড়িয়াছিল—এবং নিজেদের অন্যায় ও অত্যাচারের চিত্র তখন তাহারা সমাজসমক্ষে প্রকাশ করিতে চাহিত না। তাহা হইলেও পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে তখনকার সামাজিক অবস্থা আমরা জানিতে পারিব। সমাজের বিপ্লব-বিদ্রোহ দমনের জন্য দূরদর্শী মহাপুরুষেরা যে সব নীতি প্রচার করিয়াছেন—তাহাই এইক্ষেত্রে আমাদের নিকট পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে বিশেষ সহায়ক হইতে পারে।

অন্যান্য হিন্দীয়ুরোপীয় জাতির মত য়ুনানীরাও প্রথম দিকে নিজেদের গোষ্ঠী বা জনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে চাহিত। এইজন্য পিতৃসত্তার পরে পঞ্জাববিহারের গণতন্ত্রের মত তাহারাও নিজ নিজ অঞ্চলে গোষ্ঠিক ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। তখন য়ুনানী হেল্লা জাতির মধ্যেও এই একই রূপে পিতৃসত্তা যুগ শেষ হইবার পর নূতন জনতন্ত্রতার সৃষ্টি হয়। কৃষি, ব্যবসায় প্রভৃতির জন্য য়ুনানের প্রজাতন্ত্রী নগরগুলি তখন সত্য সত্যই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সমৃদ্ধি কোনরূপেই সমগ্র সমাজের সমৃদ্ধি ছিল না—ধনী-দরিদ্র ও প্রভু-দাসের বর্গভেদ য়ুনানী সমাজে তখন ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল; এইজন্য নগরের সমৃদ্ধি সাধারণ মানুষের শ্রমের উপজ হইলেও ইহাতে তাহাদের অংশ ছিল না। এই সব কারণে হেল্লাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বর্গবিদ্বেষ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠে—লাইকর্গস্ * ইহা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক শিশু রাজ্যের চোখে সমান বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার মতে শিশুদের শিক্ষা দীক্ষার ভার ব্যক্তির উপর না হইয়া রাজ্যের উপর ন্যস্ত হইবে, এবং রাজ্যই সমভাবে সমাজের সকল শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। দার্শনিক অনাথিমন্দর † এবং কবি থেবজনিস ‡ পরবর্তীকালে লাইকর্গসের এই

* ৯০০ খ্রীঃ পূঃ; † Anaximander; ‡ Theogenes of Rhegium.

বিচার সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যৈক্তিক সম্পত্তি সমাজের প্রকৃতিই যেখানে বদলাইয়া ফেলিয়াছিল—সেইখানে শিশুর শিক্ষাদীক্ষা বা তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে সাম্যবাদ চলিবে কি করিয়া ?

(ক) সোলোন *—সোলোনের সময়ে শ্রেণীবিদ্বেষ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে উচ্চতর বর্গেরা হেল্লাদের নিকট হইতে কোন সময় বিদ্রোহের আশঙ্কা করিতেছিল। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান হইতে উত্তমর্ণের নিকট দেনদারকে স্বয়ং বিক্রীত হইবার কথা আমরা শুনিয়াছি ·· সোলোনের সময়ও ঋণ আদায় করিতে না পারিলে অধমর্ণকে স্বয়ং বিক্রীত হইয়া মহাজনের দাস হইতে হইত। অবশ্য সোলোন শেষ পর্যন্ত নিজে উদ্যোগী হইয়া এই কুপ্রথা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা হইলেও ব্যৈক্তিক সম্পত্তির ফলে সমাজে দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল ; তাই ঋণের দায়ে অধমর্ণকে ক্রয় করিতে না পারিলেও মহাজনেরা তাহাদের ক্ষেত থামার কাড়িয়া লইতে লাগিল। সোলোন দেখিলেন, দীন নিরাশ্রয়ের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে ইহারা মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া যে কোন সময় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। এইবার সোলোন একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া প্রত্যেকের ভূমির পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া দিলেন। সোলোনের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের বিধান অবশ্য তখনকার সমাজবিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্যই নির্মিত হইয়াছিল—কিন্তু তাহা হইলেও বর্তমান যুগের 'জনতন্ত্রবাদী' শাসকদের কাছে সোলোনের সম্পত্তিবিধানও তিক্ত বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এথেন্সের রাজশক্তিও বর্তমানকার জনতন্ত্রের মত † জনতাকে এত কাবুতে রাখিতে পারে নাই।

---

* ৫৯০ খ্রীঃ পূঃ ; † জনতন্ত্রী ইংলণ্ড আমেরিকা।

(খ) সক্রেতিস *—সোলোনের বর্গসমন্বয় প্রচেষ্টায় জনসাধারণ নিশ্চয়ই কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছিল—কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থের সমাজে এই প্রভাবও বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। সোলোন সমাজব্যাধির মূল উৎপাটন না করিয়া তাহার পত্র ছেদন করিতে গিয়াছিলেন—এইজন্য সমাজকে সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। পরবর্তী সময়ে সক্রেতিস এই দিক্ দিয়া সোলোন অপেক্ষা আরও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেন :—সক্রেতিস মূলত দার্শনিক হইলেও তাঁহার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামত শুনিয়া শাসকবর্গ বিচলিত হইয়াছিলেন। সক্রেতিসের মতবাদ অনেকটা তাঁহার শিষ্য প্লেটোর মতবাদেরই অনুরূপ—তবে প্লেটো সক্রেতিস অপেক্ষাও এই বিষয়ে অধিক প্রগতিশীল ছিলেন। যাহাই হউক, সক্রেতিসের মতবাদে শাসকবর্গ যে কত ভীত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে বিষ দিয়া হত্যা করিবার ব্যাপারেই বোঝা যায়। সক্রেতিসের বিরুদ্ধে শাসকদের অভিযোগ ছিল—তিনি তরুণদিগকে বিপথগামী করেন; এবং আর একটি অপবাদ এই—তিনি দেবধর্মের বিরোধী প্রচার করেন। আজও সমাজের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে শাসকবর্গের কোপভাজন হইতে হয়; তাই দেখিতেছি, প্রাচীন এথেন্সের সমাজ হইতে বর্তমান সমাজ এই বিষয়ে বেশি অগ্রসর হয় নাই—আর ফ্যাসিষ্ট শাসকরা ত এথেন্সকে ছাড়াইয়া আরও বহু বহু দূর পিছনে চলিয়া গিয়াছে—এমন কি আদিম নরভোজী সমাজের সঙ্গে তুলনা করিলেও ফ্যাসিষ্ট ক্রূরতার ঠিক উপমা হয় না।

(গ) প্লেটোর † স্বপ্নরাজ্য—প্লেটোর বিচারের উপর তাঁহার দার্শনিক মতগুরু সক্রেতিসের স্পষ্টতই যথেষ্ট প্রভাব ছিল—ইহা ছাড়া

* ৪৬৯-৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ ; ৪২৭-৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ।

গুরুর প্রতি তৎকালীন শাসকদের ক্রুর আচরণ হইতেও তিনি গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সক্রেতিস নিজে অবশ্য কোন পুস্তক প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই—তাই অন্যের, বিশেষত প্লেটোর, গ্রন্থাদি হইতে তাঁহার মত ও বিচারের পরিচয় লইতে হয়। প্লেটো এথেন্সের সমাজবিন্যাসের আভ্যন্তরীণ অন্যায় ও ত্রুটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তখন এথেন্সের শাসক নির্বাচন করিবার সময় জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করিবার রীতি ছিল; কিন্তু প্লেটো শাসক সম্প্রদায়ের ত্রুটির সঙ্গে এই জনসন্তাক রীতিকেও নিন্দনীয় বিবেচনা করেন। তিনি পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র বা প্রজাতান্ত্রিক শাসনের প্রচলন সম্পর্কে কোন আশা পোষণ করিতেন না। এইজন্য সমাজের উপযোগী শাসনবিধান নির্মাণ না করিয়া তিনি তাঁহার দর্শনের মতই নভোচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্লেটোর দর্শনে দুইটি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন জগত আছে: তাঁহার একটি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল, এবং তাহা বস্তুজগত কিংবা ভৌতিক জগত; কিন্তু অপরটি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল, অর্থাৎ সেই জগত নিত্য এবং একরস। প্লেটো তাঁহার একরস নিত্য জগতকে বস্তু জগতের উর্ধ্বে স্থাপনা করিয়া তাহাকে 'বিজ্ঞানময়' আখ্যা দিয়াছেন।

এখানে লক্ষণীয় প্লেটো সমাজআদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করিতে গিয়াও তাঁহার অবাস্তব জগতকে ভুলিতে পারেন নাই। সমাজের ত্রুটি এবং তাহার নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিতে করিতেও তিনি কল্পলোকে ঘুরিয়া মরিয়াছেন। তাঁহার সমাজবিধানও এই কারণেই লৌকিক সমাজের উপযোগী না হইয়া এক স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা হইয়া রহিয়াছে। প্লেটোর আদর্শ সমাজেও বর্গ আছে, সেখানে বর্গের সংখ্যা মোট তিনটি; ইহার প্রথমটি 'সত্য সংরক্ষক' বা শাসক, এবং দ্বিতীয়টি 'শাসন-সহায়ক' বা যোদ্ধা, এবং সর্বশেষে তৃতীয়টি 'শিল্প সঞ্চালক' অর্থাৎ কৃষক

ও শ্রমজীবী প্রভৃতি। বেদের পুরুষসূক্তের মত * প্লেটোও দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন বর্গের তুলনা করিয়াছেন; এবং তিনিও ভারতীয় শাস্ত্রকারের মত প্রত্যেক বর্গকে আপন আপন কর্তব্যে নিযুক্ত থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন। প্লেটোর বিধান মতে তাঁহার বর্গ-ব্যবস্থাও তাঁহার দর্শনের একরস জগতের মতই নিত্য, অর্থাৎ তাঁহার এই ত্রিবর্গ আবহমান কাল ধরিয়া সমাজে বিরাজ করিতে থাকিবে, ইহাতে কোন পরিবর্তন চলিবে না। যাহাই হউক, প্লেটো তাঁহার ত্রিবর্গের শ্রমবিভাগ সম্পর্কে এইরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন—(১) সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শিল্পী ও কৃষকেরা নিজের ক্ষেত খামার ও শিল্পের জন্য শ্রম করিবে; অক্ষর পরিচয়ের অতিরিক্ত তাহাদের আর কোনও বিশেষ শিক্ষাদি লাভের প্রয়োজন নাই; তারপর, শাসক নির্বাচন বা শাসন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই ইহাদের কোন প্রকার হাত থাকিবে না। (২) যোদ্ধার কর্তব্য হইবে দেশের শান্তি ও সমাজব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখা, এবং প্রয়োজন হইলে বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা। জনসংখ্যা বাড়িলে নূতন ভূমির জন্যও আবার যুদ্ধ আবশ্যক হইতে পারে—কিন্তু এইজন্য আক্রমণাত্মক এবং রক্ষাত্মক দুই প্রকার যুদ্ধেই যোদ্ধাকে অভ্যস্ত হইতে হইবে। যোদ্ধারা যাহাতে এই সব কর্তব্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়, এইজন্য তাহাদিগকে খুব ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে; কিন্তু যোদ্ধার শিক্ষা এইরূপ হইবে—যাহাতে সে অস্ত্রচালনায় নিপুণ হয়, যাহাতে সে নির্ভয় হয়, এবং প্রয়োজন মত নির্দয়ও হয়। (৩) শাসককে সর্বদাই শিক্ষিত ও উচ্চ বংশজাত হইতে হইবে—'সত্য-সংরক্ষণ' বিষয়ে তাহার যোগ্যতা থাকা চাই; ইহার উপর দর্শন এবং কলাদি শাস্ত্রেও তাহার অধিকার দরকার; শাসক কখনও স্বার্থী, বিলাসী বা মদ্যপ হইবে না, অহম্মন্যতা শাসকের পক্ষে সম্পূর্ণ

* ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিষিদ্ধ ; শাসক সর্বদা সমাজের হিতকামী হইবে—রাজ্যের অহিতকর সমস্ত কর্ম শাসকের পক্ষে নিন্দনীয়।

প্লেটো তাঁহার শাসকদের শিক্ষার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালীও নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন :—এই প্রণালী অনুসারে ভাবী শাসককে সর্বপ্রথম সাধারণ শিক্ষায় নিযুক্ত করা হইবে, বিশ বৎসর বয়সে শাসক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহার বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ হইবে ; বিশেষ শিক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জ্যোতিস্তত্ত্ব, অঙ্ক-গণিত ও রেখাগণিতের চর্চা চলিতে থাকিবে—তাহার পর ত্রিশ বৎসর বয়সে বিশেষ শিক্ষার ব্যুৎপত্তি বুঝিবার জন্য শাসকের আবার পরীক্ষা হইবে ; এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শাসককে একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর দর্শন অধ্যয়ন করিতে হইবে—অবশ্য এখানে স্মরণীয় যে এই দর্শন প্লেটোর 'বিজ্ঞানময়' জগতের দর্শন, ইহার সহায়তায় শাসক প্লেটোর মতই স্বপ্নাশ্রয়ী হইতে পারিবে।

এইভাবে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শাসকের সত্যকার সার্ব-জনিক জীবন আরম্ভ হইবে—এবং তখন হইতে তিনি সমাজের 'সাধারণ অধিকারী' হিসাবে পরিগণিত হইবেন। এই সময়ও তাঁহাকে তাঁহার সিদ্ধান্তিক শিক্ষা সম্পর্কিত পরীক্ষা * দিতে হইবে ; ইহার সঙ্গে সঙ্গে তখন তাঁহাকে বিবিধ প্রলোভনে অবিচলিত থাকিতেও অভ্যস্ত হইতে হইবে। ইহার পর 'নাগরিক অধিকারী' হইবার জন্য শাসককে আরও কয়েক বৎসর অনবরত পরীক্ষা দিতে হইবে—এবং সর্বান্তে আরও তিন প্রকারের অন্তিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শাসক পদবাচ্য হইবেন। এই সর্বশেষ পরীক্ষাগুলির প্রথমটি হইবে তর্কসম্বন্ধী—এই পরীক্ষায় সেবাই যে প্রত্যেক ব্যক্তির,

* এখন হইতে সমস্ত পরীক্ষাই পূর্বার্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে, অর্থাৎ শাসক 'সাধারণ অধিকারী' হইবার পর সমস্ত পরীক্ষাই ব্যবহারিক পরীক্ষা।

বিশেষত শাসকদের পক্ষে প্রধান কর্তব্য—তাহা যুক্তি দিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষা শাসকের মতবাদের নির্ভীকতা সম্পর্কে—ইহার প্রয়োজন এই যে নিরপেক্ষভাবে মত ব্যক্ত করিলে, কিংবা তাহাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলে উচ্চবর্গের সঙ্গে শাসকের বিরোধিতার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যিনি শাসক হইবেন তাঁহার এই বিরোধিতা জয় করিয়া যাওয়ার ক্ষমতাও থাকা চাই। তারপর তৃতীয় পরীক্ষা শাসকের শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের বিষয় লইয়া—শাসক এই ক্ষেত্রে সমস্ত কায়িক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া 'সমাজ সংরক্ষক' পদের জন্য তিনি কত উপযুক্ত তাহা প্রমাণ করিবেন।

কিন্তু সংরক্ষকের পদ পাইবার পরও শাসক প্রলোভনের শিকার হইয়া পড়িতে পারেন। * এইজন্য প্লেটোর বিধান হইল সামান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া শাসকের আর কোনরূপ ব্যক্তিক সম্পত্তি থাকিবে না। এমন কি সংরক্ষকদের বাসের জন্য কোন ব্যক্তিগত ঘরবাড়ীরও বন্দোবস্ত হইবে না—রাজ্যের সকল সংরক্ষক একস্থানে বাস করিবেন এবং একসঙ্গে আহার করিবেন। রাজ্য হইতে তাঁহারা খরচপত্র নির্বাহের জন্য একটি নির্ধারিত মাসোহারা পাইবেন—কিন্তু কোনক্রমেই এই মাসোহারার অতিরিক্ত অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শাসকের পক্ষে স্বর্ণরৌপ্যের কোন ভূষণ ত দূরের কথা, সোনারূপা স্পর্শ করাও তাঁহাদের পক্ষে পাপ। † শাসক

* এমন কি তখন তাহার সম্ভাবনা আরও বেশি, তুলসীদাস এই সম্পর্কে বলিতেছেন, 'প্রভুতা পাই কাহি মদ নাহী'—অর্থাৎ প্রভুতা পাইলে কে না মত্ত হয়। † সংরক্ষকদের জন্য নির্ধারিত এইরূপ আর্থিক সাম্যবাদ বুদ্ধমতের অনেকটা অনুরূপ, বুদ্ধও ভিক্ষুদিগকে সোনারূপা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; এবং সর্বপ্রকার ব্যাপার-ব্যবসায় এবং মুদ্রাদির ব্যবহার বর্জিত করিয়া দিয়াছেন (মৎকৃত বিনয় পিটক দ্রষ্টব্য—পৃঃ ১৯, ৫০)।

ভাবিবেন যে তিনি স্বয়ং ঐশ্বরিক স্বর্ণরৌপ্যে * গঠিত হইয়াছেন— তাই তুচ্ছ সাংসারিক সোনাচাঁদিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্লেটো শাসককে দিয়া শুধু কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই— তাঁহার লক্ষ্য আরও দূরপ্রসারী—অর্থাৎ তাঁহার মতে কাঞ্চনের মত কামিনীতেও শাসকের কোন বৈ্যক্তিক অধিকার থাকিবে না। শাসক বিবাহ করিলে তাঁহার স্ত্রীর উপর সকল শাসকেরই সমন্বিত অধিকার থাকিবে। † প্লেটোর সমকালীন প্রজাতন্ত্রী শাসকেরা নিজেদের বৈ্যক্তিক সুখভোগের জন্য কোন অন্যায় করিতেই দ্বিধা করিত না। নিজের পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের সুখের জন্য তাহারা নিম্নতর বর্গের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। প্লেটো এই অত্যাচার ও অবিচার দমন করিবার জন্যই তাঁহার আদর্শ সমাজের শাসকদের পালনীয় নীতিগুলিকে কঠোর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্লেটোর সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন এই যে, এথেন্সের প্রজাতন্ত্রী নাগরিক তাহাদের শাসক নির্বাচন ক্ষমতা ‡ বিসর্জন দিয়া স্বেচ্ছায় সমাজের নিম্নবর্গে স্থান লইবে কেন? এই সম্পর্কে প্লেটোর উত্তর হইতেছে—সাধারণ নাগরিকদিগকে ইহার উপযুক্ত হইবার জন্য শিক্ষা দাও, এবং এইভাবে ক্রমে জনসম্মতিকে তোমার স্বপক্ষে আনয়ন কর; তাহাদিগকে অবিরত বল, সমস্ত নাগরিক সেই ধরিত্রী মাতারই সন্তান § —ইহাতে মানুষ যে জন্মত একই প্রাণী তাহা তাহারা সহজেই বুঝিবে— কিন্তু ইহার সঙ্গে আবার এই কথাও বলিতে হইবে, ধরিত্রী মাতা সকলকে এক উপাদানে নির্মাণ করেন নাই—অর্থাৎ ভিন্ন বর্গের মানুষে

---

* ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; † অর্থাৎ শাসকদের জন্য প্লেটো আদিম যূথবিবাহের পুনঃপ্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন; ‡ অনেক ক্ষেত্রে শাসক পরিবর্তনের ক্ষমতাও; § অর্থাৎ মানুষের দেহের মূল উপাদান মাটি, ইহা সকল বর্গের মানুষের মধ্যেই আছে—এই হিসাবে জন্মত, কিংবা বলিতে পারি মূলত, মানুষ এক।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর মিশাল দিয়াছেন; আর যাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে মাটির সঙ্গে * সোনা মিশান হইয়াছে—তাহারাই শাসন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়—ইহারাই সমাজের শাসক বা 'সত্য সংরক্ষক'; আর যাহাদেব শরীরে ধরিত্রী মাতা রূপা মিশাল দিয়াছেন—তাহারা সমাজের যোদ্ধা বা 'শাসন সহায়ক' হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ মানুষকে সৃষ্টি করিবার সময় সোনারূপার বদলে লোহা ও পিতল মিশান হইয়াছে—এইজন্য তাহারা শুধু শিল্পীই হইতে পারে, অর্থাৎ শারীরিক শ্রম ছাড়া তাহাদের আর অন্য কিছুরই যোগ্যতা নাই। কিন্তু প্লেটোর এই উত্তরের পরও আবার এক প্রশ্ন থাকিয়া যায়—সাধারণ মানুষ এই উদ্ভট উপাখ্যানে বিশ্বাস করিয়া নিম্নতর বর্গে যাইতে স্বীকৃত হইবে কেন? এই প্রশ্নের খণ্ডনে প্লেটোর নিজের চরম উত্তর হইতেছে—শিশুকাল হইতে মানুষকে এই স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহ-পিত্তলের উপাখ্যানটি শুনাও—তাহা হইলেই তাহারা আমার আদর্শ সমাজের বর্গবিন্যাস মানিয়া লইবে। প্লেটো দেখিয়াছিলেন এথেন্স-বাসীরা ধর্ম ও দেবতা বিষয়ক বহু অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করে †—শিশুকাল হইতে শুনিতে শুনিতে এই সব কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে তাহারা আর সন্দেহ করে না। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়, প্রোপাগাণ্ডা শুধুমাত্র আধুনিক সমাজেরই একচেটিয়া বিশেষতা নয়, দার্শনিক প্লেটোও মিথ্যাকে সত্য করিবার কৌশল চমৎকারই জানিতেন—এবং তাহার মূল্যও আধুনিক কূটনীতিকের মতই তিনি সম্যক উপলব্ধি করিতেন; তবে প্লেটোর এই জ্ঞান সেই সময়ের এথেন্সীয় সমাজ-বীক্ষণেরই যে ফল তাহাও ভুলিলে চলিবে না।

---

* অর্থাৎ মূল উপাদানের সঙ্গে; † ভাবতবষে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও এখন পর্যন্ত ধর্মসংক্রান্ত বহু অলৌকিক কাহিনীই বিশ্বাস করেন।

প্লেটো অন্যান্য কাজের সঙ্গে সমাজের শিশুদিগকে ধাতু অনুসারে বর্গীকরণের ভারও শাসকদের উপরই দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে লৌহপিত্তল বর্গের শিশুও অনেক স্থলে প্রতিভাবান্ হয়—এবং স্বর্ণরৌপ্যের বংশজাত সন্তান নিম্নতর বর্গের গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। হিন্দুদের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা হইতে এই দিক্ দিয়া প্লেটোর মত অবশ্য অনেক গুণে উদার—কারণ তিনি মানুষের গুণকে কখনও বংশগত বলিয়া স্বীকার করিতেন না—তাঁহার সমাজে প্রতিভা থাকিলে নিম্ন বর্গের শিশুও উচ্চতর বর্গের অধিকার পাইতে পারিত। তবে বর্গসংস্থানের দিক্ হইতে প্লেটোর এই সংরক্ষকেরাও হিন্দুব্যবস্থার ব্রাহ্মণেরই মত—এবং তাঁহার সহায়কেরাও এই দিক্ দিয়া ক্ষত্রিয় এবং শিল্পীরা বৈশ্যবর্গেরই অনুরূপ। প্লেটোর বর্গবিন্যাসে অপর বিশেষত্ব হইতেছে যে তাহাতে দাসদের কোন প্রকার স্থান নাই; বস্তুত পক্ষে প্লেটো দাসদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হউক ইহা কামনাও করিতেন না। বুদ্ধিবলহীন শিশু তাই প্লেটোর মতে সমাজের ভার স্বরূপ বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল; যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের শক্তি বা সময় ইহাদের জন্য অপব্যয়িত হয়—ইহা প্লেটো তেমন চাহিতেন না। তাই 'আদর্শ রাষ্ট্রের' কল্যাণে ইহাদের অন্ন কাড়িয়া লওয়ার বিধান দিতেও * প্লেটোর কোন কুণ্ঠা হয় নাই।

প্লেটো ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতা † এই দুই অবস্থাকেই সমাজের পক্ষে হানিকর বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, দরিদ্রতা মানুষকে নীচতা শিখায়, এবং ধনাঢ্যতাও সেইরূপ ব্যসন ও আসক্তির সৃষ্টি করে। তাঁহার সমকালীন ধনিক সম্প্রদায় সম্পর্কে প্লেটো লিখিয়াছেন, 'রাজ্যকে সম্পত্তির আধারের উপর স্থাপিত করিলে,

* অবশ্য প্লেটো ইহা কৌশলে, লোকদৃষ্টির অন্তরালে, ধীরে-ধীরে করিতে নির্দেশ দিয়াছেন; † অর্থাৎ অতি ধনাঢ্যতা ও অতি দরিদ্রতা।

অধিকার ধনীদের হাতে চলিয়া যায়; ইহাতে সকল সৎকর্মের মত দরিদ্রেরা ধনীর নিকট হইতে শুধু উপেক্ষাই পাইতে পারে। কিন্তু রাজ্যে কোন আকস্মিক সঙ্কট আসিলে এই নিম্নবিত্তেরা তখন আর ধনীর ঘৃণার পাত্র থাকে না—এই সময় দরিদ্রদিগকে ধনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই তাহার উচ্চবর্গের স্বার্থে নিজের জীবনপাত করিতে হয়।...এথেন্সের জনসত্তাকতার ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট স্বরূপ হয়ত আর কিছুই নাই'...ইহার পর প্লেটো তাঁহার পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখি দরিদ্রই ধনীর তুলনায় সর্বত্র অধিক রণক্ষমতার পরিচয় দিতেছে, আর ধনী সূর্যস্পর্শ-মুক্ত মেদভার লইয়া কিছুতেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না।' প্লেটো ধনিক বর্গের প্রসঙ্গ আলোচনায় ইহাও বলিয়াছেন, 'সমাজে বহু ব্যক্তিই অন্যে তাহার ধন কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে না বলিয়াই শুধু ধনী হইয়া রহিয়াছে'—অর্থাৎ প্লেটোর মতে জনসত্তাক এথেন্সের ধনী বর্গের ধনী হইবার মত কোনরূপ সদ্‌গুণই বর্তমান ছিল না। প্লেটো দারিদ্র্যের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনটি বিষয়ে অবহিত হইবার নির্দেশ দিয়াছেন—(১) উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, কিংবা (২) কুশিক্ষা বা কুব্যবস্থা, এবং সর্বশেষে (৩) অন্যায় সামাজিক নিয়ম ও অন্যায় রাজ্যবিধান। ইহা ছাড়া দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য প্লেটো তাঁহার 'আদর্শ সমাজে' প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির একটি নিম্নতম পরিমাণও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহার পর ব্যক্তি তাহাকে তাহার সুবিধামত চতুর্গুণ বর্ধিত করিয়া লইলেও রাষ্ট্র কোন আপত্তি করিবে না—তবে তখন তাহার পূব সম্পত্তির উপব শতে শত হারে কর ধার্য করিয়া পুরাতন আয় হইতে তাহাকে রক্ষিত করা হইবে। দায়ভাগ সম্পর্কে প্লেটো বলিতেন, সন্তানকে পিতামাতা কোনরূপ সম্পত্তি দিয়া যাইবার

প্রয়োজন নাই—তাহারা তাহাকে শুধু যশ ও সম্মান দিয়া গেলেই রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্লেটো এথেন্সের জনসত্তাক শাসনেব মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না; এথেন্সের জনতন্ত্র তাঁহার গুরুকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছিল—ইহা তিনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। বৈ্যক্তিক সম্পত্তির বলে শাসক যে লোভী ও ন্যায়ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে ইহা অবশ্য প্লেটো স্বীকার করিতেন—কিন্তু শুধু ইহার জন্য সাধারণ জনতার হাতে শাসন ছাড়িয়া দিতেও তিনি স্বীকৃত ছিলেন না। জনতার শাসন সম্পর্কিত যোগ্যতার উপর প্লেটোর প্রকৃত-পক্ষে ঘোরতর অবিশ্বাস ছিল; তিনি সমাজকে বহু ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র বলিয়া মনে করিতেন—তাই ব্যক্তির নিজস্ব ব্যবহার ও সমাজগত ব্যবহারে যে ভেদ আছে তাহা তিনি বুঝিতেন না—অর্থাৎ ব্যক্তির পৃথক্ নির্ণয় ও সামাজিক নির্ণয়ের পার্থক্য তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল; আর এই কারণেই প্লেটো এথেন্সের জনসত্তাক শাসন পরিবর্তন করিয়া ইহার স্থলে পিতৃসত্তার বিধান চালাইতে চাহিয়াছিলেন। যুনানী সমাজে পিতৃসত্তাকাল অবশ্য ইহার বহু পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু তাহা হইলেও প্লেটোর সময় ইহার স্মৃতিও যে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল এইরূপ মনে হয় না।

(৬) মধ্যকালীন য়ুরোপ—মধ্যকালীন য়ুরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় খ্রীষ্টীয় পুরোহিতেরা তখন সমাজে প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন; অথচ খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর রোমের দরিদ্রদের প্রতি ইঁহাদের যে সহানুভূতি দেখা গিয়াছিল তখন তাহার অবশিষ্টও আর বর্তমান ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দে খ্রীষ্টবাদ সমগ্র য়ুরোপে সামন্তবাদের অন্যতম প্রধান শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। *

---

* ইহার ফলে দরিদ্রেরা ধার্মিক ক্ষেত্র হইতে তখন সহজেই ও স্বভাবতই

রোম রাজ্যের পতনের সময় একদিন অবশ্য দেখা গিয়াছিল খ্রীষ্টবাদ সম্পত্তিকে ধিক্কারই দেয়; কিন্তু সামন্তশক্তি লাভ করিবার পর মধ্যযুগে আসিয়া সম্পত্তিই তাহার সর্বপ্রধান কাম্য হইয়া উঠে। পূর্বে সমাজ হইতে দারিদ্র্য দূর করা খ্রীষ্টপন্থীদের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত—আর এখন ধর্মের নূতন ব্যাখ্যায় সেই দারিদ্র্যই নিঃসঙ্কোচে ভগবানের দান বলিয়া গৃহীত হইল; তবে অবশ্য দরিদ্রের জন্য যৎসামান্য উঞ্ছ, ভুক্তাবশেষ কিংবা মুষ্টিভিক্ষার বিধান করিতে খ্রীষ্টসমাজ কার্পণ্য করে নাই—কারণ, এইটুকু না হইলে সমাজের ধনীদিগকেও তাহাদের পুণ্যার্জনের সুযোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত করা হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সমাজ বিশেষ করিয়া কৃষির উপর ব্যবস্থিত ছিল। সেই সমাজে মূলত সামন্ত, মোহান্ত এবং কৃষক এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ বর্গ দেখা যাইত। ইহার মধ্যে সামন্তেরা শাসক, সেনানায়ক এবং স্বয়ং ভূমির কর্তা হইত; আর মোহান্তেরা তখন হইত এই সব সামন্তেরই অধীনস্থ প্রজা, বা মঠের সম্পত্তি কবলিত করিতে পারিলে খোদ সামন্তই হইয়া বসিত। বলা বাহুল্য, কৃষকের অবস্থা এই সময়ে খুব খারাপই ছিল, কারণ তাহারা তখন সমাজের সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত বর্গ—নিজের কায়িক শ্রমে ধন উৎপাদন করিয়া ইহারা প্রভু সামন্ত ও মোহান্তের উদর পূরণ করিত। ইহার পরিণামে আমীর বা সামন্তের নিকট হইতে ইহাদের ঘৃণার অতিরিক্ত অবশ্য কিছুই জুটিত না—শক্তিধর দেবতা ও মানুষের সম্মিলিত বলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা তখনও তাহাদের ছিল না। কৃষক তখন সম্পূর্ণভাবেই তাহাদের সামন্ত ও

বিতাড়িত হয়, এবং ধর্মসংশ্লিষ্ট শক্তি ও সম্পত্তি সমুদয়ই খ্রীষ্টীয় মঠের মোহান্তদের হাতে চলিয়া যায়।

মোহান্ত প্রভুদের অর্থদাস ছিল—অর্থের বিনিময়ে সে তাহাদের নিকট নিজের প্রাণ বেচিত, মান বেচিত। সমাজের নিম্নবর্গের মধ্যে তখন কৃষক ছাড়া আর একটি ক্ষুদ্র বর্গেরও সৃষ্টি হইতেছিল—ইহারা হইতেছে মধ্য যুগের নবজাত কারিগর ও ব্যবসায়ীর দল। নিজেদের পেশার বিষয়ে ইহারা অন্য কোন বর্গেরই বিশেষ এলেক্কা রাখিত না; ব্যবসায় সংক্রান্ত কলহাদি * মিটাইবার জন্য ইহারা নিজেদের সংঘ অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ তৈয়ার করিয়া লইয়াছিল—সামন্তের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে ইহারা স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইত—ইহাতে তাহাদের তেমন বিশেষ কোন অসুবিধা যে হইত তাহা নহে, কারণ ব্যবসায়ী ও কারিগরের তখন সকল দিকেই খুব কদর ছিল, আর ভূসম্পত্তি না থাকায় পিছনের আকর্ষণও তাহাদের তেমন কিছু প্রবল ছিল না।

মধ্যকালীন য়ুরোপে এইরূপ সামাজিক বর্গপার্থক্য প্রকৃতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সামন্ত মোহান্তের ভব্য প্রাসাদ ও গীর্জার পাশে কৃষকের দারিদ্র্যকে তখন আর উপেক্ষা করা যাইতেছিল না। দয়া-ধর্মের ধ্বজাবাহী খ্রীষ্টীয় যাজকদের মধ্যেও এই অবস্থা কেহ কেহ উপলব্ধি করিতেছিলেন—সন্ত ফ্রান্সিস অসীসী † প্রমুখ কয়েকজন সাধু তাই মঠের নিশ্চিন্ত জীবন ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন—এইরূপ সন্ত মোহান্তের সংখ্যা অবশ্য অঙ্গুলিপর্বেই গুণিয়া লওয়া যায়। তবে ইঁহাদের স্বেচ্ছাদারিদ্র্যের ফলও খ্রীষ্ট ধর্মের পক্ষে খুবই অনুকূল হইয়াছিল—পূর্বে মোহান্তদের বিলাসব্যসন দেখিয়া লোকে ধর্মের প্রতি প্রায় উদাসীন হইয়া পড়ে; এখন মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসীর ত্যাগে তাহারা আবার ধর্মাচরণের প্রেরণা পায়।

* এই কলহ নিজেদের সংঘেরই আভ্যন্তরীণ কলহ, কিংবা অপর সংঘের সঙ্গে কোনরূপ বাহ্যিক কলহ, অথবা দেশের বা বহির্দেশের সামন্তস্বার্থের সঙ্গে কলহ;

† ১১৮২-১২২৬ খ্রীঃ।

একাদশ শতাব্দের পূর্বে কয়েক শতাব্দ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ চলিতেছিল। তখন খ্রীষ্টীয়েরা মুসলমান তীর্থ জেরুজালেম দখল করিবার জন্য বহুবার অভিযান করে। * এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া অন্যান্য দেশের সঙ্গেও খ্রীষ্টানদের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলমানেরা বাগদাদ ও স্পেন জয় করিয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনাদির চর্চা আরম্ভ করে—এইরূপ দর্শনের চর্চা প্রথমত প্রাচীন য়ুনানী দর্শনের অনুবাদ ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়া শুরু হয় ;—কিন্তু তাহাতেই মধ্যযুগীয় য়ুরোপে এক নূতন ও স্বতন্ত্র সমাজচিন্তার সূত্রপাত ঘটে। খ্রীষ্টান দার্শনিক টমাস অক্বিনা † এবং আরও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সময় জন্মগ্রহণ করেন। অক্বিনা য়ুনানী, বিশেষত এরিষ্টটলের, দর্শনের ভিত্তিতে খ্রীষ্ট সমাজে এক নূতন চিন্তার প্রবর্তক হন। তাই বলিয়া তিনি যে কোন বিশুদ্ধ য়ুনানী মতবাদের প্রচারক ছিলেন ইহা নহে—অক্বিনা য়ুনানী দর্শনের যুক্তি গ্রহণ করিয়া সেই দার্শনিক পদ্ধতিকে খ্রীষ্টবাদের সেবায় লাগাইয়াছিলেন। শাসক ও শোষিতের পারস্পরিক বিদ্বেষ দেখিয়া অক্বিনা চক্ষু মুদিয়া থাকিতে পারিতেন না—এইজন্য তাঁহার দর্শনে শোষিতদের প্রতি সহানুভূতির কথা থাকাও স্বাভাবিক। এরিষ্টটলের মত এই মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয় দার্শনিকও বলিয়াছেন : 'মানুষ স্বভাবতই এক সামাজিক পশু ; ভগবান তাহাকে সমাজে থাকিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ; সমাজে না থাকিলে সে সুখী হয় না···কিন্তু সমাজ শাসন ছাড়া হইতে পারে না—তাই সমাজের জন্য শাসনযন্ত্রেরও প্রয়োজন ·· নিশ্চিন্ত আরামে জীবনযাপন করা কিংবা শুধু ধন বৃদ্ধি করা—মানুষের উদ্দেশ্য হইতে পারে না···শুধু লোভী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির নিকটই ইহা ভাল লাগিতে পারে।'

---

* এই সব অভিযান য়ুরোপ হইতে হইয়াছিল ; † ১২২৫-১২৭৪ খ্রীঃ।

মোর তাঁহার উটোপিয়ায় পনর ষোল শতাব্দীর ইংলণ্ডের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা মর্মস্পর্শী। সে সময়ের ভারতের কথা স্মরণ করিলে তাহাকে ইংলণ্ডের তুলনায় কিছুটা অগ্রসরই দেখা যায়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মধ্যযুগে ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ও কৃষক ছিল, আর তাহার উপর বেকারীর সংখ্যাও তখন ছিল যথেষ্ট। ইংলণ্ডের দণ্ডব্যবস্থা যে তখন কত ভয়ঙ্কর ছিল তাহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায়—সাধারণ চৌর্যের অপরাধে মধ্যযুগীয় য়ুরোপে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের বিহিত হইত। অবশ্য বুদ্ধকালীন ভারতেও তস্করকে এইরূপ মৃত্যুদণ্ড দিবারই বিধান ছিল; মুসলমানী শাসনের সময় চোরের প্রাণদণ্ড রদ করিয়া তাহার হাত কাটিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু য়ুরোপে তখনও ক্ষুধিত ব্যক্তি এক টুকরা রুটি চুরি করিলে তাহার মৃত্যু ভিন্ন গতি থাকিত না। আর চোরেরাও এই কারণে কৃতকর্মের সাক্ষী না থাকার জন্য গৃহ-স্বামীকে প্রায়ই হত্যা করিয়া ফেলিত।

২। বিকাশক্রম

ভিন্ন ভিন্ন যুগের সামন্তবাদী সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা এই অধ্যায়ে কিছু কিছু আলোচনা করিলাম। এই সময় শোষক ও শোষিতের আর্থিক তারতম্য যে কত বড় হইয়া উঠিয়াছিল ইহাতে তাহারই কতক আভাস পাওয়া যায়। সামন্তযুগে ধনের পরিমাণ যে বাড়িয়াছিল এই বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই—কিন্তু যাহাদের অক্লান্ত শ্রমে এই ধনের সৃষ্টি সেই শ্রমজীবীদের তাহাতে কিছুমাত্র সুবিধা ছিল না। সামন্তযুগে এক বর্গের সুখসমৃদ্ধির অনুপাতে অপর বর্গ অর্থাৎ কৃষকশ্রমিকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। ইহা এক সময় শোষিতদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া সমাজবিদ্রোহের রূপও

লইতে পারিত—কিন্তু শাসক-সামন্ত এই বর্গদ্বেষের পরিণাম বুঝিয়া পূর্ব হইতেই তাহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সামন্তযুগে শ্রমিকশক্তিকে করগত রাখিবার জন্য শাসনযন্ত্রের গঠন পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ দৃঢ় করা হয় ; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরলোক প্রভৃতির রক্তচক্ষু দেখাইয়া ইহাদিগকে বিহ্বল করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা চলে ; তাহার উপর শ্রমিকদের * নিজ বর্গের মধ্যে বহুস্বার্থ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের শক্তি অসংহত করিয়া দেওয়া হয়।

সামন্তবাদ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগের পিতৃসত্তা বা পিতৃবাদেরই রূপান্তর, এবং সামন্তশাসকও এই হিসাবে পুরাতন পিতরদেরই বিকশিত সংস্করণ। পিতৃসত্তা হইতে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এই দুই প্রকার শাসন-প্রণালীর উদ্ভবের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সকল প্রজাতন্ত্রের † নেতা কখনও সমাজের প্রজাসাধারণ হইতে পারিত না—এই প্রজাতন্ত্রের নেতা হইত সর্বদাই ধনী, অর্থাৎ সমাজের সেই উচ্চতর বর্গ। জনযুগের অন্তিম সময়ে আসিয়া সমাজে এককালে প্রজাতন্ত্রের গোড়াপত্তন হইয়াছিল—পরে দাসতাকালে এই জনতন্ত্রের শাসকেরাই প্রভূত ব্যৈক্তিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বসে—এইভাবে পরবর্তী স্তরে আবার ইহারাই আর্থিক ও অন্যান্য শক্তিবলে সমাজের সামন্তশাসকে পরিণত হয়। এই সকল প্রজাতন্ত্রের ‡ রূপ আমরা প্রাচীন এথেন্স, এবং ভারতবর্ষে বৈশালী, কপিলাবস্তু প্রভৃতির সমাজলক্ষণ হইতে জানিতে পারি। তারপর রাজতন্ত্রের রাজা সম্পর্কে বলিতে হয় যে তিনি সামন্তদের প্রভু, কিন্তু আসলে নিজেও তিনি এক সামন্তই—শুধু

---

* এই শ্রমিক অর্থে অবশ্য আধুনিক অর্থের শ্রমিক নয়, ইহারা প্রায়ই ভূমিদাস, ভূমিহীন দাস এবং প্রভুর অন্যান্য প্রকারের গোলাম ; † অর্থাৎ জনযুগের পরের ব্যৈক্তিক সম্পত্তিসম্পন্ন প্রজাতন্ত্রের ; ‡ ব্যৈক্তিক সম্পত্তির প্রজাতন্ত্রের।

পার্থক্য এই যে তিনি সকল সামন্তের প্রধান সামন্ত। জাপানের মিকাডোও ঠিক এইভাবেই নিজের দেশের সর্বাপেক্ষা বড় জমীদার—ইংলণ্ডের রাজারও তেমনই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া নিজের জমীদারী আছে; বিলাতী বাদশাহেরা পুঁজিবাদ হইতে লাভ পিটিবার নয়া কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন—বড় বড় কোম্পানী ও কারখানার শেয়র কিনিয়া তাঁহারা সবাই এখন শিল্পপতি। এই সব আধুনিক সামন্তের * সঙ্গে তাঁহাদের দেশের অন্য জমীদার বা সামন্তের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। † জাপান ও ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সেখানকার শাসনপ্রণালীতে কোন বিশেষ নূতনত্বের চিহ্ন নয়; কারণ নির্বাচনের প্রশ্নটি সেখানে শুধু সাধারণ সভার সদস্যদের সম্পর্কেই সম্ভব হয়—লর্ড ভবনের সদস্যের জন্য কোন নির্বাচন কিংবা এইরূপ অন্য কোন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাই, ইহারা শুধু নিজেদের বিশুদ্ধ বংশক্রমের দাবীতেই ঊর্ধ্ব সভায় আসন গ্রহণ করে—এবং সাম্রাজ্য শাসনের বেলায় ইহারাই সাধারণ সভা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান হয়। তাই বলিতে পারি—ধনতন্ত্রের মধ্যাহ্নকালেও পুরাতন সামন্তযুগের বংশক্রমিতা সমাজ হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি সামন্তযুগের রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে কোন বিশেষ মূলগত পার্থক্য নাই—প্রজাতন্ত্রের সামন্তকে শাসক হইবার জন্য তাহার বংশ ও ধনের অতিরিক্ত জনসাধারণের একটা সম্মতি লইতে হইত—তাহা ছাড়া প্রজাতন্ত্রে সামন্তদের নিজ বর্গের মধ্যে আর্থিক বা বংশক্রমিক অসাম্যও তত বেশি রাখা চলিত না; আর রাজতন্ত্রে ইহা

---

* এই আধুনিক সামন্তেরা সামন্তবাদের কোন নববিকাশ নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা পুরাতন সামন্তবাদের অবশেষ; † অর্থাৎ ব্যৈক্তিক ধনসম্পত্তির দিক্ দিয়া কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

হইতে প্রভেদ এই যে সেখানে সকল সামন্তবংশের গৌরব একরূপ হইত না—তাহাতে একটি বিশেষ বংশ অর্থাৎ রাজবংশ অন্য সকল বংশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত—এবং ইহাদের রাজক্ষমতা ও বংশক্রমে প্রাপ্ত বলিয়া সেখানে রাজার নিবাচনের কোন প্রশ্ন উঠিত না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রাজতন্ত্রের রাজা সামন্তকুলের প্রধান হইলেও তিনি সামন্তই—তাই তিনি নিজ বগস্বার্থের খাতিরে সকল সামন্তের সার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতেন—আর ইহারই প্রতিদানে প্রয়োজন হইলে সামন্তশক্তিও সংহত হইয়া সিংহাসনের পিছে আসিয়া দাড়াইত।

৩। সম্পত্তি

এই যুগে আসিয়া ব্যৈক্তিক সম্পত্তি মানুষের একটি ‘পবিত্র’ অধিকার রূপে গণ্য হইয়া যায়। দাসতার সময়ে সম্পত্তির উপর ব্যৈক্তিক অধিকার সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—তখন ইহাকে চিরন্তন বা চিরকালীন বলিয়া ধর্ম বা দেবতার আশীবাদের সহিত মিলিত করা যাইত না। ব্যৈক্তিক সম্পত্তি ‘পবিত্র’ হইয়া উঠার পর ইহার হানিকর সামাজিক অপরাধের * জন্য দণ্ডের বিধান হয়। কিন্তু চৌর্যের জননী দরিদ্রতা না মরিলে অপরাধীর মৃত্যু বিহিত করিয়াই চৌর্য রদ করা যায় না। সামন্তযুগের শাসকও যে এই সত্য একেবারে বুঝিতে পারিতেন না ইহা মনে করিবার হেতু নাই। বুদ্ধের এক সমসাময়িক রাজার উপাখ্যান † হইতে আমরা এই বিষয়ে তাঁহার মতামত বুঝিতে পারি ঃ—

“ ..রাজা ধর্মপথে চলিবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু দরিদ্রের জন্য ধনের সংস্থান করিলেন না…ইহাতে রাজ্যে দরিদ্রতা আরও বাড়িয়া

* চৌর্য প্রভৃতি ; † দীর্ঘনিকায় ৩।৩ (পৃঃ ২৩৫)।

গেল···লোক পরের ধন অপহরণ করিতে লাগিল···তস্করকে ধরিয়া লোকে শেষে রাজার নিকট লইয়া গেল···রাজা তখন সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি অন্যের ধন অপহরণ করিয়াছ—হে পুরুষ, এই অপবাদ কি সত্য ?'

'হাঁ দেব, সত্য ···'

'কিন্তু কি কারণে ?'

'জীবিকা চলিতেছিল না দেব···'

"...রাজা সেই পুরুষকে ধন দেওয়াইলেন...তাহার পর বলিলেন, 'হে পুরুষ, এই ধনে তুমি জীবিকা নির্বাহ কর, পিতামাতার অন্নসংস্থান কর, দারাপুত্রের প্রতিপালন কর'...রাজ্যের লোক শুনিল রাজা চোরকে ধন দেওয়াইয়াছেন ; তখন সকলে ভাবিল, 'আমরাও চুরি করিব' · কিন্তু রাজা আর কত ধন দিবেন ? তিনি মনস্থ করিলেন, 'এইভাবে তস্করকে ধন দিলে রাজ্যে চুরি বাড়িয়া যাইবে, এখন হইতে চোরের কঠোর শাস্তিবিধান করিতে হইবে···তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া লইলে রাজ্যে চুরি একেবারে বন্ধ হইতে পারে...'

"···রাজার আজ্ঞায় চোরের মুণ্ডচ্ছেদ করা হইল · তখন চোরেরা ভাবিল, 'যে চুরি করে রাজা তাহার শির কাটাইয়া লয়...তাহা হইলে চল আমরাও এখন অস্ত্র শানাই, যাহার চুরি করিব তাহার শিরও কাটিয়া লইব'...এইভাবে লোকে ধীরে ধীরে অস্ত্র শানাইল ; পরে শাণিত অস্ত্র লইয়া গ্রাম লুঠ করিল, নগর লুঠ করিল—পদচারী পথিকের মাথা কাটিয়া লইয়া যথাসম্পত্তি অপহরণ করিল..."

বুদ্ধ এই উপাখ্যানে নির্ধনতা দূর করিবার কোন উপায় নির্দেশ করেন নাই। তিনি এখানে শুধু বলিয়াছেন—দণ্ডবিধান করিয়া অর্থবিষম সমাজের অপরাধ দূর করা যায় না। তাঁহার মতে দারিদ্র্য দূর না করিয়া চৌর্যের জন্য শাস্তি দিলে—চুরি দূর হওয়া ত দূরের কথা বরং চৌর্যের

সঙ্গে হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ আসিয়া মিলিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে বৈয়ক্তিক সম্পত্তির জন্য যে পাপ সৃষ্টি হইয়াছিল বুদ্ধ তাহার কতক এইরূপ গণনা করিয়াছেন * ঃ—দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারার চুরি, এবং মাপ সংক্রান্ত অন্যান্য চুরি—ইহা ছাড়া ঘুষ, বঞ্চনা, কুটিলতা, কৃতঘ্নতা—এবং ছেদন, বন্ধন, ডাকাতি, লুঠ, রক্তপাত ইত্যাদি।

৪। বাণিজ্য

দাসতা-যুগে পৌঁছিয়া অস্ত্রপাতি ও শ্রমের বিশেষরূপ বিকাশ ঘটে—ইহার ফলে সমাজে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়েরও তখন যথেষ্ট উন্নতি হয়। পূর্বে বলিয়াছি, সামন্ত-যুগ সমাজে নূতন শাসক ও সৈনিক অধিকারীর সৃষ্টি করিয়াছিল—ইহার সঙ্গে পণ্যের উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে এক নূতন বর্গ অর্থাৎ বানিয়া বর্গও সামন্তকালেরই দান। পূর্বে দুই উৎপাদকের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের ব্যাপারটি খুব সুবিধার ছিল না: কৃষি প্রভৃতি অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় পণ্য সওদা করিবার সময় তখন কম মিলিত, তার উপর নিত্য হাটে গিয়া বসিয়া থাকিলে উৎপাদন ক্ষেত্রেও শ্রমের কমি হইত, এবং ইহার সঙ্গে খাওয়া খরচ প্রভৃতিতে ব্যয়ও যথেষ্ট হইয়া যাইত। তখন হাটে পণ্য লইয়া গেলে সকল সময় যে তাহার ক্রেতা মিলিত এমনও নহে—অনেক ক্ষেত্রে আবার ক্রেতাও পণ্যের জন্য আসিয়া হাটে প্রত্যাশা করিয়া থাকিত, কিন্তু পণ্যের উৎপাদক বা বিনিময়-কর্তার তখন কোন দেখাই পাওয়া যাইত না। হয়ত এই সব অসুবিধা মিটাইবার জন্যই পূর্বে নির্দিষ্ট হাট বা বড় মেলা বসাইবার রেওয়াজ ছিল; এই সময় পণ্যের উৎপাদক এবং গ্রাহক উভয়েই ক্রয়বিক্রয়ের জন্য অধিক সংখ্যায়

* দীর্ঘনিকায় ৩।৭ (পৃঃ ২৬৯)।

আসিয়া * একত্র হইত। পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা অনুযায়ী † তখনও কোন জিনিস সুলভ এবং কোনটা মহার্ঘ হইত—যেমন দুই হাত কাপড়ের সঙ্গে বিনিময় করিলে আট সের কিংবা ততোধিক মাংস মিলিত; কিন্তু ক্রয়ক্ষমতার দিক হইতে ধাতুর দাম তখনও অন্য সকল জিনিসের তুলনায় বেশি ছিল—তাই সামান্য ধাতুর টুকরা হইলে তাহার পরিবর্তে কুড়ি হাত কাপড় বা দুই মণ মাংস আসিত—এই ধাতুর সঙ্গে বিনিময় করা জিনিস তখন একজনের পক্ষে বহন করিয়া নেওয়া প্রায়ই সম্ভব হইত না। এইভাবে মানুষ তামা ও অন্যান্য ধাতুর অস্ত্র ও তৈজস নির্মাণ ছাড়া তাহাদের নূতন গুণ আবিষ্কার করে। পণ্যের ক্রয়বিক্রয়ের সময় ধাতুকে মধ্যস্থ করিয়া এইভাবে একসঙ্গে অধিক জিনিসের হস্তান্তর আরম্ভ হয়। প্রথম অবস্থায় এই সব ধাতুখণ্ডের উপর কোনরূপ রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিবার প্রয়োজন হইত না—ধাতুর গুণ ও পরিমাণের উপর মূল্য নির্ধারণ করিয়া তাহা দিয়াই পণ্য বিনিময়ের কাজ চলিয়া যাইত; কিন্তু পরে ব্যাপারী এবং তাহারও পরে রাজতন্ত্রের চেষ্টায় ধাতুর বিভিন্ন মুদ্রারূপের সৃষ্টি হয়। ইহাতে সাধারণ মানুষ ধাতুর ভেজাল ও ওজন সংক্রান্ত প্রতারণা হইতে বাঁচিয়া গেল, তবে তাহাদের ব্যাপারবাণিজ্য ও আর্থিক জীবন রাজতন্ত্রের নিকট বাঁধা পড়িল।

যাহা হউক, প্রথম দিকে পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা এই উভয়ই স্বয়ং উৎপাদক ছিল; নিজেদের জিনিস সওদা করিবার জন্য তখন তাহারা নিজেই হাটে বাজারে লইয়া যাইত। ধরা যাউক, এক

---

* তাহাদের সংখ্যা যেমন অধিক হইত, পণ্যের পরিমাণও তেমনি পর্যাপ্ত হইত—তাই হাট বা মেলা পণ্যপ্রাপ্তির অনেকটা নিশ্চিন্ত স্থল ছিল; † পণ্যের উৎপাদনব্যয়, তাহার পরিমাণ, তাহার চাহিদা এবং দুষ্প্রাপ্যতা, সুলভতা সমস্ত এক্ষেত্রে গণ্য।

গ্রাম হইতে কয়েকজন বিক্রেতা আসিয়া কয়েকদিন হাটে বসিয়া রহিল; কিন্তু এক দিন দুই দিন তিন দিন করিয়াও কিছুতেই তাহাদের পণ্যের ক্রেতা জুটিল না;—এই অবস্থায় গ্রামিক লোকের সময় ও অর্থ দুইই যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হইল। তখন দুই এক জনকে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বসাইয়া রাখিয়া অপর সবে গ্রামে ফিরিয়া গেল; আর যাহারা বসিয়া রহিল তাহাদের উৎপাদন শ্রমের লোকসানও অন্য ভাবে পূর্ণ হইল—অর্থাৎ উৎপাদকেরা সকলেই লাভ হইতে অংশ দিয়া তাহাদের ঘাটতি মিটাইয়া দিল। এইভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের অসুবিধায় সমাজে ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীবর্গের সৃষ্টি হয়, ইহাতে উৎপাদকেরা নিজে পণ্যবিক্রয়ের দায় হইতে মুক্তি পায়, এবং অপরদিকে ব্যবসায়ীকেও তাহারা উৎপাদন শ্রম হইতে অব্যাহতি দেয়।

ব্যবসায়ীদের উদ্ভবের পূর্বে পণ্যবিনিময়ের যে অসুবিধা ছিল তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক:—কাটামুণ্ডু * হইতে লাসা † যাইবার পথে এনম্ বা কুত্তী বলিয়া একটি স্থান আছে; উহা বলিতে গেলে প্রায় তিব্বতের সীমান্ত দ্বারেই অবস্থিত—সেখানে একজন তিব্বতীয় শাসনকর্তা বা তিব্বতের ম্যাজিষ্ট্রেটও বাস করেন। বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে দেড় দুই মাস কুত্তীতে খুব লোকসমাগম হয়—একদিক হইতে নেপালী কৃষকেরা তখন নেপালের ফসল সওদা করিবার জন্য কুত্তী আসে—পিঠের উপর চাউল ভুট্টার টুকরি লইয়া তাহাদের এক এক দল পাঁচ সাত দিনে আসিয়া কুত্তী পৌছে; অন্যদিক হইতে মধ্য তিব্বতের ক্ষারী ঝিলের নুন, তিব্বতের সোডা ও তিব্বতের কাপড় লইয়া আসে তিব্বতীয়ের দল—শতেক চামরী গাই ও হাজার ভেড়ার উপর লাদ চাপাইয়া কুত্তী আসিতে তাহাদের দুই তিন সপ্তাহ কাটিয়া যায়।

* নেপালের অন্তর্গত; † তিব্বতের রাজধানী।

নেপালী ও তিব্বতীরা এখানে বৎসরান্তে একবার তাহাদের উৎপাদিত জিনিস অদলবদল করে। নেপালীদের দেশে সোডা, লবণ বা কাপড় তেমন পাওয়া যায় না—তিব্বতের মত তুলা সেখানে নাই, তার উপর ক্ষারনির্ঝরও কম। তিব্বতে আবার নেপালের মত ভুট্টা বা চাউলের ফসল ফলে না—তাই ভুট্টা, চাউল ও অপর শস্যের সঙ্গে তিব্বতীরা নিজের জিনিস বদলাইয়া লয়। এই বিনিময়ের জন্য তিব্বতীদিগকে কুত্তীতে আসিয়া পাঁচ ছয় সপ্তাহ বসিয়া থাকিতে হয়—নেপালীরাও নিজেদের চাউল ভুট্টা খরচ করিতে করিতে দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। নেবার সওদাগরেরা ব্যবসা শুরু করিবার পর * তিব্বতী ও নেপালী কৃষকের এই অসুবিধা দূর হইয়াছে—এই নেবাররা কিন্তু তিব্বতী নয়, তাহারা নেপালের অধিবাসী; প্রায় হাজার বছর ধরিয়া ইহারা জাতব্যবসায়ী। তিব্বতীদের মধ্যে এত পূর্বে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই—তাই নেবাররাই তখন এই ক্ষেত্রে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইহারা তিব্বতীদের নিকট হইতে লবণ, সোডা ও অন্যান্য পণ্য কিনিয়া লইত—তাহার সঙ্গে সঙ্গে নেপালী কৃষকের ফসল চাউল ভুট্টাও তাহারা মজুত করিত—পরে প্রয়োজন অনুযায়ী উভয় সম্প্রদায়ের † নিকট তাহারা প্রার্থিত পণ্য বিক্রয় করিত। এখানে অবশ্য বলা বাহুল্য যে এই বিক্রয় কখনও খরিদ দরে হইত না—খরিদের উপর নেবার ব্যবসায়ী নেপালী ও তিব্বতী, উভয় পক্ষের পণ্যের উপরই মুনফা রাখিত। উৎপাদক মধ্যগের সাহায্য ছাড়া পণ্যবিনিময় করিলে তাহা দামে সস্তা হয়—কিন্তু এই ক্ষেত্রে অসুবিধা যে বিনিময়ের বাজারে পণ্যমূল্যের নিশ্চয়তা নাই; ব্যবসায়ীরা বাজারে পণ্যের একটা সর্বনিম্ন ও উচ্চতম দর বাঁধিয়া লয়—ইহাতে বাজার দরের আপেক্ষিক নিশ্চয়তাও অনেকটা

* অর্থাৎ সেই অঞ্চলে ব্যবসা শুরু করিবার পর; † নেপালী ও তিব্বতী।

বাড়িয়া যায়। ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য কিনিতে নিম্নতম দরে কিনিতে চেষ্টা করে—এবং পণ্যের উৎপাদককেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর দেওয়া দর মানিয়া লইতে হয়। কুত্তীর নেবার ব্যাপারা আজ হঠাৎ ব্যবসায় বন্ধ করিলে তিব্বতী ও নেপালী উভয়েরই অসুবিধা হইবে—নেপাল হইতে তাহাতে আবার চাউল-ভুট্টার টুকরি বহিয়া কৃষককে কুত্তীযাত্রা করিতে হইবে—আর তিব্বতী কৃষককেও তেমনি হাজার ভেড়ায় লাদ চাপাইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে—ইহাতে তাহাদের পণ্যক্রয়ের ব্যয় বাড়িবে এবং উৎপাদন শ্রমেও বহু কমি পড়িবে।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, সামন্তযুগে ব্যবসায়ীদের উদ্ভবের ফলে উৎপাদকের বহু শ্রম ও সময় বাঁচিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীরা প্রথম প্রথম কুত্তীর নেবারদের মত একস্থানে থাকিয়া উভয় পক্ষের পণ্যের খরিদবিক্রীর কাজ করিত। পরে অবশ্য তাহারা নিজেই উৎপাদকের ঘরে গিয়া সেখান হইতে বিক্রেয় পণ্য ক্রয় করিয়া আনিত, এবং বিভিন্ন দেশের জিনিস উহাদের নিকট পৌছাইবার জন্য গ্রামাঞ্চলে দোকান খুলিয়া রাখিত। ইহাতে উৎপাদককে আর পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য দীর্ঘ দিন ধরিয়া দেশান্তরে পড়িয়া থাকিতে হইত না। প্রথম দিকে ব্যবসায়ীরা শুধু পণ্য ক্রয় করিবার সময় উৎপাদককে তাহার পণ্যের মুল্য বুঝাইয়া দিত; কিন্তু পরে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বানিয়ারা দাদন হিসাবে পণ্যমুল্যের একাংশ অগ্রিমও দিতে আরম্ভ করে। ইহার পর কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের শিল্পীদের সাহায্যে তাহারা বিক্রেয় বস্তুর নির্মাণ শুরু করিয়া দেয়।

ব্যাপারীরা উৎপাদককে তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিয়াছে ইহা সত্য কথা—কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদক আবার সম্পূর্ণভাবে বানিয়াদের অধীনও হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীরা

উৎপাদকের তুলনায় সর্বদাই নিজের স্বার্থ সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ছিল—তাহার উপর সকল ব্যবসায়ীর মূল স্বার্থ এক হওয়ায় পণ্যের দর ও ওজন সম্বন্ধে তাহারা যদৃচ্ছা নিয়ম করিত। সমস্ত বাজার এক কথা বলিলে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে তাহাকে আর অনুচিত বলিয়া গণ্য করা যাইত না—সাধারণ ক্রেতা কিংবা উৎপাদকের নিকট উহা ন্যায্য এবং সর্বসমর্থিত পণ্যমূল্য বা বাজার দর বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু কেহ ব্যক্তিগত ভাবে পণ্যের দর বা ওজন সম্পর্কে নূতন বিধি স্থাপন করিতে চাহিলে সকলে তাহাকে ঠগ সাব্যস্ত করিত—এই ক্ষেত্রে কখনও ক্রেতাবিক্রেতায় কলহ হইত এবং অবস্থাবিশেষে লাঠ্যোষধির আয়োজনেও ত্রুটি হইত না। এই সব কারণে ব্যবসায় ব্যাপারে ওজনের মান ও মুদ্রানিয়ন্ত্রণের ভার শেষ পর্যন্ত রাজ্যব্যবস্থাপকদের হাতে চলিয়া যায়।

ব্যাপারীবর্গ দেশের উৎপন্ন দ্রব্য অল্প সময়ে বিতরণ করিবার ভার নিয়া উৎপাদনের বেগ বাড়াইয়া দেয়—ইহার ফলে দেশের ব্যাপার-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর পণ্যের চাহিদাও বাড়ে। আবার পণ্যোৎপাদন ক্ষেত্রে ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চতুর শিল্পীর কদরও পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হয়; এবং ইহার আনুষঙ্গিক ভাবে মানুষের শ্রমক্ষমতার অধিক অংশই তখন উৎপাদক কর্মে নিয়োজিত হইয়া যায়। উৎপাদন ব্যাপারে এই সব নূতন সাহায্য অনিবার্য হইয়া পড়ায়ই সমাজে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবসায়ী বা বানিয়ার দল উৎপাদককে ফাঁকি দিয়া দুই দিক হইতে তাহাদের শ্রম চুরি করে।* কাঁচা মালের উৎপাদনে কিংবা তাহাকে অন্তিম পণ্যরূপ

* অর্থাৎ বানিয়া উৎপাদনের জন্য শ্রম না করিয়াও উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়জাত ফল ভোগ করে—এই শ্রম চুরির বিশদ ও মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

দেওয়ায় বানিয়ার সত্যই কিছুমাত্র শ্রম ব্যয়িত হয় না। এইজন্য লোকের চোখে ব্যাপারীর বৃত্তি তখন অনেকটা জুয়াচুরির সামিল বলিয়াই গণ্য হইত। ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ভারতবর্ষে কয়েকটি প্রচলিত লোকোক্তি হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারি—

বানিয়া তোর কেমন বান
যায়না জানা জানি।
না ছেঁকে তুই লোহু খাস
ছেঁকে খাস্‌রে পানি ॥*

বণিকবৃত্তিকে ভারতবর্ষের সাধারণ লোক অশ্রদ্ধা করিত বলিয়া তাহাদের কবির মুখে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'র আবৃত্তি শুনিতে পাই না —লোককবি ভারতীয় কৃষকের মর্যাদাকে পূর্বে স্থান দিয়া তাহার পর বণিকবৃত্তির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

উত্তম ক্ষেতি মধ্যম বান।
অধম চাকরী ভিখ নিধান ॥ †

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বোঝা যায় উৎপাদক পণ্যবিক্রয়ের জন্য ব্যাপারীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেও তাহাদের শঠতাকে কখনই শ্রদ্ধা করিত না—দেশের শঠ ও সাহুদের উচ্চ মহল ও রাজৈশ্বর্য দেখিয়া সাধারণ লোক অতি সহজে এই ঐশ্বর্যের কারণ বুঝিতে পারিত। তাই বানিয়ার ভাগ্যে উৎপাদকের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা যত না জুটিত তাহার চেয়ে অনেক বেশি গুণ জুটিত ঘৃণা। তবে তখনকার সমাজেও বানিয়ার একটি বড় কৃতার্থতা ছিল এই যে সামন্ত শাসক চিরদিনই তাহার স্বপক্ষে ছিল—

---

* মুল প্রবাদটি হইল, 'জাণনহারা জাণিয়া বণিয়া তেরী বাণ। বিণ ছাণে লোই পিবে পানী পিবে ছাণ ॥' † মূল উক্তি হইতেছে, 'উত্তম খেতী মঝ্‌ঝিম বাণ। অধম চাকরী ভীখ নিধান ॥'

ইহার কারণ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে বণিক যে নিজস্বার্থে রাজতন্ত্রের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা সামন্তদের অজানা ছিল না তাহা ছাড়াও বণিককুল তাহাদের মুনফাহানির ভয়ে প্রকৃতপক্ষে সকল রকম সামাজিক উপপ্লবকে সর্বদাই দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহিত—এবং রাজা বিরাজী হইলে তাহাদের ব্যাপার-বাণিজ্যও যে মাটি হইবে এই বিষয়েও তাহারা খুব সচেতন ছিল। বণিক ও সামন্তের স্বার্থ মৈত্রীর অপর কারণ এই যে ইহারা উভয়েই পরশ্রমজীবী, জীবিকা অর্জন ব্যাপারে তাহাদের মৌলিক কোন সামর্থ্য নাই।

ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যকে তখন বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করায় সেই যুগের স্বার্থবহদের অনেকটা সহায়তা ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দে মগধের বণিকেরা তক্ষশিলা * হইতে বাঙলা দেশের তাম্রলিপ্ত † পর্যন্ত যাতায়াত করিত। বুদ্ধের সমকালীন রাজা বিম্বিসারের ‡ সময় তাহাদের রাজগৃহ হইতে তক্ষশিলা যাইবার বিবরণ পাওয়া যায়। এই বাণিজ্যযাত্রায় তাহারা পথে সাকেত, § অহিচ্ছত্র, ¶ সাগল †† ও অন্যান্য ছোট বড় দেশ অতিক্রম করিয়া যাইত। এইজন্য মগধসীমা পার হওয়ার পর মল্লদের খণ্ড খণ্ড গণতন্ত্রী দেশ পার না হইয়া তাহারা গন্তব্যে পৌছিতে পারিত না। পথিমধ্যে আবার রামগঙ্গার পার অবধি বিস্তৃত কোসলের বিশাল রাজ্যও তাহাদিগকে ভেদ করিয়া যাইতে হইত। পঞ্চাল ও কুরুরাজ্য পার হইয়া পঞ্জাবের মল্ল, ‖ মদ্র ┼ ও অন্যান্য প্রজাতন্ত্র দেশ হইয়া স্বার্থ শেষে গন্ধারে যাইয়া পৌছিত।

---

* রাওয়লপিণ্ডি ; † তমলুক, মেদিনীপুর ; ‡ মৃত্যু ৪৯১ খ্রীঃ পূঃ ; § অযোধ্যা ; ¶ রামনগর, বেরেলি ; †† শেয়ালকোট ; ‖ শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যস্থিত প্রদেশ ; ┼ রাবী ও চেনাব মধ্যস্থিত দেশ।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, কোসলের রাজ্য তখন বিশাল—এমন কি হয়ত বা প্রায় রামগঙ্গা অবধিই বিস্তৃত ছিল—এইজন্য বণিকেরা একবার কোসলে ঢুকিলে তাহাদিগকে অনেক দিন আর কোনরূপ রাজনীতিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না. কিন্তু কোসল ছাড়াইয়া আবার আর একটু অগ্রসর হইলেই দশ বার ক্রোশ পরে পরে তাহাদিগকে প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের সীমা পার হইতে হইত—ইহাতে রাজ্যের অধিকারীদিগকে বারংবার ভেট-পূজা দিতে দিতে বণিকের হাঙ্গামা ও হয়রাণির তখন আর অন্ত থাকিত না। কিন্তু রাজগৃহ হইতে তমলুক, তক্ষশিলা ও ভরোচ ব্যাপিয়া এক রাজ্য হইলে সীমান্ত অতিক্রমের ঝগড়া অনেকটা মিটিয়া যাইত; তাহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার হিসাব সংক্রান্ত গোলমাল, বিভিন্ন রাজ্যকর্তাদের তোষামোদ, মনস্তুষ্ট—এই সবও পূর্বের অনুপাতে কমিয়া আসিত। এইজন্য বণিক নিজের স্বার্থের খাতিরে দেশময় ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্যেরই অধিক পক্ষপাতী ছিল। আমরা বলিয়াছি, সামন্তবাদ প্রাচীন জন বা গোষ্ঠী সমাজের স্থলে বহুগোষ্ঠিক ভিত্তিতে রাজ্য বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও বংশক্রমের দিক দিয়া সামন্ত রাজার যে বিশেষ গোষ্ঠীপরিচয় তাহা লুপ্ত হয় নাই। তাই সামন্ত কোন বহুবিস্তৃত রাজ্যের সম্রাট্‌ হইলেও তাহার পক্ষে গোষ্ঠীপক্ষপাত হইতে মুক্ত হইয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু বণিক সম্প্রদায় এইরূপ সকল প্রকার পক্ষপাত হইতে স্বভাবতই মুক্ত—কারণ তাহার বাণিজ্য অন্তর্রাজীয়, তাই বণিকের দৃষ্টি এবং মনও অন্তর্রাজীয়; এই অন্তর্রাজীয় দৃষ্টির ফলে তাহার বাণিজ্য দেশীয় স্থলভাগ ছাড়াইয়া দূরান্তের সাগরসীমান্ত * স্পর্শ করে। বৌদ্ধদের জাতককাহিনী হইতে

* সুমাত্রা, জাভা, মেসোপোতামিয়া।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দের ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের বহু বিবরণ পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শাসকেরা বণিকদিগকে তাহাদের হিতকারী মনে করিত—রাজ্যের চিরস্থিতি কামনায় তাহারা বিভিন্ন দেশের পণ্য আগমে উৎসাহ না দিয়া পারিত না—রাজধানীতে এবং রাজ্য অন্তর্গত সমৃদ্ধ অঞ্চলে তাহারা ব্যবসায়ীদের ভিড় পছন্দ করিত। বুদ্ধের সমকালীন রাজা প্রসেনজিত তাঁহার ভগ্নিপতি বিম্বিসারের * নিকট কোসলের জন্য একজন বণিক আনিতে গিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে বিম্বিসারের এই ক্ষুদ্র রাজ্যই † নন্দ ও মৌর্যবংশীয়দের সময় এক বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল—মগধের জোতিয়, পুন্নক, জটিলমেণ্ডক, কাকবলিয় প্রভৃতি বণিকের বাণিজ্য প্রসারের মধ্য দিয়া তাহার পূর্বলক্ষণ পাঠ করিতে পারি। প্রসেনজিতের প্রার্থনার কথা বিম্বিসার তাঁহার রাজ্যের বণিকদিগের নিকট জানাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়—বৌদ্ধগ্রন্থে প্রসেনজিতকে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠর পুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে 'সন্তুষ্টচিত্তে কোসলে ফিরিবার' বিবরণ পাওয়া যায়। সাকেত ‡ আসিয়া পৌঁছিবার পর ধনঞ্জয় কি একটু ভাবিয়া প্রসেনজিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন §—

'ইহা কাহার রাজ্য ?'

'আমারই শ্রেষ্ঠী।'

'এই স্থান হইতে শ্রাবস্তী কতদূর হইবে ?'

'সাত যোজন অতিক্রম করিবার পর।'

'শ্রাবস্তীতে বহু লোক বাস করে, আমার পরিজন—দাস এবং অনুচর যথেষ্ট; যদি দেব আজ্ঞা দেন, আমি এই স্থানে বসতি করি।

---

* মগধরাজ; † মগধরাজ্য; ‡ অযোধ্যা; § সংকৃত বুদ্ধচর্যা (পৃঃ ১৫৩) দ্রষ্টব্য।

ধনঞ্জয় মগধের একজন প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীর পুত্র—সে নিজেও পিতার সমব্যবসায়ী বিচক্ষণ বণিক ছিল ; তাই ঘাঘরার * কূলে, তক্ষশিলার পথের উপর, বসতি যে সুবিধাজনক তাহা সে বুঝিতে পারে। শ্রাবস্তী রাজধানীর পার্শ্ব দিয়া তখন রাপতী নদী বহিত ; কিন্তু রাপতী সরযুর মত তত বড় ছিল না, আর তাহার পারে জনবসতিও বিরল ছিল।

বাণিজ্য সেই যুগে কত বড় লাভের বস্তু ছিল তাহা ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখার বিবাহ বর্ণনা† হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

"শ্রাবস্তীর মৃগারশ্রেষ্ঠীর পুত্র পূর্ণবর্ধন যুবা বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন...কিন্তু উপযুক্তা কন্যার অভাবে তিনি তখনও কুমার—অকৃতদার...পূর্ণবর্ধনের পিতা সমজাতীয়া কন্যা খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন...শ্রেষ্ঠীর চরেরা শ্রাবস্তীতে কন্যা না পাইয়া সাকেত অভিমুখে রওয়ানা হইল...সেই দিন বিশাখা পাঁচশত সমবয়স্কা সখিসঙ্গে মহাবাপীতে উৎসবে গিয়াছেন...মৃগারশ্রেষ্ঠীর অনুচরগণ নগরে কন্যা ন পাইয়া তখন নগরসীমান্তে বিশ্রাম করিতেছিল...এমন সময় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ঘোরতর বর্ষণ সুরু হইল...বিশাখার সখীরা ভিজিবার ভয়ে বেগে দৌড়িয়া গিয়া ঘরে ঢুকিল...কিন্তু বিশাখা এই মেঘ বর্ষণে একটুকুও বিচলিতা হইলেন না—তিনি বর্ষণ মাথায় করিয়া সুমন্দ পাদক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিলেন...বিশাখার বয়স ও রূপে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠীর অনুচরেরা তখন জিজ্ঞাসা করিল—

'অম্ম, তোমাকে অতীব বৃদ্ধার মত মনে হইতেছে ·'

'তাত, এইরূপ কথা আপনারা কি দেখিয়া বলিতেছেন ?'

'...তোমার অন্যান্য সহচরীরা বর্ষণের ভয়ে ছুটিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিল...আর তুমি বৃদ্ধার মত শেষ অবধি ধীরে ধীরেই চলিলে—তোমার সুমন্দ পদবিক্ষেপ এতটুকুও দ্রুত করিতে চাহিলে না—

* সরযূনদী ; † মৎকৃত বুদ্ধচর্যা (৩২৬-৩২৮ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

এমন কি তোমার দুর্লভ সাড়ী যে ভিজিয়া যাইবে তাহাও চিন্তা করিলে না ..

'তাত, সাড়ী আমার কাছে দুর্লভ নয়, আমার ঘরে অজস্র বহুমূল্য সাড়ী আছে—কিন্তু তাত, স্ত্রীজাতি বিক্রেয় বাসনের মত, হাত পা ভাঙ্গা অঙ্গভঙ্গ স্ত্রীকে লোক ঘৃণা করে ..আমি এই সব কথা জানি বলিয়াই ধীরে হাঁটিলাম...'

অবশেষে বিশাখা দাসীগণ পরিবৃতা হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ...বিশাখার পিতার নিকট বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি বলিলেন, 'তাত, তোমাদের শ্রেষ্ঠী ধনে আমার সমতুল্য না হইলেও জাতিতে আমার সমান...আচ্ছা তোমরা যাও, গিয়া মৃগারশ্রেষ্ঠীকে আমার সম্মতি জ্ঞাপন কর...'

বিবাহ ঠিক হইবার পর মৃগার শেঠ রাজা প্রসেনজিতের সমীপে যাইয়া নিবেদন করিল—

'দেব, একটি মঙ্গল কর্ম বিষয়ে আপনার নিকট নিবেদন করি: আপনার দাস পূর্ণবর্ধনের জন্য ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখাকে আনিতে চাই—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাকেত নগরে যাইবার আজ্ঞা দান করুন...'

'যথারুচি মহাশ্রেষ্ঠী !...কিন্তু আমরাও আপনার সহগামী হইব কি?'

'দেব, আমি কৃতার্থ হইলাম—আপনার ন্যায় সঙ্গী কোথায় পাইব ?'

...রাজা মৃগারশ্রেষ্ঠীকে খুশী করিবার জন্য বরযাত্রীদের সঙ্গে সাকেত যাইতে প্রস্তুত হইলেন...সেখানে পৌছিবার পর ধনঞ্জয় সকলকে সন্তুষ্ট-চিত্তে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া গেলেন...কয়েকদিন কাটিবার পর প্রসেনজিত ধনঞ্জয়ের নিকট এক বার্তা প্রেরণ করিয়া জানাইলেন—

'শ্রেষ্ঠী, মৃগার শেঠ বেশিদিন আমার খরচ বহন করিতে পারিবেন

না—তাই আমার নিবেদন আপনি যথাশীঘ্র কন্যা বিদায়ের দিন স্থির করুন...’

...ইহার উত্তরে ধনঞ্জয় প্রসেনজিতের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, ‘মহারাজ, বর্ষাকাল আসিয়া গিয়াছে, এখন চার মাস পথ চলা অসম্ভব ...আপনার বান্ধব ও পরিচরদের ভার আমার উপর অর্পণ করুন—আপনি অনুগ্রহ করিয়া যখন আসিয়াছেন, তখন আমার ইচ্ছা ব্যতীত যাইতে পারিবেন না’...”

পালি গ্রন্থে দেখা যায় ধনঞ্জয়ের পক্ষে এই বিরাট জনতার ব্যয় বহন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই; শুধু শেষ দিকে ইন্ধনের অল্পতায় * তাহাকে হাতীসার, ঘোড়াসার ও গোসার উৎপাটন করিতে হইয়াছিল। বিশাখা পিতার নিকট হইতে যে যৌতুক পাইয়াছিল তাহাতে ‘মহালতা’ নামে এক হারের উল্লেখ আছে—পালি গ্রন্থে † ইহার মূল্য ‘নয় কোটি’ এবং নির্মাণ ব্যয় ‘শত সহস্র’ বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ‘নয় কোটি’ সংখ্যাটি তখনকার কার্ষাপণ ‡ সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও মহালতার মূল্য বড় কম ছিল না—এই মূল্যে বিশাখার বিবাহের পর তাহার জন্য ‘মৃগারমাতা’র নামে § একটি প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল—এই দ্বিতল প্রাসাদের প্রত্যেক তলেই পাঁচ পাঁচ শত প্রকোষ্ঠ ছিল বলিয়া পালি গ্রন্থে বর্ণনা আছে।

এই উপাখ্যান হইতে সামন্তযুগে বণিক সমাজের সমৃদ্ধি এবং রাজকুলের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মধ্যকালীন ভারতে শ্রেষ্ঠী ও তাহাদের কুমার কুমারীর সহিত রাজকুমার ও কুমারীদের মিত্রতা ও একসঙ্গে ব্যসনাদির বিবরণ আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বণিকসমাজ কখনও রাজ্যের স্বল্পবিস্তৃত সীমা পছন্দ

---

* লক্ষণীয় যে তখন বর্ষাকাল; † ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ৪।৪৪; ‡ তাম্রমুদ্রা; § মৃগারশ্রেষ্ঠীর মাতা (?)

করিত না—অব্যাহত ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য রাজ্য যত বড় হয় ততই তাহাদের সুবিধা ছিল; রাজ্যের ভিতরে বাহিরে অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা উপপ্লব ঘটিলে ব্যবসায়ের বিঘ্ন ঘটিত—তাই তাহ'দের পক্ষে শান্ত এবং নির্বিরোধ জীবন কামনা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। আর বণিকেরা সমাজের উৎপাদন ক্রিয়ার সঙ্গে কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্কিত ছিল না—ইহাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা প্রকৃতির কোনরূপ বিরোধিতার সম্মুখেও তাহাদিগকে যাইতে হইত না।* এই ভাবে সকল সংঘর্ষ হইতে দূরে থাকায় বণিকের পরুষ প্রকৃতিগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—তাই তাহার আচার প্রচারে কোনরূপ রূঢ়তা বা দৃঢ়তার পরিচয় সহজে পাওয়া যায় না। † অন্তরের কপটতা ঢাকিয়া মধুর বচনে কাজ হাসিল করিতে বণিক তখন সিদ্ধহস্ত ছিল। ভারতীয় বৈশ্যদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে আজও বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি শান্তধর্মে বিশ্বাসী দেখিতে পাই—তাহাদের দিক হইতে ইহাকে সামাজিক শান্তি কামনার প্রকাশ বলিয়া মনে করিলে ভুল হয় না। আমরা জানি বৌদ্ধধর্ম এক সময় ভারতবর্ষে এমনি এক শান্তি ও অহিংসার ধর্ম ছিল—ভারতের বড় বড় বণিক ও ব্যাপারী এইজন্য অতি সহজে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়; তাহাদের ব্যাপার বাণিজ্য দূর দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে বৌদ্ধধর্মও বহির্ভারতে প্রসার লাভ করে—বৌদ্ধধর্মের অন্তর্রাষ্ট্রীয় প্রচারে ইহা একমাত্র কারণ না হইলেও অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দ পর্যন্ত ‡ ভারতীয় ব্যাপারীরা বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন—ত্রিপিটকে এবং সাঁচি, ভরহুত, কার্লে ও নাসিকের শিলালেখগুলিতে ইহার প্রমাণ মুদ্রিত আছে—তাহা হইতে দাতাদের তালিকা প্রস্তুত

* বণিকদের সাগরাভিযানের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; † এই চরিত্র চিত্রণ যে মধ্যকালীন বণিকের তাহা মনে রাখিতে হইবে; ‡ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া।

করিলে ব্যাপারীর সংখ্যা অপর সকল বর্গকে বহুব্যবধানে অতিক্রম করিবে। বুদ্ধকালীন ভারতে বণিকেরা শাসন ব্যাপারে প্রধান না হইলেও তাহাতে তাহাদের প্রত্যক্ষ অংশ ছিল—প্রত্যেক নগরে নগর-শ্রেষ্ঠীর রাজকীয় পদ হইতে আমাদের পূর্ব উক্তি প্রমাণিত হইবে।

৫। ধাতু ও হাতিয়ার

তাম্র আবিষ্কারের পর লক্ষ বর্ষ হইতে চলিয়া আসা প্রাচীন প্রস্তরাস্ত্রের প্রচারও কমিয়া আসে। ইহার পর খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে পিত্তল—এবং পিত্তলেরও প্রায় তিন শতাব্দী পরে লৌহ আবিষ্কৃত হয়।* পিত্তল তাম্রের তুলনায় অনেকগুণ দৃঢ় এবং স্থায়ী—এই দিক দিয়া লৌহ আবার পিত্তল হইতেও অধিক গুণসম্পন্ন। অবশ্য দামের বিচারে লোহা আজ অন্যান্য সকল ধাতুব তুলনায় সস্তা ; কিন্তু এক সময় ইহার মুল্য তামা, রূপা প্রভৃতি ধাতু হইতে বেশি ছিল। ইহার কারণ এই যে তখন লৌহ প্রস্তুত করিতে মানুষের যথেষ্ট শ্রম ব্যয়িত হইত—আর কয়লার ব্যবহার না জানায় মাটি হইতে ধাতু পৃথক্ করাও সহজ ছিল না। †

এইসব ধাতুর আবিষ্কারে অস্ত্রপাতির সংখ্যা ও শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িয়া গেল ; পুরাতন কাঠপাথরের অস্ত্র লুপ্ত হইয়া কাষ্ঠ ও প্রস্তর তখন নানা শিল্পকার্যে প্রযুক্ত হইল। সামন্তযুগে লৌহের মত প্রয়োজনীয় ধাতু আবিষ্কৃত হওয়ায় অবশ্য শাসকদেরই সুবিধা হইল বেশি—কারণ সাধারণ মানুষ অস্ত্র নির্মাণের ব্যয়াধিক্যের জন্য নিজে-দিগকে তখন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত রাখিতে পারিত না—কিন্তু সামন্ত শাসক তাহার শোষিত প্রজা ও প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্তের ভয়ে নিত্যই নূতন

---

* এই আবিষ্কার সম্পর্কিত আলোচনা ১২২-২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ; † পাথুরে কয়লার ব্যবহার জানিবার পর এই বিদ্যা অনেকটা আয়াসসাধ্য হইয়া যায়।

অস্ত্রে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিত। এইসব যুদ্ধসম্বন্ধী জ্ঞান ও আবিষ্কারকে তাই সামন্তের পক্ষে স্বাগত না করিয়া কোন উপায় ছিল না—কারণ বহুসংখ্যকের উপর সংখ্যালঘুদের শাসন কায়েম রাখিতে হইলে শক্তির* প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার্য।

কিন্তু সমাজে প্রস্তর ও দারুঅস্ত্র প্রচলিত থাকিবার সময় সংখ্যাই† বিশেষভাবে শক্তির কাজ করিত; তাই তখন মাটির একটা সাধারণ দেওয়াল হইলে তাহাই কেল্লার চারদেওয়ারীর মর্যাদা পাইত। অবশ্য ইহার পর নিক্ষেপাস্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধনুর্বাণের ব্যবহার আরম্ভ হয়—এবং ইহারই কিছুদিন পরে তাম্রাস্ত্র বা তাম্রনির্মিত আয়ুধের আবির্ভাব ঘটিয়া যায়। এইবার তামার আয়ুধ লইয়া স্বল্প সংখ্যক মানুষও প্রস্তরাস্ত্রের বিরাট্ বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে—তাই আত্মরক্ষার জন্য সামন্তকে আদিম দুর্গব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া তাহা আর একবার পুনর্গঠিত করিয়া লইতে হয়। মিশরের অন্যতম প্রস্তরকীর্তি চেয়োপ্ সমাজের আদি ধাতু যুগেরই‡ একটি লক্ষণীয় নিদর্শন। হেরোদেতসের কথা অনুসারে ইহার চত্বর খুঁড়িতে এক লক্ষ লোক তিন মাস পরিশ্রম করিয়াছিল। ভারতবর্ষে আদি ধাতু যুগের অবশেষ যে একেবারে অপ্রাপ্ত তাহা নহে, কিন্তু কথা এই—কিংবদন্তী ইহাকে মানুষের কৃতি বলিয়া স্বীকার করে না। রাজগৃহের পাহাড়ের উপর যে একটি প্রাচীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়াছে—তাহার বিশালতার জন্য লোকে উহাকে অসুরের সৃষ্টি বলিয়াহ মনে করে। পরবর্তী যুগে এইসব পাষাণ দুর্গের স্থলে অপেক্ষাকৃত লঘু উপকরণের সাহায্যে দুর্গাদির নির্মাণ আরম্ভ হয়। বুদ্ধকাল কি মৌর্যকালে এইসব দুর্গ সাধারণত কাঠের উপকরণ দ্বারাই তৈয়ার হইত—তখন কাঠ অবশ্য খুবই সুলভ এবং পর্যাপ্ত ছিল—আর

* অর্থাৎ অস্ত্রশক্তির, অস্ত্রবলের; † জনসংখ্যাই; ‡ অর্থাৎ তাম্র যুগের; চেয়োপ্‌কে (২৮০০ খ্রীঃ পূঃ) তাম্র যুগের মনে করিবার কারণ ৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

ধাতুর আবিষ্কারে কাঠের কারিগরীও বাড়িয়া গিয়াছিল। য়ুনানী রাজদূত * পাটলিপুত্রের † দুর্গপ্রাচীরের যে বর্ণনা দিয়াছেন এই ক্ষেত্রে তাহারও স্মরণ করা চলিবে। পাটনার প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এই দুর্গ-প্রাচীরের কিছু অংশ এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে—বনাকীর্ণ স্থানে এই প্রাচীর স্বভাবতই কাঠ দিয়া তৈয়ারী—কিন্তু পাহাড়ের সন্নিকটে তাহা আবার প্রস্তরময়, আর পাহাড় ও জঙ্গল হইতে দূরে ইটের সাহায্যেও ইহার নির্মাণ হইয়াছে। তখন কেল্লার চারদেওয়ারী ঘেরিয়া প্রায়ই জলে-ভরা অনতিগভীর খাড়ি থাকিত। তারপর ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দ পর্যন্ত ভারতে এই দুর্গনির্মাণ কৌশলের আর বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু মোঙ্গোলেরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া পৃথিবীতে হঠাৎ এক নূতন সমর-কৌশলের সৃষ্টি করে; ভারতবর্ষেও মোগল সম্রাট্ বাবর সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ বারুদের ব্যবহার করেন;—এইভাবে যুদ্ধরীতি পরিবর্তিত হইবার পর তোপের গোলার সম্মুখে পুরাতন দুর্গপ্রাচীর বিকল প্রতিপন্ন হয়—তাই অবরোধকে নূতন আক্রমণের উপযুক্ত করিবার জন্য দুর্গাদির গঠনেও আবার পরিবর্তন আসে। নূতন অস্ত্রের সম্মুখে পুরাতন অবরোধের বিকল হইবার দৃষ্টান্ত এই যুগেও অবশ্য যথেষ্টই আছে। আর অস্ত্রশস্ত্রের এই যে নিত্য নূতন প্রয়োগ তাহা বর্গরাজ্যের সমাপ্তি না হইলে শেষও হইতে পারে না—কারণ বর্গশাসনে সমাজের স্বল্পসংখ্যকের হাতে গিয়া রাজনৈতিক ও আর্থিক সমস্ত অধিকারই পুঞ্জিত হয়—ইহাতে শাসকের প্রতিপত্তি সুরক্ষিত রাখিবার জন্য এক বর্গকে সশস্ত্র ও অপরকে নিরস্ত্র করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই বলিতে পারি শোষণ ‡ যতদিন বর্তমান আছে ততদিন পরদেশ লুণ্ঠনের ক্ষান্তি নাই—কিংবা যুদ্ধ বিগ্রহেরও নিবৃত্তি নাই। ইতিহাসে

---

* মেগাস্থিনিস; † পাটনা; ‡ শোষণতন্ত্র সর্বদাই বর্গভিত্তিক।

বর্গরাজ্য এইজন্যই চিরদিন তলোয়ারের রাজ্যরূপে চিহ্নিত হইয়া আছে।

৬। বর্গ ও বর্গসংঘর্ষ

সামন্তযুগে অর্থ ও বর্গগত বৈষম্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। নিম্নবর্গের শ্রমফল ভোগ করিয়া উচ্চতরবর্গ তখন সমাজে নিজের আসন পাকা করিয়া লইয়াছিল। এইভাবে উৎপাদন-ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক না থাকায় কায়িক শ্রমকে তাহারা ঘৃণার চোখে দেখিতে থাকে। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তখন যুগনির্দেশ কি ছিল তাহা তুলসীর সীতার আদর্শ হইতেই বুঝিতে পারি—

কোল দোলা ত্যজি সীতা পালঙ্কে শয়ান।
কঠোর ভূমিতে নহে পদের সংস্থান ॥*

তখন স্ত্রীচরিত্রে ইহার কোন ব্যতিক্রম হইয়া থাকিলে তাহা শুধু অস্ত্রশিক্ষা সম্পর্কেই হইতে পারে; আমরা পূর্বে বলিয়াছি সামন্তযুগে বীরতার প্রকৃতই খুব কদর ছিল†—আর প্রত্যেক সামন্তই তখন বুঝিত তরবারির ধার ক্ষয় হইলে তাহার ভোগযশও বেশি দিনের নয়। এইজন্যই দেখিতে পাই সামন্তযুগে সকল দেশেই শাসকেরা নিয়মিত ভাবে শস্ত্রচর্চা করিত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দে উত্তর

---

* অর্থাৎ দোলা ও কোল ছাড়িবার পরই সীতা পালঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন —এমন কি এই কঠোর পৃথিবীতে তিনি ভুলেও পাদস্পর্শ করান নাই; তুলসীদাসের মূল হিন্দী হইতেছে—"পলঁগ পীঠ তজি গোদ হিঁডোরা। সিয় ন দীহ্ন পগ অবণি কঠোরা ॥"

† এই পুরাতন বীরতার কদর বর্তমান ভারতের সামন্তদের মধ্যে ক্রিয়ায় না হইলেও আদর্শে টিকিয়া আছে; বাঙ্‌লা দেশে পার্বত্য ত্রিপুরার রাজাদের রাজচিহ্নের নীচে 'কিলবিদু বীরতা সারমেকং' এই কথাটি লেখা থাকে।

ফ্রান্সের একমাত্র যুগাদর্শ হইয়াছিল প্রেমচর্চা ও যুদ্ধচর্চা; আর এই যুদ্ধচর্চাও যে তখন সমাজসম্বন্ধী কাজে খুব বেশি নিয়োজিত হইত তাহা নহে—ফরাসী সামন্তের বীরতা রমণীর অনুগ্রহ লাভের জন্য সামন্তে সামন্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই শেষ হইয়া যাইত। *

রাজপুত যুগে † ভারতীয় সর্দার ও সামন্তদের আচরণও ফরাসী বীরদের অনুরূপই ছিল। তখন রাজপুত বীরও ফরাসীর মতই কখনও মৃত্যুর ভয় করিত না—এবং অপরাপর ব্যাপারেও সে প্রায় ফরাসীরই সমকক্ষতা অর্জন করিয়াছিল: আল্‌হা উদলের যুদ্ধে রাজপুতেরা বিজিত রাজ্যের কুমারী হরণ করিবার জন্য যোগ দিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা আছে। দণ্ডীর দশকুমারচরিতে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় সামন্তদের সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়; সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বীরতা এবং সুন্দরীর সহিত প্রেম এই দুই বস্তু সামন্ত শাসকের জীবনাদর্শ গণ্য হইয়াছে। দণ্ডীর কাব্যে নায়ক রাজবাহন ও তাহার সাথী কুমার উজ্জয়িনী যাইয়া দুইটি কুমারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল—কবি অবশ্য এই প্রেমকে যথাসম্ভব মর্যাদা দিয়া তাহাকে কবিজনোচিত ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরই তিনি বালচন্দ্রিকার নায়ককে দিয়া তাঁহার প্রেয়সীর জন্য অপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করান—ইহাতে মধ্যযুগে য়ুরোপীয় বীরদের যে আদর্শ অর্থাৎ সেই 'বীরতা ও প্রেম'—তাহাই দণ্ডীর নাটকে ভারতীয় ভূমিকায় দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া রাম—অথবা পঞ্চ পাণ্ডব, কিংবা সিদ্ধার্থ গৌতমের বিবাহেও আমরা বীরতার টুর্ণামেণ্ট হইতে দেখি। স্বয়ম্বর সভায় সুন্দরী রাজ-কুমারীকে পণ রাখিয়া তখন সামন্তবীরদের মধ্যে শস্ত্রপ্রতিযোগিতায়

---

* অবশ্য এই সময় ফ্রান্সের অভিযাত্রীরা নূতন দেশ আবিষ্কারেও বাহির হইয়াছিল—তবে দেশের অভ্যন্তরে তাহাদের বীরতাও রমণীর মনস্তুষ্টিতে ব্যয়িত হইত; † খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

বন্দোবস্ত হইত। শাসকজাতিকে যুদ্ধবিদ্যায় প্রেরণা যোগাইতে ইহা অপেক্ষা চতুর কৌশল আর কি হইতে পারে ?

বর্গভেদের প্রসঙ্গে অবশ্য শাসকের পরেই পুরোহিতের কথা বলিতে হয়—কিন্তু যাজক ও পুরোহিত সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বেই হইয়া গিয়াছে—এবং এই বিষয়ে অন্যান্য বাকী প্রসঙ্গও আমরা বিষয়ান্তরে * সারিয়া লইব। তারপর শাসক ও পুরোহিতের কথা হইয়া গেলে বলিতে হয় ব্যাপারীর কথা—কিন্তু ব্যাপারীর সম্পর্কে আলোচনা আমরা পূর্বে বিশদভাবেই করিয়া আসিয়াছি। ইহার পর—অর্থাৎ শাসক, যাজক ও ব্যাপারীর পর চতুর্থ বর্গ কারিগর ও কৃষাণ—ইহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বে হইয়া গেলেও তাহা তেমন পর্যাপ্ত হয় নাই।

দাসতাযুগে সকল কৃষকই তাহার কর্ষিত ভূমি অর্থাৎ নিজ জোতের অন্তর্ভুক্ত ভূমির স্বামী ছিল—কিন্তু সামন্ত যুগে রাজা বা সামন্তকে রাজ্যের সমস্ত ভূমির মালিক করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। † পূর্বে শাসককে রাজ্যসেবার বেতন হিসাবে প্রজারা কিছু কর ও লভ্যের কিছু অংশ দিয়া দিত ; কিন্তু সামন্ত যুগে এই প্রথা বদলাইয়া তাহার স্থলে রাজা স্বয়ং ভূমির স্বামী বলিয়া ঘোষিত হন। য়ুরোপীয় সামন্তেরা এই উপায়ে কৃষকের নিকট হইতে তখন বহু ভূমি কাড়িয়া লইয়াছিল—পরে খ্রীষ্টবাদ জনসাধারণের ধর্ম হওয়ায় কৃষককে অর্ধদাস ‡ করিয়া লইতে তাহাদের আরও সুবিধা হয়।

নূতন ধর্মপ্রসারের সঙ্গে পুরাতন বিধিব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া দিবার সর্বত্রই এইরূপ সুযোগ আসে—কারণ তখন প্রাচীন নিয়মনীতিকে অবিশ্বাসী বা কাফিরের মূঢ়তা বলিয়া প্রচার করা খুব সহজ হয়—

---

* ১১৪ পৃষ্ঠা হইতে ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য ; † এই চেষ্টা সিদ্ধান্তিক দিক্ হইতে অর্থাৎ আইনের আশ্রয়েই হইয়াছিল ; ‡ অর্থাৎ Serf, কর্মী বা কমীন।

আর ইহাতে জনসাধারণও তাহার আচরিত রীতিনীতির উপর স্বভাবতই বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায়। ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে সনাতন নিয়মের উপর এতটা আকস্মিক অবিশ্বাস জন্মানো সম্ভব হয় নাই—কারণ কোন ধর্ম্ম এখানে একচ্ছত্র হইতে না পারায় প্রাচীন পরম্পরা অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে। পঞ্জাবে গত শতাব্দীতে শিখ শাসনকাল পর্য্যন্ত ভূমির উপর সমগ্র গ্রামের সম্মিলিত অধিকার * ছিল; ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অষ্টাদশ শতকের অন্তকাল অবধি ক্ষেত্রে শুধু কৃষকের দাবী স্বীকৃত হইত—জোতকার ও সরকার এই দুই দলের মধ্যে জমীদার নামীয় নূতন শ্রেণীর তখনও সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় সামন্ত শাসকের প্রভুতা বিস্তৃত হইবার পর এখানে ইহাদের সৃষ্টি হয়।

কোম্পানীর শাসনের পূর্ব পর্য্যন্ত ভারতের গ্রামগুলিতে পঞ্চায়তী প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রামের আভ্যন্তরিক বিষয়ে তখনও রাষ্ট্র ব্যক্তি অপেক্ষা পঞ্চায়ৎকেই অধিক প্রাধান্য দিত। সামাজিক দিক্ হইতে ভারতের এই গ্রাম্য পঞ্চায়ৎকে আমরা জনযুগীন শাসনেরই অবশেষ বলিতে পারি—কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের প্রকৃতই কোন উন্নতি না অধোগতির চিহ্ন তাহা লইয়া প্রচুর বিসম্বাদ হইতে পারে; সামাজিক দিক্ হইতে বিচার করিলে তখনকার পঞ্চায়ৎকে শুধু মাত্র প্রাচীনত্বের আকর্ষণ অর্থাৎ মোহ বলিয়াই মনে হয়—ইহা অব্যবহার্য্য পুরাতন জীর্ণ জামাকে তালি দিয়া ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি ছাড়া আর অন্য কিছুই নহে। তবে কথা হইল, এই জীর্ণবাসের প্রতি আসক্তিই বা ভারতবর্ষে এমন সামাজিকভাবে সার্থক হইল কেন? ইহার কারণ হইতেছে (১) আর্থিক বর্গভেদ ছাড়া ভারতবর্ষে বর্ণগত বর্গভেদেরও যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল—আর

* ইহা জনযুগীন প্রথারই অবশেষ।

এইজন্য ভারতীয় সমাজে অর্থসাম্যের জন্য কোনরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্ভবপর হয় নাই; (২) উষ্ণ জলবায়ুর জন্য এখানকার জীবনের সাধারণ মান চিরকালই নীচে পড়িয়া থাকিতে পারিয়াছে—য়ুরোপের মত এখানে উন্নতধরণের খাদ্য, বস্ত্র বা গৃহ জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য নয়—য়ুরোপে শীতের উপযোগী পরিচ্ছদ বা গৃহ তপ্ত রাখিবার সরঞ্জাম না রাখিলে ফেব্রুয়ারী পড়িতেই মৃত্যু হয়—কিন্তু ভারতবর্ষে এই সময়ও কৌপিনসার হইয়া নিস্পত্র গাছের তলায় রাত্রি কাটাইয়া দেওয়া চলে; তারপর আরও কারণ হইল (৩) ভারতবর্ষের ভূমির ফলন শক্তি বেশি, এখানে প্রায় জমিতেই বৎসরে তিন বার ফসল হইত, অথচ ভূমির তুলনায় জনবসতি তখন বিরল ছিল; (৪) বিজেতা ও অন্যান্য জাতির আগমে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যেই এখানে জনতন্ত্রী চিন্তার অবসান হয়—এবং ইহার পর হইতে দীর্ঘ দিন ধরিয়া ভারতবর্ষে একতান্ত্রিক সামন্তনায়কতার কাল চলিয়া আসিয়াছে; সর্বশেষে (৫) সংস্কৃতি ও বিচারধারা পরিবর্তনে ভারতবর্ষের ধর্ম বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে নাই—নূতন ধর্ম প্রবর্তনের পরও এখানে সাধারণ জনতা তাহাদের পূর্বাচরিত ধর্মে আসক্ত থাকিয়া গিয়াছে।

রাজতন্ত্র যে আমাদের পূর্ব আলোচিত সামন্তবাদেরই অন্তর্গত তাহা আমরা একাধিকবার বলিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই রাজাকে সামন্ত ও প্রজার স্বার্থবিরোধিতা হইতে উচ্চে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় যে সামন্তপণা ছাড়িয়া দিলে রাজার রাজ্য বা রাজত্ব টিকে না; নিজ জায়গীরের মধ্যে রাজাও অন্যান্য সামন্তের মতই একজন সামন্ত—তবে প্রধান সামন্ত। কিন্তু প্রধান সামন্তও কমীনকে* আধপেটা খাওয়াইয়াই

* কমী, Serf.

নিজের সুখবিলাসের জন্য পরিশ্রম করান ; এবং অন্যান্য সামন্তের মতই দরিদ্রের নিকট হইতে সামন্তশাহী নজর নজরানা আদায় করেন—আর বংশরক্তের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য তিনিও সামন্ত ছাড়া অন্য পরিবারে বিবাহ করিতে চান না। তবু পার্থক্য হইল সাধারণ জনতার অতি ক্ষুদ্র অংশই রাজার প্রকৃত রূপের পরিচয় পায়—আর অন্য সকলেই মনে করে তিনি অনুক্ষণ ন্যায়ের পাল্লা হাতে ধরিয়া বসিয়া থাকেন। এই লোকদৃষ্টির কথা ছাড়া আর্থিক ব্যাপারেও রাজায় ও সামন্তে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়—সমাজে ব্যাপারীর সৃষ্টি হইলে ভেট ও নজরানা বাবদ রাজার এক নূতন আয়ের পথ সৃষ্ট হয়। তখন সাধারণ প্রজা ও ব্যাপারীতে বিবাদ হইলে রাজার রায় সর্বদা ব্যাপারীর পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু এই বিবাদ সামন্ত ও ব্যাপারীর বিরোধী স্বার্থের জন্য হইলে রাজা বিব্রত বোধ করেন—তবে ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির আশা বেশি হইলে সেখানেও ব্যাপারীর পক্ষে বাজিমাৎ হয়—আর ইহার ফলে ব্যাপারীরাও চতুর্দেশে রাজার ন্যায়পরতার ঢেঁড়া পিটাইয়া দেয়।

এই ব্যাপারী ছাড়া আর একটি শক্তিশালী মেশিনও রাজার পক্ষে প্রোপাগাণ্ডার কাজ করিত : সমাজ-ব্যবস্থার অনুকরণে পৃথিবীতে দেবদেবী ও স্বর্গ-নরকের কল্পনা হয়—সামন্ত যুগে এই সব ধর্মবিশ্বাসই আবার রাজার মহিমাবর্ধনের সহায়ক হইয়া পড়ে—তাঁহাকে দেব-অংশ মনে করিয়া 'দেব' সম্বোধনে অভিহিত করার মূলেও তখন ইহাই কারণ। কিন্তু এই নূতন অভিধার প্রভাবে মানুষ ক্রমে রাজাকে বর্গপ্রভাবের উর্ধ্বে বলিয়া ভাবিতে শিখে—আর সমাজের সর্বাপেক্ষা বাচালশ্রেণী পুরোহিতেরা এই শিক্ষায় তাহাদের সহায়ক হয়। যুনানী দার্শনিক প্লেটোও সমাজে এইভাবে নূতন রাজ্যশাসন প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার সমাজ-ব্যবস্থা যে হিন্দু বর্ণ-ব্যবস্থার

অনুরূপ ইহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। প্লেটো ইহাতে অসমর্থ হইলেও প্রোপাগাণ্ডার মূল্য যে তিনি বুঝিতেন, তাহা লক্ষ্য করিবার। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলে মিলিয়া নিজ স্বার্থে রাজপক্ষীয় প্রচার চালাইয়াছে—এবং জনসাধারণও তাহাকে ধার্মিক প্রচারের সমতুল মনে করিয়া সহজেই মানিয়া নিয়াছে।*

৭। রাজ্য ও শাসন

শাসনশক্তি চিরদিনই মানুষের আর্থিক ও সামাজিক কর্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে—কিংবা বলিতে পারি, এই সকল প্রয়োজনেই সমাজে চিরকাল ইহার প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্বে সমাজে ব্যৈক্তিক সম্পত্তি না থাকায় তাহার শাসনযন্ত্রও বরাবরই সমদর্শী ছিল—কিন্তু সম্পত্তি ব্যৈক্তিক হইবার পর নূতন ব্যক্তিস্বার্থের আঘাতে তাঁহাতেও পরিবর্তন আসে; তখন সমাজের শাসনযন্ত্র পূর্বলক্ষ্য হারাইয়া ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় মনোযোগী হয়—এবং ইহার ফলে পুরাতন জনতন্ত্রের নিয়ম, শাসন, গঠন সমস্তই ভাঙ্গিয়া যায়। এঙ্গেলস্ এই কারণেই এই পরিবর্তনের বর্ণনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন: জনের গঠন সম্পূর্ণ হইলে তাহা ফাটিয়া গিয়া সমাজকে বর্গরূপে ভাগ করিয়া দিল; আর এই বর্গরূপের মধ্য দিয়াই জন হইতে রাজ্যেরও স্থাপনা হইল।

বর্গযুক্ত সমাজে প্রাচীন জন-ব্যবস্থা যে টিকিতে পারে না তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারি; জর্মনীর সমাজও একদিন—এমন কি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক অবধিই জনসত্তাক ছিল; রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া তাহাতে অধিকার স্থাপনার পর † জর্মনীর জনসত্তা পরিত্যক্ত

* ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যেমন সহজেই প্রতারিত হয়, রাজপক্ষীয় প্রচারেও তাহারা তেমনই সহজে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে; † ইহার কালও খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দ।

হয়। ভারতবর্ষেও দেখি, আর্যদের আগমনকালে তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পিতৃসাত্তিক ছিল—এমন কি প্রাচীন জন-সমাজের স্মৃতিকেও আর্যগোষ্ঠী তখন একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় নাই; কিন্তু সিন্ধুর * সমৃদ্ধ জাতিকে পরাস্ত করিবার পর তাহাদের পিতৃ-সাত্তিক সমাজেও ভাঙ্গন ধরে—এখানেও নূতন রাজ্য ও প্রজার উপর অধিকার স্থাপনায় প্রাচীন পিতৃতন্ত্র নষ্ট হইয়া যায়—আর তখন স্বাভাবিক ভাবে জনসত্তার স্থানে বর্গশাসনসম্পন্ন সামন্ততন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা হয়।

রাজ্যের কল্পনা কখনও উপর হইতে টপকাইয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি জনব্যবস্থার পর সমাজে বর্গ বিভেদের সৃষ্টি হয়—তখন রাজ্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমাজের গঠন অক্ষুণ্ণ রাখার আর উপায় ছিল না। এইজন্য রাজ্যব্যবস্থা ঈশ্বরীয়ও নয়, আকাশীয়ও নয়—তাহা সমাজেরই সৃষ্টি, বলিতে পারি এক বিশেষ স্তরের সৃষ্টি। এই বিশেষ স্তরে সমাজের বৈষম্যগুলিকে আর সমন্বিত করা চলিতেছিল না—তাই শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই সব বিষমতার † একটি সমাধানের চেষ্টা হইতেছিল—রাজ্য সমাজ-বৈষম্যের এই আপাতব্যবস্থিত সমাধান, এই হিসাবে সে সমাজেরই উপজ। কিন্তু সমাজের উপজ হইয়াও রাজ্য চিরদিন সমাজ হইতে ঊর্ধ্বে থাকিতে চায়, এমন কি সমাজের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক স্বীকার করিতেও সময় সময় কুণ্ঠা বোধ করে।

রাজ্য উদ্ভূত হইবার পূর্বে একবংশিক পরিবারগুলি ‡ আর্থিক ও সামাজিক গঠনের দিক্ হইতে একক ছিল—অর্থাৎ ভিন্ন পরিবার

---

* সিন্ধু উপত্যকার; † বিষমতা অর্থে বর্গবিষমতা, বিরোধী স্বার্থের বিষমতা; ‡ একস্থানে বসতিশীল এক শোণিতসম্পর্কের পরিবার।

বা ভিন্ন গোষ্ঠীর সংগঠনের সঙ্গে ইহাদের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু রাজ্যের সৃষ্টি হওয়ার পর এইরূপ পারিবারিক বা একগোষ্ঠিক স্বাতন্ত্র্য আর সম্ভব হয় নাই—তখন এক প্রদেশের বহু বংশ, বহু বর্ণ ও সংস্কৃতিসভ্যতার মানুষ * এক সংগঠনের অন্তর্গত হয়। † এঙ্গেলস্ এথেন্স ও রোমের এই পরিণতির উপর মন্তব্য করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছিলেন: প্রাচীন রক্তগত সংগঠন ভাঙ্গিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে কত কালক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রয়োজন হইয়াছিল কে বলিবে? ভারতবর্ষেও আর্য অনার্যের বর্ণ বৈষম্যের প্রশ্ন তুলিয়া এই প্রাচীন শোণিতসম্বন্ধকে স্থায়ী রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু পিতৃসত্তাযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শনের অভাব হইতে এখানে তাহার অসাফল্যেরও প্রমাণ পাই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আর্যদের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস—তখন গঙ্গা উপত্যকায় উত্তরাপথের আর্যদের বসতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের নূতন সমাজ সংগঠিত হইয়াছে—এবং রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রাজ্য সমাজের উচ্চবর্গের ব্যৈক্তিক স্বার্থ রক্ষার জন্যই একদিন স্থাপিত হইয়াছিল—তাই এই নীচ কর্তব্য পালনে অন্য শক্তি অপেক্ষা পাশবিক শক্তিই অধিক উপযোগী হয়। পূর্বে জন-সংগঠনে জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন অপর কোন সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না; তখন একমাত্র জনমতই জনসমাজের সমস্ত কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণের কর্তা ছিল—তাই বাহিনীর অস্তিত্ব ছাড়াও তখন জনের সকল সমর্থ ব্যক্তিই জনস্বার্থে যুদ্ধ করিত। কিন্তু রাজ্যের বেলায় এইরূপ সামগ্রিক

---

* শুধু বিভিন্ন সংস্কৃতিসভ্যতার মানুষই নহে, এক সংস্কৃতিসভ্যতার বিভিন্ন স্তরের মানুষও; † ইহা কোনরূপ বর্ণ সমন্বয় নয়, রাজ্যের সকলের নাগরিক অধিকার।

যুদ্ধোদ্যোগ আর ততটা সম্ভব হইতে পারে না *—কারণ, রাজ্য নিজেকে উপরে, অর্থাৎ জনতার মিলিত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য রাজ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুরক্ষার জন্য সৈন্যসৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়; আর সৈন্য সৃষ্টি করিতে গেলে রাজ্যবাসীর উপর করের ভারও অনিবার্য হইয়া পড়ে। ইহার পর অস্ত্র বা দুর্গ নির্মাণের ব্যয়াধিক্যের জন্য করের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়—ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যের শক্তি এবং রাজ্যের অন্তর্দ্বেষের প্রবলতার জন্য তাহা পূর্বাপেক্ষাও বর্ধিত হয়। এইভাবে সাধারণ জনতা করদানে অক্ষম হইলে রাজ্য তাহাদের প্রতিশ্রুত করের উপর ঋণ গ্রহণ করে †—তখন এই ঋণের অর্থ হইতেই সৈন্যসজ্জা এবং অন্যান্য যুদ্ধোদ্যোগের ব্যয় নির্বাহ হয়।

রাজ্য সমাজের উপজ হইলেও অধিকার ও ক্ষমতার দিক্ হইতে তাহা সমাজ হইতে ভিন্ন। আজ সাধারণ সিপাহীও ব্যক্তির উপর জনসমাজের সমগ্র পঞ্চায়ৎ হইতে বেশি কর্তৃত্ব দেখায়—ইহার কারণ এই যে পুলিশ বা সিপাহী রাজ্যেরই প্রতিনিধি, আর রাজ্যও ব্যক্তি বা সমাজের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জনসংস্থা নিজেকে ব্যক্তি বা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঊর্ধ্বে সমাসীন করে নাই—তাই রাজ্যের শাসক বা সেনানায়কের শক্তি যতই হউক না কেন শ্রদ্ধা-সম্মান জননায়কেরই বেশি ছিল। ইহা ছাড়া রাজ্যের শাসক বা নায়কের যে মহিমা-গৌরব তাহা রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায়ই সৃষ্ট হয়—কিন্তু জনসমাজের নায়কের জন্য সমাজের ঊর্ধ্বস্তর হইতে এইরূপ কোন পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিল না। জননায়ক নিজেকে সমাজের উপরে তুলিয়া লইয়া সমাজ হইতে তাহার বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা

* বর্তমান টোটেলিটারিয়ান রাজ্যের সামগ্রিক যুদ্ধোদ্যোগের কারণ ইহা হইতে ভিন্ন; † ইহা প্রায় আধুনিক কালের কথা।

করে নাই—এইজন্য জনসমাজের স্থিতিকাল পর্যন্ত তাহার শ্রদ্ধা-সম্মান স্বাভাবিক ছিল এবং রাজ্যের নায়ক হইতে তাহা অধিকও ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি রাজ্য শুধু মাত্র বিত্তবানদেরই সংগঠন—তাই বর্গস্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া ইহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। সামন্তবাদী রাজ্যের কার্য হইল কৃষাণ ও কর্মীনকে * দাবাইয়া রাখা—এবং সাধারণের উপর ঋণ ও করের ভার চাপাইয়া রাখা। সম্পত্তি-রহিতেরা যাহাতে লোভভরা দৃষ্টিতে না তাকায় এইজন্য সামন্তরাজ্যের সৈন্যসজ্জা, অথচ অপর রাজ্যের উপর তাহার নিজের লোভের জন্যই † আবার তাহার যুদ্ধোদ্যোগ। এইভাবে রাজ্যেব স্বার্থভিত্তিকতা বুঝিলে তাহা যে চিরকালীন নয় ইহাও বুঝিতে পারি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই রাজ্য কোন অনাদি যুগ হইতে ভূপৃষ্ঠে চাপিয়া বসিয়া নাই—প্রাচীন সমাজের আচারনীতি বা সংঘবোধ এইরূপ ছিল যে তখন রাজ্যের প্রয়োজনই হইত না। রাজ্যের মূল কারণ হইল বর্গভেদ, বর্গভেদ হইতেই রাজ্যের উদ্ভব, এবং বর্গভেদের অবসান হইলেই রাজ্যেরও অবসান। তাই রাজ্যকে বিলুপ্ত করিবার জন্য অরাজকবাদের ‡ আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই—ইহার মূল উৎপাটন করিতে হইলে বর্গব্যবস্থার নিরসনই একমাত্র উপযোগী কাজ।

৮। ধর্ম, দর্শন ও সদাচার

(১) ধর্ম—পিতৃসত্তা যুগেও প্রাকৃতিক শক্তি এবং মৃত পিতরদের আত্মা সম্পর্কে মানুষের ভয় ছিল। বুদ্ধ এইরূপ ভয়ের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া একস্থানে § বলিয়াছেন :—

'অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমীর রাত্রে...আমার নিকট মৃগ আসে,

---

* Serf, কর্মী, শ্রমিক ; † পূর্বে রাজা কৌরব্যের উপাখ্যান দ্রষ্টব্য ; ‡ Anarchism ; § ভয়ভৈরবসুত্ত, মজ্ঝিমনিকায় ৪, পৃঃ ১৪।

ময়ূর গাছ হইতে কাঠ ভাঙ্গিয়া ফেলে, বায়ু বহিয়া পত্রপল্লব শিহরিত হয়, আমার তখন মনে হয়—হয়ত বা ভয়ভৈরব আসিতেছে…কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা রাত্রিতে দিন অনুভব করেন, এবং দিনে তাঁহাদের রাত্রি অনুভূত হয়…আমি ইহাকে শ্রমণ ব্রাহ্মণদের সম্মোহ * বলিয়া বলি।'

বস্তুত, মানুষের এইরূপ ভীতিজাত সম্মোহের ফলেই ভূত-প্রেত ও দেবতাবর্গের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রারম্ভিক অবস্থায় এইসব ভয়ভৈরবের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য মানুষ পূজা-বলির বিধান করিয়াছিল—সেই সময় ভয়বারণী উৎকোচাদি ছাড়া ধার্মিক ক্রিয়াকলাপ আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু বর্গসমাজের সঙ্গে সঙ্গে এই সরল ধর্মবোধই পূজা-বলির পর্ব ছাড়াইয়া ক্রমশ জটিল হইয়া উঠে—কারণ তখন মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে শাসকেরা নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য নিয়োগ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দী-আর্যদের ধর্ম ও দেবতা-বিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে এই সত্য আমরা আরও সহজে উপলব্ধি করিতে পারি :—

হিন্দী-আর্যেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার সময় তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা পিতৃসাত্তিক ছিল ; কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে জনযুগের স্মৃতি তাহারা তখনও একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। আর্যদের তখনকার দেবতারাও ঠিক তাহাদের মতই পিতৃসাত্তিক সমাজের অধিকারী ছিল—তবে দেবসমাজে পিতৃসত্তা অপেক্ষা জনসমাজের আচার-নীতির প্রভাব কিছু বেশি হইতে পারে। পৃথিবীতে দেখি, তখন যূথমৈথুন পরিত্যক্ত হইয়া পতিপত্নী সম্পর্ক স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু দেবলোকে তখনও মৈথুনাদি ব্যাপারে পিতৃসাত্তিক সমাজের নিশ্চয়তা আসিতে পারে নাই : সেই সময়ও দেবাঙ্গনারা পূর্বেকার

* Hypnotisation.

যুথাচরিত রীতিতে সাময়িক বিবাহে ব্রতী হইতেছে—এবং সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে অন্যপূর্বা নারী অপরে আসক্ত হইতে দ্বিধা করিতেছে না। প্রাচীন বেদমন্ত্রে দেখি, ঋষি দেবতার স্তুতি করিতে তাঁহার সমস্ত গুণই ব্যক্ত করিয়া দিতেছেন—ইহার কারণ এই যে তখনও ইন্দ্র, বরুণ বা সোমের ছোট বড় হইবার সীমা নির্দিষ্ট হয় নাই। পৃথিবীতে ব্যক্তি সমষ্টির স্থান অধিকার করিবার পর দেবতাদের মধ্যেও নিজ অধিকার নিশ্চিত হয়—ইহার পর হইতে কখনও * ইন্দ্র, কখনও বা † ব্রহ্মা, এবং কখনও ‡ শিব বা বিষ্ণু সর্বোচ্চ বিবেচিত হন। সামন্ত যুগের মধ্যাহ্ন সময়ে § দেবলোক, মৃত্যুলোক প্রভৃতিরও এক একটা কাল্পনিক রূপ নির্দিষ্ট হইয়া যায়—ইহাতে মানবকেও তখন দেবতা কিংবা দেব-অংশ-সম্ভূত অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ হয়, এমন কি ষোল হাজার নারী-পরিবৃত কৃষ্ণবাসুদেবকে দেবদেব বা পরমদেব আখ্যা দিতে বাধা থাকে না। ¶

বৈদিক কালের সমাজও তাহার আভ্যন্তরীণ স্বার্থসংঘাত এবং বর্গ ও বর্ণভেদজাত বিদ্বেষে ⊥ জর্জর ছিল; এইজন্য পরবর্তী বেদমন্ত্রে সমাজকে শরীর এবং বিভিন্ন বর্গকে তাহার প্রত্যঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়। বর্গ-ব্যবস্থার এই অ-লৌকিক যুক্তি খাড়া করিয়াও সাধারণ মানুষকে তাহার স্বার্থ ভুলানো গেল না—তাই পরে এই বর্গ বৈষম্যকে আবার ঈশ্বরের মর্জি ও পূর্বজন্মের কৃতফল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল। বেদে আমরা পরলোকের কল্পনা পাইতেছি, কিন্তু পুনর্জন্ম সম্বন্ধে তাহাতে কোনরূপ উক্তি পাইতেছি না; বৈদিক বিচারে মানুষ পৃথিবীতে একবার মাত্র জন্ম লয় এবং সেই জন্মে সে সুকর্ম

---

* বৈদিক কালেই; † উপনিষদ্ কালে; ‡ আর্য অনার্যের ধার্মিক সমন্বয়ের সময়; § গুপ্তযুগে; ¶ রাসকেলির উপাখ্যান স্মরণীয়; ⊥ এই বিদ্বেষ বিশেষ করিয়া নিম্নবর্গের দিক্ হইতে।

দুষ্কর্ম উভয়ই করিতে পারে—তবে মৃত্যুর পর জীবৎকালের কর্মানুসারে তাহার স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তি ঘটে। য়িহুদি, ঈসাই এবং ইস্লাম ধর্মের অনুশাসনেও পরলোক বা জন্মমৃত্যুর ধারণা বেদের অনুরূপ। কিন্তু ইহাতে পৃথিবীর ছোট বড় কিংবা ধনী নির্ধন পার্থক্যের কোনরূপ কারণ নির্ণীত হয় না—বরং ঈশ্বরের দৃষ্টি যে পক্ষপাতদুষ্ট এই ক্ষেত্রে শুধু ইহাই প্রমাণিত হইতে পারে। তাই আর্থিক বৈষম্যকে যুক্তিসহ করিবার জন্য উপনিষদের ঋষি পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন। ঋষির বিচারে—

'ধনী কেন?
পূর্বজন্মে দান পুণ্য প্রভৃতি সৎকর্মের জন্য।'

কিন্তু, 'দরিদ্র কেন?
পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির জন্য।'

আর, 'রাজা কেন?
জন্মান্তরের কঠোর তপস্যার জন্য।'

এইভাবে জন্মের পৌনঃপুনিকতা আবিষ্কার করিয়া বর্গস্থিতি রক্ষায় হিন্দুরাই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখায়—ঋষির জন্মসিদ্ধান্তের বলে এখানে সামাজিক অচলতা সৃষ্টি করা অন্যস্থান হইতে অনেক সহজ হইয়াছিল। মিশরের প্রাচীন ধর্মে যে পরলোক-বিশ্বাস ছিল, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে এক লেখক একস্থানে * বলিতেছেন; 'প্রত্যেক ব্যক্তিই পরলোকে নিজ নিজ কৃত কর্মের উপযুক্ত ফল পাইবে বলিয়া মনে করে ...এই বিশ্বাস তাহাদের উপর এক প্রবল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের রূপ ধারণ করিয়াছে...পরলোকে নিজেকে পুণ্যাত্মা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে সমাজবিধান † মানিয়া চলিতে হয়।'

* The Development of Social Thought—Emory S. Bogardus, p. 30. † অর্থাৎ বর্গস্বার্থপূর্ণ সম্পত্তিবিভাগ।

আজ পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, য়িহুদি, ঈসাই বা ইস্লাম—তাহার সমস্তই সামন্ত যুগের উপজ; এবং সামন্ত যুগের উপজ বলিয়া ইহারা চিরদিনই এবং স্বাভাবিকভাবেই সামন্ততন্ত্রের পোষক। ধর্মে আজকাল মুক্তির যে নিরাকার রূপ দেখা যায় তাহা সাকার ভৌতিক সত্যের * সঙ্গে অজ্ঞেয় কল্পনার বিরোধের ফল †—কিন্তু ইহার পূর্বে সকল ধর্মেই সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ সামন্ত পরিবারের আদর্শে স্বর্গ বা দেবলোকের কল্পনা হইয়াছে। হিন্দুদের বৈকুণ্ঠের দৃষ্টান্ত দেখুন,—সেখানেও বিলাসী রাজার প্রমোদশালার মত গুচ্ছ গুচ্ছে সুরসুন্দরীরা বিরাজ করিতেছে—তাহাদের চির-অমলিন বসন, রত্নজটিত ভূষণ, এবং পুষ্প ও গন্ধসারসংপৃক্ত তনু—তদুপরি নৃত্য, গীত, সুরা, সমস্তে মিলিয়া চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নর্মশালার দ্বার খুলিয়া দিতেছে। রামানুজের 'বৈকুণ্ঠ গদ্য' পড়িয়া দেখুন, দেখিবেন সংযত ভাষায় এক ভয়ভীত দর্বারী কবি কোন হর্ষবর্ধন বা রাজেন্দ্র চোলের অন্তঃপুর বর্ণনা করিতেছে। তবে দেবতাদের প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে পত্নী গ্রহণের বেলায় তাঁহারা প্রথমত এক পত্নীতেই তৃপ্ত হইতেছেন; ‡ কিন্তু রামানুজ তাঁহার প্রথম জীবনের আচার্যের মত অনুসারে লক্ষ্মীর অসাপত্ন্য ক্ষুণ্ণ করিতে ছাড়েন নাই—বিষ্ণুর এক উরু শূন্য থাকিবে বলিয়া বিচলিত কবি তাহার উপর আনিয়া নীলা দেবীকে বসাইয়া দিয়াছেন।

বৌদ্ধ ও জৈনেরা হিন্দুদের মতই দেবলোকে অবিশ্বাস করে না—কিন্তু নির্বাণ ও সিদ্ধশিলা তাহাদের নিকট আরও শ্রদ্ধার বস্তু। বৌদ্ধ-জৈনদের দেবলোকও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সামন্ত রাজাদিগের

---

* Material truth; † এই বিরোধেই দর্শন শাস্ত্রের সূত্রপাত; ‡ এই পত্নী গুপ্তযুগের 'ধর্মপত্নী', ধর্মপত্নী এক হইবে—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কামপত্নী অনেক হইতে বাধা নাই।

বিলাস-ব্যসনের চিত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। পালিগ্রন্থে * দেবরাজ ইন্দ্রের বুদ্ধ সমীপে আগমন করিবার যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত হইবে :—

"ইন্দ্র সভা ত্যাগ করিয়া গীতবিদ্ পঞ্চশিখের সঙ্গে বুদ্ধ সমীপে উপস্থিত হইলেন···বুদ্ধ তখন এক নির্জন পর্বত-গুহায় ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন...ইন্দ্র বলিলেন, 'পঞ্চশিখ, তুমি সঙ্গীত দ্বারা ভগবান্ বুদ্ধকে প্রসন্ন কর...ইন্দ্রের আজ্ঞায় পঞ্চশিখ বীণা তুলিয়া লইয়া নিজের প্রণয়গীতি আরম্ভ করিল :—

'ভদ্রা সূর্যবর্চসা, তোমার পিতা তিম্বরুকে আমি বন্দনা করি—কারণ তিম্বরু হইতেই তুমি আমার আনন্দবিধায়িত্রী হইয়া জন্ম নিয়াছ···

'ঘর্মাক্তের নিকট যেমন বায়ু, পিপাসিতের নিকট যেমন বারি—হে কল্যাণি, তুমিও আমার নিকট সেইরূপ প্রিয়...

'রুগ্নের নিকট যেমন ঔষধ, ক্ষুধিতের নিকট যেমন অশন, এবং প্রজ্বলিতের নিকট যেমন জল—ভদ্রে, আমার নিকটও তুমি ঠিক সেইরূপ ···কল্যাণি, তুমি আমাকে শান্তিদান কর, তোমার আলিঙ্গনই আমার একমাত্র কাম্য...'

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলে পঞ্চশিখ বলিয়াছিল—

"এক সময় আমি গন্ধর্বরাজ তিম্বরুর কন্যা সূর্যবর্চসার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম; কিন্তু সূর্যবর্চসা আমাকে না চাহিয়া মাতলি সারথির পুত্র শিখণ্ডির প্রতি আসক্ত হয়···আমি সূর্যবর্চসাকে না পাইয়া একদিন ঊষাসময়ে তিম্বরুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম...সেখানে বীণা বাদন করিয়া গান করিতেছি এমন সময় ভদ্রা অঙ্গনে আসিয়া দেখা দিল··· আমার গীতে ভগবান্ বুদ্ধের প্রশংসা ছিল, সূর্যবর্চসা তাহা শুনিয়া পুলকিত হইয়া বলিল, 'মিত্র, এই ভগবান্‌কে আমি কখনও প্রত্যক্ষ

* সক্কপঞ্হ সুত্ত, দীর্ঘনিকায় ২১৮, পৃঃ ১২২।

দর্শন করিতে পারি নাই—কিন্তু ত্রয়স্ত্রিংশ ইন্দ্রলোকে দেবসভায় নৃত্য করিতে গিয়া তাঁহার বিষয়ে আমি শুনিয়াছি……আজ তুমি ভগবান্ বুদ্ধের যে নামকীর্তন করিলে তাহাতেই আমাদের সমাগম সম্ভব হইল।"

প্রসঙ্গ শেষ করিয়া পঞ্চশিখ বলিল—

"সূর্যবর্চসার সহিত আমার একদিনই মিলন হইয়াছে, কিন্তু ইহার পর তাহাকে আর পাই নাই।"

উপরের উদ্ধৃতিতে দেবলোকের নৃত্য, গীত ও প্রণয়ে বুদ্ধের সমকালীন অজাতশত্রু বা উদয়নের রাজসী জীবনের ছায়া দেখিতে পাই। ভদ্রা সূর্যবর্চসার সুলভ প্রেম যে তখনকার গণিকাদের চরিত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে ইহা বুঝিতেও আমাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। ইস্লামের জন্নৎ * বর্ণনায়ও আঙ্গুরবাগ, ছায়া, শীর্ণস্রোতা নদী, এবং মোতির-মত-চোখ অপরূপা হুরীদিগকে † দেখিয়া তাহাকে খুস্রো পর্বেজ ‡ বা মোরিশের ¶ রাজমহল বলিয়া চিনিতে পারি। ঈসাই ও য়িহুদিদের স্বর্গও হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইস্লাম ধর্মের মত সামন্ত জীবনের সুখ-বিলাসের আদর্শ লইয়াই রচিত হইয়াছে।

(২) **দর্শন**—আদিম সমাজে মানুষের জীবন তাহাদের শরীর-যাত্রার জন্য শ্রমেই ব্যয়িত হইয়া যাইত—তখন মানবশ্রমের শক্তি এত অধিক ছিল না, এবং তাহাতে নিপুণতাও যথেষ্ট কম ছিল। তাই একদিন উপার্জন করিয়া চারদিন বসিয়া খাওয়া তখনকার যুগে সম্ভব হইত না; আর, একজনের বাড়তি কামাই যে আর-একজন ভোগ করিবে ইহাও তখন অসম্ভব ছিল। এইজন্য আদিম সমাজে বর্গ হিসাবে কোন সিদ্ধান্তিক §

---

* স্বর্গলোক; † স্বর্গকন্যা; ‡ ইরাণী শাহ (৫৯০ খ্রীঃ?); ¶ রোম সম্রাট (মৃত্যু ৬০২ খ্রীঃ); § Theoretician.

বা বিচারকবর্গের * সাক্ষাৎ পাই না। কিন্তু পরবর্তী যুগে উৎপাদনের নূতন সাধন আবিষ্কৃত হওয়ায় শ্রমের সৃষ্টিক্ষমতা বাড়িয়া যায়; তখন বহুর শ্রমসৃষ্ট ফল ভোগ করিয়া সমাজের সংখ্যাল্পবর্গ জীবনাতিপাত করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে কায়িক শ্রমের দায়মুক্ত হইয়া ইহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও কলার † দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী হয়—এবং ক্রমে এই দায়িত্বই সমাজের জ্ঞানভাণ্ডারের উপর তাহাদের একচেটিয়া উত্তরাধিকার জন্মাইয়া দেয়।

হেরাক্লিতাস্ ┼ ও প্লেটোর ‡ দর্শন নির্মাণের সময় য়ুনানী সমাজ দাসদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল। দাসেরা তখন প্রভুর § সচল সম্পত্তি, অর্থাৎ বলদ গরুর মত ইহাদিগকে হাটে বাজারে বিক্রয় করিতে কোন বাধা ছিল না। ¶ হেরাক্লিতাস্ সমাজের এই আভ্যন্তরিক সংঘর্ষকে অনেকটা চিনিতে পারিয়াছিলেন—আর এই সকল সংঘর্ষ যে নবনির্মাণের সূচক তাহাও তিনি অনুভব করিয়াছিলেন—তাই হেরাক্লিতাসের দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য কথা হইল, 'সংঘর্ষই ঘটনার জনয়িতা'। হেরাক্লিতাস্ নিজে এথেন্সের এক উচ্চ আমীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কিন্তু সেখানকার ব্যাপারী সম্প্রদায়ও তখন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল; হেরাক্লিতাস্ ইহা লক্ষ্য করিয়াই ‖ তাঁহার সংঘর্ষবাদী দর্শনের সূত্র আবিষ্কার করেন—তবে সামাজিক পরিবর্তনের বেলায় তিনি নিজে হয়ত বণিকশক্তির হ্রাসই কামনা করিতেন।

প্লেটোর জন্মের পূর্বে দারয়োশ ॥ ও ক্ষয়ার্শের ‡ আক্রমণে য়ুনানীদের

---

* Critic, Thinker, Philosopher ; † শুধু বিজ্ঞান, দর্শন বা কলা নহে, এতৎসঙ্গে শাসনও ; ┼ খ্রীঃ পূঃ ৫৩৫-৪২৫ ; ‡ খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭ ; § বড় বড় দাসপতির ও সামন্তদের ; ¶ মনে রাখিতে হইবে ইহা দর্শনের এক সমৃদ্ধতম যুগের কথা ; ‖ সামন্ত ও বণিকদের বিরোধী শক্তি ও স্বার্থের সংঘর্ষ দেখিয়া। ॥ খ্রীঃ পূঃ ৫৮১-৪৮৫ ; ‡ খ্রীঃ পূঃ ৪৮৫-৪৬৬।

অপর ধনজনের হানি হয়—ইহার ফলে এথেন্সীয় প্রজাতন্ত্রের তরুণ আশাপূর্ণ জীবন নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। প্লেটো তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবী হইতে প্রকৃতই কোনরূপ শান্তি বা সমৃদ্ধির আশা করিতেন না—এইজন্য তাঁহার দর্শনও বাস্তবিক পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া এক অপার্থিব লোকে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে। * প্লেটোর নিকট এই বাস্তবিক পৃথিবী অসার, অনিত্য, এবং তাহা অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল; তাঁহার কল্পিত জ্ঞানময়ী পৃথিবীতে অনিত্যতা নাই, অসারতা নাই, দোষ ত্রুটি প্রমাদের কণামাত্রও সেখানে দেখা যায় না। এইক্ষেত্রে মনে রাখিতে হয়, প্লেটো কল্পচারী হইয়াও তৎকালীন সমাজ-দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—তিনি বর্গসংঘর্ষের মূলে পৌঁছিয়া তাহার বিশ্লেষণ ও প্রতিকার নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে প্লেটোর অসার অনিত্য পৃথিবীর পক্ষে ব্যাধিই কি আর তাহার চিকিৎসাই বা কি? † এই প্রকার কল্পদৃষ্টির জন্যই প্লেটো বর্গসংঘর্ষের স্বরূপ বুঝিয়াও তাহার প্রতিকার নির্দেশে সক্ষম হন নাই—তিনি বাস্তবিক পৃথিবী হইতে মানুষকে উর্ধ্বলোকে ঠেলিয়া দিয়া তাহাদের দুর্গতি-মোচনের পন্থানির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ মানুষ লাভবান না হইলেও সম্পত্তিবান শাসকদের পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই অনুকূল হইয়াছিল। কিন্তু সমাজের নিম্নতর বর্গের বেলায় প্লেটোর দর্শনকে তাহাদের দ্বেষবিদ্বেষ ও উৎসাহের উপর জল ঢালিতেই দেখি—কারণ প্লেটোর সিদ্ধান্তমতে অবাস্তব পৃথিবীর সুখসুবিধার জন্য বর্গবিগ্রহ করিয়া লাভ নাই—তাহা অপেক্ষা শাশ্বত জগতের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই হইবে বুদ্ধিমানের কাজ।

---

* ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; † অর্থাৎ পৃথিবীকে অসার মনে করায় প্লেটোর hypothesis বা পূর্বসিদ্ধান্তই ভুল।

দর্শন সম্পর্কে আমি অন্যত্র * আলোচনা করিয়াছি, এইজন্য বিশেষ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে মূল কথা এই যে সমাজে নিম্নতর বর্গের শ্রমের ফলেই দার্শনিকের জন্ম সম্ভব হইয়াছে—এবং সেই দর্শন-শাস্ত্রই পরিণামে তাহাদিগকে ক্ষতি ও দুর্গতির চরম সীমায় ঠেলিয়া দিতেছে—ইহা সকল সময় দার্শনিকের ইচ্ছাকৃত না হইতে পারে, কিন্তু দর্শনের পক্ষপাত ইহাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না। প্রাচীন য়ুনানী দার্শনিকের বিচারধারাকেও বর্গ দৃষ্টিতে † এইরূপ পক্ষপাতদুষ্ট দেখা যায়। শাসকেরা প্রথমে দেববাদ ও ধর্মের সহায়তায় অনুচিত সম্পত্তিকে ‡ উচিত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বাড়িলে ধর্ম ও দেবতাকে সকলে আর সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল না। তখন এই সন্দেহ ও স্বতন্ত্র চিন্তাকে চাপা দিবার জন্যই সমাজে দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব হয়—এবং এইবার দেবদ্বেষী বিচারবুদ্ধি দর্শনের ব্যূহপথে পড়িয়া সত্যই দিশাহারা হইয়া যায়।

সমগ্র ভারতীয় দর্শনকেও আমরা এইরূপে সামন্ত যুগের দান বলিতে পারি—প্রাচীন য়ুনানী দর্শনের মত ইহাও সমাজের নিশ্চিন্ত-জীবিকা মানুষের চিন্তার ফল। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টিতে সামন্তদের প্রভাব অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি ছিল—প্রবাহণ জনক বৈদেহ বা অশ্বপতি কৈকেয় প্রভৃতি রাজা উপনিষদের দর্শনতত্ত্বের অন্যতম নির্মাতা ছিলেন। দক্ষিণালোভী পুরোহিতেরা যজ্ঞবলির প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধিত অবিশ্বাসকে ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না—কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা ইহা লক্ষ্য করিয়াই কর্মকাণ্ডের উপর ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যূহ রচনায় উদ্যোগী হয়। § বৈদিক ঋষি প্রকৃতই যথার্থবাদী ছিলেন—পৃথিবীকে তিনি যেমন

---

* দর্শন দিগ্দর্শন দ্রষ্টব্য ; † অর্থাৎ বর্গহিতের দিক্ হইতে ; ‡ নিজেদের বৈয়ক্তিক সম্পত্তিকে ; § ইহা একেবারে নিরপেক্ষ হইয়া নহে—তবে ইহার প্রাথমিক উদ্যোগ ক্ষত্রিয়দের।

দেখিতেন, সেইরূপই স্বীকার করিতেন; এই স্থান হইতে চরম সুখ ও তৃপ্তি লুটিয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—স্ত্রী-পুত্র ও গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যে বাস করা ঋষির জীবনাদর্শ ছিল না—পুত্র-পৌত্রের সহিত আনন্দে গৃহবাস করাকে * তিনি ধ্যেয় জ্ঞান করিতেন; দুগ্ধমধুসংপৃক্ত সোমপানের বেলায় তিনি বলিতেন, 'সোম পান করিলাম, আর অমর হইলাম।' †

কিন্তু ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞে পূর্বে সর্বদাই হোতা দেখিতে পাই কেন? আমরা জানি, জনযুগে সমগ্র জনসংঘ একত্র হইয়া উৎসবাদিতে পান আহার ও নৃত্য গীত করিত; দেবদেবীর উদ্ভবের পর দেবসমাজকেও মানুষ তাহার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া লয়—এইজন্য তাহাদের আমোদ প্রমোদ ও মত্ততায় দেবতাকে অংশ দিয়া তাহার তুষ্টি বিধানের চেষ্টা চলিতে থাকে। তখন উৎসবাদিতে সোমপাত্র দেখাইয়া ইন্দ্রদেবতাকে ‡ আবাহান করিয়া বলা হইত—'ইন্দ্র, তুমি আগমন কর, সোম প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা পান করিতে করিতে আপন স্তুতি শুনিয়া যাও।' § এই মন্ত্রে দেবতাকে মানুষের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইলেও তাহাকে মানবের গোষ্ঠীজীবন হইতে স্বতন্ত্র করা হয় নাই—যুদ্ধরত সংঘ এখানে তাহাদের বিজয়ী বীরকে পানচক্রে আহ্বান করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে-রচিত স্তুতি গাহিতেছে। এই সব যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপ আর্যদের জীবনে এক সময় সত্যই সজীব সমারোহের ব্যাপার ছিল; আর্য স্ত্রী-পুরুষ তখন নিজহস্তে গো, ছাগ বা এইরূপ অন্যান্য পশু বধ করিয়া তাহাকে অগ্নিদগ্ধ করিত—পরে সোমরসের সহিত উহা ভোজন করিবার সময় দেবতা, প্রকৃতি ও পিতরদিগকে এই আনন্দমত্ততার

* 'ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানাঃ স্বে দমে'; † 'অপাম সোমমমৃতা অভূম'; ‡ তখন ইন্দ্রই বড় দেবতা; § 'ইন্দ্র আয়াহি বীরতে, ইমে সোমা অরংকৃতাঃ। এষাং পাহি শ্রুধী হবম্॥'

অংশ দিত। * কিন্তু আর্যেরা আর্যভিন্ন প্রতিবেশীর সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের প্রাচীন গোষ্ঠীবদ্ধতা ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে †—তখন কৃষি, ব্যবসায় প্রভৃতি নূতন জীবনোপায় আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন পশুচারণার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়—এই অবস্থায় পুরাতন সংঘোৎসব—সেই একত্রিক পান, আহার, স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য—সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। পরবর্তীকালের মহাযাগ পুরাতন উৎসব-আনন্দের নির্জীব অনুকরণ এবং পুরোহিতের লাভের ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। এইজন্য বিকাশপথে আর একটু অগ্রসর হইয়া মানুষ যাগযজ্ঞ প্রভৃতিতে ক্রমেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে—আর ইহার ফলে উপনিষদেও কর্মকাণ্ড-বিরোধী ব্রহ্মবাদের উদ্ভব ঘটিয়া ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি স্থাপনা হয়।

পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত আমরা সর্বপ্রথম উপনিষদেই দেখিতে পাই ‡—বেদে শুধুমাত্র পরলোকে অমরত্ব লাভ করিবার কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষা আছে, উপনিষদে এই পারলৌকিক অমরতা জন্মের পৌনঃপুনিকতায় পর্যবসিত হয়। বর্গবিভক্ত সমাজের গঠন ঠিক রাখিতে ইহা যে কত অমোঘ অস্ত্র তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। পুরোহিতকে সুবর্ণ ¶ দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞের ফল পরলোকে বর্তাইলে মানুষের পক্ষে ইহা তৃপ্তিকর হয় না। তাই পূর্বের প্রচারোক্তিকে তখন বদলাইয়া আবার একটু নূতন ও সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে হইল :—'পৃথিবীতে যে সব মহা ধনবান্ ও ভোগবান্ ব্যক্তি দেখিতেছ, তাহাদের সকলেই পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে এইরূপ হইয়াছে।' কিন্তু একটু চিন্তা

* ইহার কারণ নিছক কৃতজ্ঞতা ; † বিশেষত অপর জাতির মধ্যে আর্যের সংখ্যা যেখানে অল্প। ‡ ১৯৭ পৃষ্ঠা স্মরণীয় ; ¶ তাহাও অবিমিশ্র, কারণ 'বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্'—অর্থাৎ যজ্ঞে রূপা দিবে না।

করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব ইহা এক ঢিলে দুই পাখী মারা—কারণ, এই যুক্তিতে পুরোহিতদের আমদানীর উপায় দান যজ্ঞ প্রভৃতির ফল এই পৃথিবীতেই ফলান গেল; আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আর্থিক অসমানতারও একটা পাকা রকমের ব্যাখ্যা হইয়া গেল। এই ভাবে পূর্বজন্মের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়া পীড়িত বর্গকে তখন বোঝান হইতে লাগিল:—'ইহজন্মকে তোমরা সর্বস্ব মনে করিও না—কারণ জন্মের পরও জন্ম আছে, জন্মান্তর আছে···তাই এই জন্মের দরিদ্রতা বা সামাজিক বিষমতা,—এই সমস্ত দূর করিবার চেষ্টাও বৃথা।...আর তোমার দারিদ্র্য শুধু ভগবানের মর্জির উপর নির্ভর করে, এমনও ত নয়; ইহার মূলে তোমার পূর্বজন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতিও কারণরূপে বর্তমান আছে।...তাই অপরের সম্পত্তি দেখিয়া তোমার চোখ টাটানো খুব ভাল কথা নয়,—আর তুমি ত নিজেই বুঝিতে পারিতেছ, সংসারে ধনি-নির্ধনবর্গ শাশ্বত, ইহা ছাড়া উপায় নাই—ইহা না থাকিলে জন্মান্তরের শুভ অশুভ কাজের ফল প্রাপ্তি হয় না।···এইজন্য বৃথা পাষাণে মাথা না কুটিয়া তুমিও বুদ্ধিমানের মত কাজ কর—ইহজন্মে ফল না পাইলেও সংসারে দানপুণ্য এবং যজ্ঞযাগের সমারোহ করিয়া যাও—তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে তুমিও রাজা কিংবা কোন ধনাঢ্যকুলে জন্ম লইয়া ভোগসুখের অধিকারী হইবে।'

পূর্বজন্মের সিদ্ধান্ত আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন স্বর্গলোক কিন্তু বিলীন হইয়া গেল না—বরং শাসকেরা আরও যত্নে এই পুরাতন তীরটিকে তাহাদের তূণীরে তুলিয়া রাখিল। পূর্বেই বলিয়াছি, উপনিষদকালে সমাজের নূতন জিজ্ঞাসার মুখে ব্রহ্মবাদের স্থাপনা হয়—তাহাতে মানববুদ্ধি অজ্ঞেয়তা ও নেতি নেতির চক্রে পড়িয়া আরবার বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে—এবং ইহার ফলে জাগতিক সমস্যাগুলিও মানুষের

নিকট তুচ্ছ, নিঃসার বলিয়া মনে হয়। তবে সাধারণ জনতা এই সব অনধিগম্য তত্ত্বে প্রবেশ করিবার জন্য মাথা ঘামাইত না—তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য পুনর্জন্মসিদ্ধান্ত এবং প্রাচীন স্বর্গলোকই পর্যাপ্ত ছিল। তাহা হইলেও বহুধর্মের * বিরোধিতায় মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকে—এইজন্য ধর্মধ্বজেরা প্রথম হইতেই 'নদী এক, ঘাট বহু' † এই রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে—এবং ইহার সাহায্যে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়, আর নানা যুক্তিতর্কে দেশকালভেদে উহাদের ঔচিত্য সিদ্ধ করিতেও যত্নবান হয়।

ভারতবর্ষের অতীত ধার্মিক বিকাশ লক্ষ্য করিলে আমরা আর একটি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাইব—পূর্বে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে যাহা বলা হইল, তাহা প্রকৃতপক্ষে আর্যমস্তিষ্কের কল্পনার ফল—তাহাতে আর্যঅনার্যের বর্ণভেদ এবং তাহাদের অধিকার ও আর্থিক স্বার্থসংক্রান্ত বিরোধের কোন মীমাংসা নাই; এইজন্য তখনকার সমাজে ইহার জন্যও একটি যে-কোন-রূপ উপায় আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—পরে বাণিজ্যের উৎকর্ষের সঙ্গে এই আর্য ও আর্যভিন্ন জাতির বর্ণ ও বর্ণবিরোধের কিছুটা সমাধান ঘটে। ইহার কারণ, ব্যাপারীদের নিজ বর্গের মধ্যে বহুসংখ্যক লোকই অনার্য কিংবা কোনরূপ সঙ্কর জাতীয় ছিল; বাণিজ্যযুগের পূর্ব্বে তাহারা শিল্প অর্থাৎ তেল, শরাব, সোনাচাঁদি বা খাওয়াপরার উপযোগী দ্রব্যাদির ব্যাপার করিত—আর অন্যেরা সোজাসুজি আদিম ও গতানুগতিক কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকিয়া জীবন কাটাইয়া দিত। তবে ব্রাত্য প্রজাতন্ত্র বা ব্রাত্য 'গণের' নাগরিকেরা চিরকালই ভারতবর্ষের এই বর্ণ-ব্যবস্থার বিরোধী ছিল—তাই তাহাদের পক্ষে বণিকবর্গের

* বহুতর দেশী ও বিদেশী ধর্মের; † হিন্দী লোকোক্তি—'নদিয়া এক, ঘাট বহুতেরে'।

সঙ্গে শুধুমাত্র মিলিত নয়, মিশ্রিত হইয়া যাওয়াই সহজ ও স্বাভাবিক হয়। বর্তমান অগ্রবাল, অগ্রহরী, রোহতগী কিংবা সরতোগী প্রভৃতি জাতিরা পূর্বেকার ব্রাত্য বণিকদেরই বংশধর। এই বণিক যে চিরদিনই শান্তির পূজারী ছিল সে কথা অবশ্য আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি—এবং প্রসঙ্গত বর্গ ও বর্ণবৈষম্যের মীমাংসা কি কারণে বণিকগণের এত কাম্য ছিল ইহাও সেখানেই আলোচিত হইয়াছে—তারপর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি বণিকের প্রীতি, শ্রদ্ধা, পোষকতা ও আগ্রহ সম্পর্কে যুক্তিও ঐ স্থলেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে ভারতবর্ষে বর্ণসমন্বয়ের আন্দোলন আরম্ভ করে। অল্পকালের মধ্যেই ইহা এত প্রবল রূপ নেয় যে দেশের ব্রাহ্মণ্যস্বার্থ সত্যই বিপদে পড়িয়া যায়। এই আন্দোলনে আর্য আগমের কাল হইতে * উপনিষদ কাল পর্যন্ত চলিত বর্ণ-ব্যবস্থা শিথিল হইয়া পড়ে—এবং তাহাতে অনার্যদের দেবতা, তাহাদের ধার্মিক বিচার আর ঐতিহ্য সমস্তই গ্রহণীয় † বলিয়া গণ্য হয়। পরে গুপ্তদের সাম্রাজ্য স্থাপনার সময় ‡ এই সর্ববর্গসমন্বয়ের চেষ্টা আরও বাধাহীন হইতে পারে—পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্মণ্যধর্মও তখন এই এক বিশেষতা দ্বারাই তাহার পড়ন্ত ইমারতকে বাঁচাইয়া লয়। বর্গের অন্তস্থিত বর্ণবিভেদ শিথিল হইবার পর দুই-আড়াই হাজার বছর এখানে প্রচুর রক্তসংমিশ্রণ ঘটে। বুদ্ধের সময় ¶ সোণদণ্ড ব্রাহ্মণকে আমরা ব্রাহ্মণোচিত গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে § গৌরবর্ণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে দেখি—কিন্তু বুদ্ধের পরবর্তীকালে এই বর্ণবিচারই শরীরের

---

* বলিতে পারি বৈদিক কাল হইতে ; † বর্ণসমন্বয় আরম্ভ হইবার পূর্বে আর্য জাতির নিকট ইহা অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইত—এই নিষেধ আর্যভিন্ন জাতির সংস্কৃতির উপর একরূপ সামাজিক বয়কটের মত ছিল ; ‡ চতুর্থ খ্রীষ্টশতাব্দ ; ¶ ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ; § সোণদণ্ড সুত্ত (দীর্ঘনিকায়, ১।৪)।

রঙ ছাড়িয়া 'গুণকর্মস্বভাব'কে স্বীকার করিয়া লয়। এই বর্ণসমন্বয়ে চতুর্বর্ণবিধির অস্তিত্ব লোপ না পাইলেও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মিলনমিশ্রণে বাধা থাকে না—পুরোহিত ইচ্ছা করিলে আর্য, অনার্য, সঙ্কর, অথবা প্রাচীন, নবাগত সকলকেই উচ্চবর্ণে স্থান দিতে পারিত। এই অবস্থায় যজ্ঞযাগ হইতে পূর্বে ব্রাহ্মণের যে আমদানী হইত তাহার পথ স্বভাবতই রুদ্ধ হইয়া আসে ; কিন্তু অপর দিকে সমাজের বর্ণবিন্যাসে হাত থাকায় পুরোহিতেরা এই ক্ষতি সুদে-আসলে পূবণ করিয়া লয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বর্ণগত বিবাদ যে তখন শুধু ভাবপ্রবণতার জন্য হইয়াছিল এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই—কারণ বর্ণবিন্যাসের উপর তখনকার সমাজে আর্থিক সুবিধা অসুবিধা লাভের একটা বড় প্রশ্ন নির্ভর করিত। আর ইহারই অন্তিম নির্ণয় ব্রাহ্মণদের হাতে থাকায় তাহাদের শক্তি-সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করা চলে না।

এই মহাসমন্বয়ের যুগে শক, যবন প্রভৃতি নবাগত শাসক জাতির এক বিরাট্ অংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত হয়—ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অহীর, জট্ট, গুর্জর প্রভৃতি জাতির প্রভুতাশালী ব্যক্তিরাও ক্ষত্রিয়সমাজে স্থান লাভ করে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম পুরাতন বর্ণব্যবস্থার উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিরন্তর আঘাত হানিয়াছিল—এই মহাবর্ণসমন্বয় ইহারই ফল অর্থাৎ প্রাচীন বর্ণসমন্বয় চেষ্টার ইহা সার্থক ক্রিয়াত্মক রূপ। ইহার প্রভাবে স্বদেশী ও বিদেশী অদ্বিজেরা সমাজে উচ্চবর্ণের সমান আসন লাভ করিতে সমর্থ হয়—আর ইহাতে ব্রাহ্মণের যে সমর্থন দেখি তাহার কারণও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।

এখন সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিব যে ধর্ম সকল দেশেই সামন্ত ব্যবস্থার পোষক হইয়া শাসকের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে। তাই [illegible] সময় সময় ধর্মের সহায়তায়ও নূতন সমন্বয় বা নূতন বিন্যাস যে সম্ভবপর

হয় না এমন নয়; কিন্তু তাহার মূলে কারণ এই যে সমাজের আচ্ছন্ন আগুন যেন তাহার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শাসককেও পোড়াইয়া না দেয়। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বিচার করিলেও আমরা ঠিক এই একই সত্যে উপনীত হইব: উপনিষদের অজ্ঞেয় রহস্যবাদ, বুদ্ধকালীন বিজ্ঞানবাদ, অথবা বহিরাগত য়ুনানী পরমাণুবাদ—সমস্তই সামন্ত যুগের বর্গহিত-প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আমরা অন্যত্র * আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করিলাম।

(৩) **সদাচার**—সাধারণভাবে হত্যা, চৌর্য, মিথ্যাভাষণ ও যৌনদুরাচার হইতে বিরত থাকার নামই সদাচার। আদিম মনুষ্য-সমাজে মিথ্যাভাষণের বিপক্ষে কোনরূপ সদাচার প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না; কারণ তখন মিথ্যাচার মানুষের নিকট সত্য সত্যই এক অপরিচিত ও অস্বাভাবিক বস্তু ছিল—মনে এক জিনিস রাখিয়া বাহিরে তাহাকে অন্যভাবে প্রকাশ করা তখনও মানুষ শিখিতে পারে নাই। পরে অবশ্য অন্যান্য দুরাচারের মত মিথ্যাচারও একটি কলা হিসাবে বিকাশ লাভ করে। লোভ বা ভয়ের বশবর্তী হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কোন মিথ্যা কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া আসা সম্ভব—কিন্তু ইহা মিথ্যাচারের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ নয় অর্থাৎ মিথ্যাচারীর দায় সেখানেই শেষ হইয়া যায় না: একটি মিথ্যা কথা বলিলে ইহার বিরুদ্ধ-সত্যকে অপ্রকাশ রাখিবার জন্য মিথ্যাবাদীকে সদা সতর্ক থাকিতে হয়। আদিম মানবের পক্ষে এইরূপ চিরক্ষণিক সতর্কতা যে-কোন মানসিক পীড়ার মতই অসহ্য মনে হইত; তাই সত্যভাষণের জন্য গুরুতর দুর্দৈব ভোগ করিতে হইলেও সত্য বলাই তাহার পক্ষে সহজ ছিল। বর্তমান আদিম অবস্থার জাতিগুলির মধ্যে মিথ্যাভাষণ এখনও খুব বেশি প্রচলিত

* দর্শন দিগ্দর্শন।

হয় নাই—যে সামান্য কিছু মিথ্যাচার তাহাদের মধ্যে দেখা যায় তাহা সভ্য জাতির সম্পর্শে আসিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। মিথ্যাচার প্রকৃতপক্ষে বর্গবাদী সমাজেরই দান—বর্গসমাজ মিথ্যাচারের বিপক্ষে সদাচার প্রচার করিলেও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত বর্গভিত্তিকে নষ্ট হইতে দিতে পারে না। সমাজে মিথ্যাবাদকে উচিত বলিয়া চালাইতে সর্বপ্রথম হয়ত ব্যাপারীরাই চেষ্টা করে; কারণ পণ্যের মূল্য, গুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে মিথ্যাকে সত্য করিলে ব্যাপারীর লাভ বেশি হয়।

তারপর, অন্যান্য দুরাচারের মত চৌর্যের আধারও হইতেছে বৈয়ক্তিক সম্পত্তি †—তাই ইহার ব্যাখ্যা সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত স্বামিত্বের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গেলে অবশ্য অপরের স্বত্ব অপহরণকেই সাধারণভাবে চৌর্য বলিতে হয়—কিন্তু সেই স্বত্বের অধিকারী কিরূপে তাহার মালিকানা পাইলেন ইহা না বলিলে চৌর্যের ব্যাখ্যা অসমাপ্ত থাকে। একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখিব, কোন বস্তুই এক ব্যক্তি, শুধু এক ব্যক্তির শ্রম বা চিন্তার ফলে সৃষ্ট হইতে পারে না। সমাজই মানুষকে তাহার ভোগবস্তু উৎপাদনের জন্য শ্রম ও চিন্তা নিয়োগ করিতে শিক্ষা দিয়াছে—এইজন্য ভোগবস্তুর উপর সমাজের যে স্বত্ব আছে তাহা অস্বীকার করা সাধুতার পরিচয় হইতে পারে না। এইক্ষেত্রে যদি বলা হয়—সামাজিক স্বত্ব সকল বস্তুর উপরই সমান, কিন্তু এই স্বত্বের মধ্যে যে বিশেষতা তাহা সমাজের নহে, ব্যক্তির—তাহা হইলেও এক্ষেত্রে যুক্তিটা খুব সঙ্গত হইবে না—কারণ যাহাকে সামাজিক স্বত্ব বলা হইল তাহাতেই সমাজের অধিকার কই? তারপর, দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে—কোন বিশেষ বস্তুর উপর বিশেষ ব্যক্তির স্বত্বই বা কি ভাবে স্থাপিত হয়? বস্তুর নির্মাণ, বা অন্য যে কোন প্রকারের বিচারই হউক, স্বত্বস্বামীরা এখানে চোর সাব্যস্ত হইবেন। আচ্ছা, তবে সামন্তবাদী

† ১৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা স্মরণীয়।

সমাজ সদাচার প্রচার করিতে গিয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিতে চাহিল কেন? ইহার উত্তর এই যে, সামন্ত যুগের সদাচার 'পরদ্রব্য অপহরণ'কেই চৌর্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিল—কিন্তু বস্তুর উপর আত্মপর অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠা হয় তাহার মূল তাহারা উদ্‌ঘাটন করে নাই—তাহাদের বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে সামন্তবাদের প্রযত্নে জনতা ব্যৈক্তিক স্বত্বাধিকারকে আর অস্বীকার করে না—সাধারণভাবে 'স্বত্ব' সম্পর্কে একটা ধারণা জনতার মনে ততদিনে বেশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে—আর এই ধারণা অনুযায়ী নিজেরা শ্রম করিয়া তাহার ফল অন্যের হাতে তুলিয়া দিতেও তাহাদের কোন আপত্তি নাই। এই অবস্থায় দরিদ্রকে সামন্তদের শ্রমহীন উপার্জনের প্রতি নির্লোভ রাখাই এই সদাচারের উদ্দেশ্য।

সামন্ত যুগে যৌনদুরাচারকে পাতক, এমন কি মহাপাতক ও অতিপাতক বলিয়া ঘোষণা করা হয়—কিন্তু অন্যান্য সদাচারের মতন ইহার সীমা নির্ধারণের বেলায়ও পক্ষপাতিত্ব বড় কম হয় নাই। বরং এইক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বও হইয়াছিল দুই দিক্ হইতে—প্রথমত ধনি-নির্ধন বৈষম্যের দিক্ হইতে, এবং দ্বিতীয়ত স্ত্রীপুরুষ অধিকারভেদের দিক্ হইতে। যাহাই হউক, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে যৌনাচার একটি সাপেক্ষ নিয়ম—বিভিন্ন দেশ, কাল ও সমাজে প্রতিনিয়ত ইহার মান পরিবর্তিত হইয়াছে। য়ুরোপে সপত্নী বিবাহ কিংবা বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত অপরের যৌনসম্পর্ক দুরাচার বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষ্ণ, দশরথ প্রভৃতি সৎপুরুষের দৃষ্টান্তে ইহা সদাচার হিসাবেই প্রচলিত থাকে। তবে স্ত্রীর পক্ষে য়ুরোপ এবং ভারতবর্ষ উভয় স্থলেই বহুচারিতা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী বর্তমানে তাহাকে প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যার মধ্যে স্থান দেওয়ায় এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তিব্বত ও হিমালয়-প্রান্তের কয়েকটি

জাতির মধ্যে একাধিক ভ্রাতার এক স্ত্রী গ্রহণের প্রথা এখনও বর্তমান আছে। এমন কি সেখানকার সমাজ ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না যে এই রীতি দুরাচার কিংবা নিন্দনীয়। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মত সেই অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও নিজের একাধিক পিতার নাম বলিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যৌন সদাচার একটি সাপেক্ষ নিয়ম, অর্থাৎ দেশকাল ভেদে * সমাজ যে নিয়ম অনুমোদন করে তাহাই সদাচার। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে সামন্ত যুগের সদাচারের অর্থ বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হইবে না। আমরা জানি পুরুষের বেশ্যাগমন সমাজ দ্বারা অনুমোদিত কর্ম, বেশ্যার পেশাকেও সমাজই নারীর জীবিকা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাই বেশ্যাগামী সমাজের চোখে নিন্দনীয় হইলেও তাহার উপর কোন রাজদণ্ড নিয়ত হয় না—সম্ভবত খুদা ও পরলোকের উপর বরাত দিয়াই সমাজ এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। কিন্তু সম্পত্তিস্বার্থের বিঘ্নকর বলিয়া চৌর্যের দণ্ডবিধান সমাজ খুদার হাতে তুলিয়া দেয় নাই। এই সব দিক্ হইতে চিন্তা করিলে সম্পত্তি ও যৌনাচারের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সম্পত্তির স্বামী চরম যৌনদুরাচারী হইলেও সমাজের তিনি চৌধুরী ব্যক্তি—সমাজ তাঁহার আচার-ভ্রষ্টতাকেও দুঃসহ নীরবতায় সহ্য করে, এই কারণে তাহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় না। তাই অন্যান্য সদাচারের মত সামন্ত যুগের যৌন সদাচারও মিথ্যাচারেরই নামান্তর মাত্র। সামন্তবাদীরা সমাজে নারীকে পতিতা করিয়া বেশ্যাবৃত্তির জন্ম দিয়াছে, অর্থের বিনিময়ে তাহারাই প্রথম দেহবিক্রয়কে জীবিকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে—তাই সমাজে অতি সাধারণভাবেও সদাচার বলিতে যাহা বুঝি, এইখানে তাহার স্থান

* এবং পাত্রভেদেও, যেমন নারীপুরুষে বা ধনিনিধনে।

কোথায়? যৌন সদাচারের আরও নমুনা পাইতে হইলে সামন্তদের * নর্মভবনের বিবরণ লইয়া দেখুন।

সামাজিক নিয়মে হত্যা প্রধান দুরাচারের মধ্যে একটি—তাই মনুষ্যহত্যা হইতে ক্রমে প্রাণিহত্যা', এবং পরে হিংসা পর্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সামন্তবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের জন্য সেনাবাহিনী সৃষ্ট হয়, এবং তাহার সহায়তায় সামন্তেরা অপরের ধনসম্পত্তি অপহরণে লিপ্ত হয়—তাই তাহাদের মুখ হইতে হত্যা দুরাচার বলিয়া ঘোষিত হওয়া সামাজিক প্রতারণারই অনুরূপ। এই ত্রুটি ঢাকিবার জন্য সামন্ত নীতিধর্মে হত্যাকে সার্থক ও নিরর্থক এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—কিন্তু ইহার মূল অর্থও এই যে অধিকারারূঢ় বর্গের পক্ষে হত্যায় দোষ নাই—অর্থাৎ তাহাদের রাজ্যানুমোদিত হত্যা মাত্রেই তখন সার্থক ও ন্যায়োচিত হত্যা! কিন্তু আমরা জানি সামন্ত যুগে সামান্য চৌর্যের অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত—এইজন্য নীচতম ব্যৈক্তিক স্বার্থ রক্ষার জন্য হত্যাও তখন সার্থক হত্যাই ছিল! সামন্ত যুগের ন্যায়ধর্মকে তখনকার লোকমত 'মৎস্য ন্যায়' † নামে অভিহিত করিত—সামন্ত সদাচারের আলোচনার পর ইহা যে কত সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি। অন্যান্য সদাচারের মত তখনকার হত্যাবিরোধী সদাচারও প্রতারণারই নামান্তর—কিংবা এইক্ষেত্রে তাহা পূর্ববর্তী সমাজের ন্যায়ধর্মের ক্ষীণ অবশেষও হইতে পারে।

---

* শুধু পুরাতনদের নহে, অধুনাতনদেরও ; † বড় মাছ ছোট মাছকে গিলিয়া খাইবার যে ন্যায়।

৬। স্ত্রী ও বিবাহ

(১) **স্ত্রী**—পিতৃসত্তা যুগে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য কমিয়া যাইবার কারণ আমরা পূর্বে * নির্দেশ করিয়াছি। সামন্ত যুগে তাহাদের অবস্থা যে আরও কত নীচে নামিয়া যায় তাহা নারীর দেহবিক্রয়ের ব্যবসায় হইতে বুঝিতে পারি। এই যুগে উচ্চবর্গের লোক স্ত্রীকে ভোগবস্তুর অধিক আর কিছু মনে করিত না; এবং সমাজের সম্পত্তিতে তখন স্ত্রী-জাতির কোন স্বামিত্ব বা অধিকারও থাকিত না—শুধু ভোগের বেলায় স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছাক্রমে তাহার সহভাগিনী হইতে পারিত। বসন, ভূষণ, প্রসাধন সমস্তই তখন পুরুষের চিত্তপ্রসাদনের জন্য নারীকে দেওয়া হইত। মনু হয়ত ইহার ঔজ্জ্বল্যে হতচকিত হইয়াই সেই যুগে নারী-পূজার § মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সামন্ত সমাজের গ্লানির আচ্ছাদন হিসাবে এই পূজা যে কত বহুমুখী বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। উপনিষদের ঋষি স্ত্রী সম্পর্কে মনু ও তাঁহার পোষক সামন্তসমাজ হইতে বহু স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। ঋষির বক্তব্য ছিল 'স্ত্রীর নিজের রুচির জন্য স্ত্রী প্রিয় হয় না, পুরুষের রুচি-বিধানের জন্যই স্ত্রী প্রিয় হয়'। † সামন্ত যুগে স্ত্রীর অবস্থা বুঝিবার জন্য আর একটি প্রচলিত নীতিবাক্য স্মরণ করিতে পারি—'কুমারী কালে তাহার রক্ষক পিতা, যৌবনকালে পতি এবং বার্ধক্যের রক্ষক হইবে পুত্র; স্ত্রীর কখনও স্বতন্ত্রতা থাকা উচিত নয়।' ‡

* ৫৮-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; § মনুসংহিতায় 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য—মনু সেখানে নারীপূজাকে দেবপূজার সামিল বলিয়াছেন; † 'নবৈ ভার্যায়াঃ কামায় ভার্যা প্রিয়া ভবতি; আত্মনস্তু কামায় ভার্যা প্রিয়া ভবতি।' ‡ 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।'

কিন্তু ভারতবর্ষে এই অ-স্বতন্ত্রতা যে কত উৎকট হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সেই কথাই বলিতে হয়। গুপ্ত যুগ শেষ হইবার পর ভারতীয় সমাজ তাহার স্ত্রী-জাতির জন্য সহমরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল—এই প্রথা অনুসারে মৃত পতির শবের সঙ্গে প্রত্যেক স্ত্রীর পুড়িয়া মরা অনিবার্য কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। মাত্র একশত বৎসর আগে ইংরেজ সরকারের সহায়তায় এই ক্রূর প্রথা বন্ধ করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বে পনরশত বৎসর ধরিয়া এই হত্যাযজ্ঞ ভারতবর্ষে বাধাহীন ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। আমার মনে আছে একদিন প্রসঙ্গক্রমে একজন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত বন্ধু † আমার নিকট বলিয়াছিলেন—'দেখুন, আপনাদের বিধবাবিবাহ যখন এখনও অপ্রচলিত, তখন সমাজশুদ্ধির দিক্ হইতে সতীপ্রথা ঠিকই ছিল……ইহা বন্ধ করিয়া সরকার খুব ভাল কাজ করেন নাই।'

যাহাই হউক, সামন্ত যুগে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার ফলেই বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। পরে হিন্দুরা ধর্মের সঙ্গে জড়াইয়া ইহাকে একটি প্রচণ্ড ধার্মিক নিষেধ হিসাবে খাড়া করে। অনেক অহিন্দু জাতির মধ্যে তখনও ধর্মের দিক্ হইতে স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহে আপত্তি ছিল না—কিন্তু সেখানে সম্ভ্রান্ত কুলের স্ত্রীরা সন্তানবতী হইবার পর আর পতিপরিগ্রহ করিত না। এখানে মনে রাখিতে হয় যে এই আমৃত্যু বৈধব্য স্ত্রীর কোন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিয়ম নহে; কারণ সামন্ত যুগের ধর্ম না হউক, সমাজ সর্বদাই বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিল। ভারতবর্ষের উচ্চকুলের মুসলমানদের মধ্যে বিধবাবিবাহ এখন পর্যন্ত বর্জিত আছে। মোগল আমলে কয়েক পুরুষ ধরিয়া রাজকুমারীদের অবিবাহিতা থাকার রীতিও চলিত ছিল; জানা যায় ঔরংজেব সম্রাট্ হইবার পর এই রূঢ় প্রথা রহিত করিয়া দিয়া

† ইনি আধুনিক জগতের প্রগতি সম্পর্কেও একেবারে জ্ঞানহীন নহেন।

ছিলেন। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে সামন্তযুগে স্ত্রী-জাতির অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা বুঝিতে পারি। এশিয়া খণ্ডের এক বৃহৎ অংশে তখন স্ত্রীর মুখ খুলিয়া বাহিরে যাওয়া ধর্মবিরুদ্ধ ছিল।

য়ুরোপে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য মুসলমানী দেশের তুলনায় স্ত্রী-জাতির অনেকটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। সেখানে ভারতীয় সামন্ত প্রথায় স্ত্রীকে অসূর্যম্পশ্যা বলিয়া গৌরব করিবার উপায় ছিল না; কিংবা শাহী হারেমের জনানখানায় তাহাদিগকে অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখাও সম্ভব ছিল না। য়ুরোপীয় পুরুষের এক স্ত্রী বর্তমানে পুনর্বিবাহ করা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত; এবং পুরুষের মত সেখানকার নারীও পূর্বের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিত। খ্রীষ্টধর্ম ইহাকে না মানিলেও * পূর্বাগত অধিকার বলিয়া তাহাকে লুপ্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া য়ুরোপের নারীই যে পুরুষের সমানাধিকার পাইয়াছিল এইরূপ নয়। য়ুরোপে স্ত্রী-জাতির অবস্থা সামন্ত যুগে কি ছিল তাহা আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। এবং ইহা ছাড়া ভোট দেওয়া, পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়া, কিংবা অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে ছাত্রী হইয়া প্রবেশ করা, এই সব সাধারণ নাগরিক অধিকারের জন্য তাহাদিগকে আমাদের চোখের উপর সামাজিক বিগ্রহ করিতে হইয়াছে।

(২) **বিবাহ**—আদিম সাম্যবাদী সমাজে যূথবিবাহ † এবং জনযুগে অনিশ্চিত মিথুনবিবাহ ‡ প্রচলিত ছিল। পুরুষসংসর্গের ব্যাপারে এই দুই অবস্থায়ই স্ত্রী-জাতির প্রচুর স্ব-তন্ত্রতা দেখা যায়। অবশ্য এখানে এই স্ব-তন্ত্রতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়—ইহার অর্থ শুধু এই যে, স্ত্রী তখনও পুরুষের জঙ্গম সম্পত্তি হইয়া উঠে নাই। তখন বিবাহ স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক প্রেম অর্থাৎ ভোগযানের প্রভাব-

---

* খ্রীষ্টবাদ চিরকালই বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরোধী, রোমন ক্যাথলিকরা এখনও ইহাকে নিন্দা করে; † ৩৫—৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; ‡ ৪৮—৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিহীন প্রেরণায় সম্পন্ন হইত। এই প্রকার বিবাহসম্বন্ধকে হিন্দু পুরাণের দেবাঙ্গনাদের স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ প্রেমের সহিত তুলনা করা যায়। পিতৃসত্তা যুগে পুরুষ সমাজে প্রধান হইয়া উঠিবার পর স্ত্রী-জাতির এই স্ব-তন্ত্রতা অপহৃত হয়। অবশ্য পিতৃসত্তার প্রথম পাদে প্রভুতা বা ধনের জোরে পুরুষের দাসীসংসর্গের অধিকার ছিল না। পরে পিতৃসত্তার পরিণতির সঙ্গে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাহারা বহুবিবাহের অধিকারী হয়। কিন্তু স্ত্রীর জন্য একবিবাহ একবার নির্ধারিত হইয়া গেলে সারা সামন্তকাল তাহা অপরিবর্তিত থাকে।

মিশরের সর্বপ্রাচীন সামন্ত সমাজের দিকে তাকাইলে সেখানেও বহুবিবাহের প্রকাশ্য অনুমোদন দেখি। তবে এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় যে বহুবিবাহ তখন সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও সামর্থ্যে কুলাইত না। সামন্ত যুগের ধনীরাই প্রথম বহুবিবাহের মধ্য দিয়া সমাজে এই অপরূপ ভোগপদ্ধতি সৃষ্টি করে। * কিন্তু মিশরীয় সামন্তবাদের একটি পরম গুণ এই যে সেখানে স্ত্রী কখনও অবগুণ্ঠিতা হয় নাই। মিশরের অতি সম্ভ্রান্ত সামন্ত বংশের নারীও তাহার পতির সহিত জনতার সম্মুখে বাহির হইতে পারিত। † ইহা ছাড়া মিশরীয় সামন্তবাদ স্ত্রীর অপর কয়েকটি মৌলিক অধিকারও স্বীকার করিয়া লইয়াছিল: মিশরে স্বামীর মত স্ত্রীও সম্পত্তির মালিক হইতে পারিত, এবং এই সম্পত্তিতে তাহার দান-বিক্রয়ের অধিকার থাকিত, স্ত্রী সেখানে স্বয়ং উত্তমর্ণ হইয়া স্বামীকে টাকা কর্জ দিত। কিন্তু ভারতবর্ষে

---

* মনে রাখিতে হইবে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সামন্তের বিত্ত তখন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে—তাই তাহার এক তুচ্ছ অংশের বিনিময়ে অজস্র স্ত্রীরূপী সম্পত্তি পাইলে তাহারা ছাড়িবে কেন? † ইস্লামধর্ম প্রচারিত হইবার পর মিশরীয় নারীর এই অধিকারও ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, এবং ইহার পর প্রায় তের শতাব্দী পর্যন্ত তাহা অপরিবর্তিত থাকে।

এত যুগ পরেও নারী শুধু তাহার স্বামীর সম্পত্তির ভোগাধিকারিণী হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় প্রাচীন মিশরের নারী যে সামন্ত যুগের অপর নারীর তুলনায় স্বাধীন ছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এই সব প্রাচীন অধিকারের সঙ্গে পরবর্তী যুগের তুলনা করিলে দেখা যায়—স্ত্রীর অবস্থা সমাজে ক্রমেই খারাপ হইয়াছে, ক্রমেই তাহার মৌলিক অধিকারগুলি লুণ্ঠিত হইয়াছে, এবং শেষে স্ত্রী পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আজ হইতে চার হাজার বৎসর পূর্বের বাবুল সামন্ত সমাজে * স্ত্রীসংসর্গের জন্য বৈধ বিবাহের প্রয়োজন হইত; এবং সেই সমাজে† স্ত্রী এবং পুরুষ এই উভয়েরই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবার অধিকারও থাকিত—ইহা ছাড়া বিবাহের সময় প্রত্যেক স্ত্রীই সেখানে তাহার পৈতৃক সম্পত্তির একাংশ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইত। বাবুল সমাজে স্ত্রীকে তিলাক দিতে হইলে তাহার পিতৃগৃহ হইতে আনীত সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইত; এবং সেই স্ত্রী সন্তানবতী হইলে পৈতৃক সম্পত্তির সহিত স্বামীর সম্পত্তিরও কিছু অংশ তাহার সন্তানের জন্য প্রাপ্ত হইত। সেই সমাজে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে কিংবা পতির অপযশ গাহিলে তাহাকে জলে ফেলিয়া দিবার নিয়ম ছিল; পুরুষ স্বেচ্ছাচারী হইলে কিংবা স্ত্রীর অপমানকর কাজ করিলে স্ত্রী পিতৃধন লইয়া বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে পারিত।

আগে ভারতীয় সামন্ত যুগের একটি বিবাহের ‡ আমরা বিশদ বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। সেই সময়ের বিবাহকে সামাজিক

---

* বাবুলের সামন্ত-সমাজ সিন্ধু-উপত্যকার তৎকালীন আর্যভিন্ন সমাজের সহিত সম্পর্কিত ছিল—এই সূত্রে আদি ভারতীয় সমাজের বিবাহব্যবস্থা সম্পর্কে কোন অনুমান চলিবে কি? † Code of Humburabi, Section 196; ‡ ১৭৭—৭৯ পৃষ্ঠায় বিশাখার বিবাহবর্ণনা দ্রষ্টব্য।

প্রতিজ্ঞা না ধরিয়া ধার্মিককৃত্য মনে করিলেই বেশি ঠিক হয়। কিন্তু ধার্মিককৃত্যই হউক আর সামাজিক প্রতিজ্ঞাই হউক বিবাহের বন্ধন তখন একতরফা ছিল; যত নীতিনিয়মের কড়াকড়ি তাহার সমস্তই ছিল স্ত্রী-জাতির সম্পর্কে, পুরুষ ছিল তখন স্বাধীন, স্ব-তন্ত্র, এমন কি স্বেচ্ছাতন্ত্র। তাই বিবাহে প্রেমের বন্ধন তখন তত বড় ছিল না, বিশেষত সামন্ত পরিবারে তাহা ভোগযানেরই আঙ্গিক ছিল। ইহা ছাড়া তখনকার বিবাহ দুই পরিবারের বিত্ত ও প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করিত—এই বিবাহে স্বামী পত্নীর রক্ষক হইত, এবং স্ত্রীকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিত—কিছুমাত্র সন্দেহ হইলে তাহাকে হত্যা করার অধিকারও স্বামীর ছিল। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী পতির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিন্দু-মাত্র প্রতিবাদ করিতে পারিত না—গোপনে জহরের গুটির মত এই নির্মমতাকে সে কণ্ঠলীন করিয়া লইত। ইহার কারণ স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারে সমাজের নাক কাটা যাইত, আর পুরুষের ভ্রষ্টাচারকে সমাজই ফুঁ মারিয়া উড়াইয়া দিত।